কলকাতার কাছেই

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

উৎসর্গ

শ্রীমান্ মণীশচন্দ্র চক্রবর্তী
কল্যাণীয়বরেষু

কলকাতার কাছেই

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক

কলকাতার কাছে—খুবই কাছে। শহরের এত কাছে যে এমন দেশ আছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। অথচ হাওড়া থেকে বি. এন. আর-এর গাড়িতে চাপলে আট ন মাইলের বেশী নয়। বার-দুই বদল করতে যদি রাজী থাকেন ত বাসেও যেতে পারেন—অবশ্য বর্ষাকাল বাদ দিয়ে, কারণ সে রাস্তা বর্ষায় অগম্য হয়ে ওঠে।

স্টেশন থেকে নেমে সোজা যে রাস্তা চলে গেছে, সেই রাস্তা ধরে মিনিট তিন-চার হাঁটলেই আপনার মনে হবে যে আপনি কোন গহন অরণ্যে প্রবেশ করছেন। রাস্তা এবড়োখেবড়ো—খানা-খন্দে লুপ্তপ্রায়। এ নাকি পাকা রাস্তাই কিন্তু আজ আর তার কোন চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। বর্ষায় কাদা হয় হাঁটু সমান, তারই মধ্যে গোরুর গাড়ি ও ভারী ভারী লরি গিয়ে দুধারে যে গর্ত হয়, বর্ষার শেষে সেটা শক্ত পাহাড়ের পাশে খাদের মত হয়ে থাকে, আর চৈত্র-বৈশাখ নাগাদ সবটা ভেঙে গুঁড়িয়ে ময়দার মত মিহি নরম ধুলোর দীঘিতে পরিণত হয়, পায়ের গোছ পর্যন্ত ডুবে যায় তার ভিতর। রাস্তার আশেপাশে অসংখ্য পানা-ভর্তি ডোবা আপনার নজরে পড়বে—এক-আধটা পুকুর চোখে পড়াও বিচিত্র নয়। বাড়ি-ঘর আছে, তার অস্তিত্ব টের পাবেন কিন্তু চোখে দেখবেন কদাচিৎ, কারণ আপনার দৃষ্টি এবং সে সব বাড়ির মধ্যে নুয়ে-পড়া নিবিড় বাঁশবন ও তেঁতুল-জামরুল প্রভৃতি গাছের জড়াজড়ি,তাতে কত কি অসংখ্য বুনো লতা উঠেছে। সেই সব বাঁশের দু-একটা রাস্তার ওপরও নুয়ে এসে পড়েছে; পথিকরা নিত্য যাওয়া-আসার সময় মাথা হেঁট ক'রে যায়, তবু সেগুলো কাটবার বা কাটাবার কথা কারও মনে পড়ে না।

রাস্তার ধারে ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পগার বর্ষার জলে এবং তারপর বহুদিন পর্যন্ত পাঁক ও কাদায় ভর্তি থাকে। অনেকের বাড়ি থেকেই ময়লা পড়বার এ-ই পথ, কিন্তু বেরোবার নয়। ফলে একটা চাপা ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধ বাড়ির বাতাসকে সর্বদা ভারী ক'রে রাখে। এই সব পগার গোসাপ ভাম ও ভোঁদড়ের আড্ডা। কুৎসিত ভয়ঙ্কর গোসাপগুলো একেবেঁকে প্রকাশ্য দিবালোকেই চলাফেরা করে। মশা এখানে দিনের বেলাতেও আত্মগোপন করা আবশ্যক মনে করে না, দিবা-রাত্রির প্রতিটি মুহূর্তেই ম্যালেরিয়ার সর্বনাশা বিষ ছড়িয়ে বেড়ায়।

ফলে যে মানুষগুলো সদা-সর্বদা এখানে বাস করে তারা সবাই অর্ধমৃত; ম্যালেরিয়া ও পেটের অসুখ ওদের জীবনীশক্তিকে যেন নিঙড়ে বার ক'রে নিয়েছে। জীবনকে ওরা যেন প্রতিমুহূর্ত ব্যঙ্গ ক'রে চলেছে। যারা অফিস করে তারাও যে খুব সুস্থ তা নয়—তবে জর হ'লেও কাঁপতে কাঁপতে তাদের অফিস যেতে হয়—বিকেলে আসবার সময় যথারীতি বাজারের থলিও সঙ্গে থাকে—সুতরাং ঐটুকু প্রাণের লক্ষণ তাদের আজও যায় নি। তারই মধ্যে যারা একটু ভাল চাকরি করে, অর্থাৎ যাদের ডি. গুপ্ত কিংবা এডওয়ার্ডস্ টনিক কিনে খাবার সঙ্গতি আছে, তাদের অবস্থা একটু ভাল; আরও ভাল চাকরি করে যারা, তারা এখানে থাকে না—বেকার আত্মীয়দের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় গিয়ে বাসা নিয়েছে।

অথচ এখানে রাজা আছেন, রাজার চেয়েও ধনী জমিদার আছেন। তাঁরা নাকি প্রজাদের কষ্ট হবে বলেই মিউনিসিপ্যালিটি হ'তে দেন না। রাজারা এখানে থাকেন না—জমিদারদেরও অনেকেই বালিগঞ্জে বাড়ি নিয়েছেন। অবশ্য গ্রাম-বাসীরা চেষ্টা করলে তাঁরা বাধা দিতে পারতেন না এটা ঠিকই কিন্তু সে চেষ্টা করবে কে? বছরে ন মাসই তারা অসুস্থ থাকে। এখন সম্প্রতি যুদ্ধের দৌলতে কিছু লোক এসেছে, বাস্তুহারাও কিছু কিছু দেখা দিয়েছে বটে—রাস্তাঘাটে লোক দেখা যায়, জোর হাসির আওয়াজ শোনা যায় মাঝে মাঝে, তাই বলে যদি মনে ক'রে থাকেন যে রাস্তাঘাটের কিছু উন্নতি হয়েছে কিংবা বনজঙ্গল কিছু কমেছে ত সে আপনার ভুল। সে ভুল, এখনও যদি আপনি চার আনা দিয়ে টিকিট কিনে ওখানে একবার যেতে রাজী থাকেন ত ভাঙতে বেশী দেরি হবে না।

তবে পথে যেতে যেতে দু-চারখানা বাড়ি বেশি নজরে পড়বে এটা ঠিক। কিন্তু বনজঙ্গল তাতে এমন কিছু কমে নি। খানিকটা এগিয়ে খালের পুল পার হয়ে রাজার বাড়ি ডাইনে রেখে বাজারের পাশ কাটিয়ে আরও যদি চলতে থাকেন ত একসময় আপনার মনে হবে দুপুরেই বুঝি সূর্য অস্ত গেছে—ভ্যাপ্‌সা গন্ধ আপনার নিঃশ্বাস রোধ ক'রে আনবে। বুঝবেন—আপনি এইবার শ্যামাঠাকরুনের বাড়ির কাছাকাছি এসেছেন।

অনেকখানি জমি নিয়ে ওঁর বাড়ি। ওঁরই নিজস্ব বাড়ি, স্বামীর নয় কিংবা ছেলে-মেয়েদেরও নয় এখনও পর্যন্ত। পুকুর আছে, তেইশটা নারকেল গাছ, প্রায় শতখানেক ঝাড় কলা, আম-জাম-জামরুল আমড়া সুপুরি আরও কত যে গাছ তার ইয়ত্তা নেই। বাঁশঝাড়ও আছে ওর মধ্যে। শ্যামাঠাকরুন তাঁর জমির এক বিঘত স্থানও বৃথা ফেলে রাখতে প্রস্তুত নন, ফলে গাছগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে কোন গাছেই আজ আর ভাল ফলন হয় না। শ্যামাঠাকরুন প্রতিবেশীদের গাছে গাছে

ফল দেখেন, লাউ-মাচায় লাউ, মাটিতে কুমড়ো দেখেন আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন, 'মরণ আমার, মরণ! পোড়া কপাল হ'লে কি গাছপালাও পেছনে লাগে রে! কেন, কেন, আমি কি করেছি তোদের? ঐ সব চোখখাকী, শতেক-খোয়ারীদের বাড়ি মরতে যেতে পারো আর আমার কাছে আসতে পারো না?'

রাগে দাঁত কিড়মিড় ক'রে ওঠেন তিনি। দাঁত তাঁর এখনও অনেকগুলো আছে, সামনের প্রায় সবগুলোই আছে, যদিও উনআশি বছর বয়স হ'ল তাঁর। কিন্তু কোমরটা ভেঙে গেছে, রাস্তায় চলেন একেবারে যেন রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে হয়ে। যখন খুব কষ্ট হয়, মধ্যে মধ্যে একবার কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন কিন্তু সবটা সোজা হয় না, কেমন একটা অদ্ভুত ত্রিভঙ্গ আকার ধারণ করেন।

তাই ব'লে তিনি চলাফেরাও বড় কম করেন না। এখান থেকে হেঁটে পোদ্‌ড়া শালিমার শিবপুর পর্যন্ত সুদ আদায় করতে যান মাসে তিন-চার দিন। যেতে-আসতে দিন কেটে যায়, কারও বাড়ি কিছু জুটলে আহার করেন, নইলে উপবাসী থেকেই ফেরেন। সবাইয়ের বাড়ি খেতেও পারেন না, কারণ এখনও ওঁর জাতের সংস্কার যায় নি—খুব ছোট জাত ব'লে যাদের মনে করেন তাদের বাড়ি জলও খান না।...এ ছাড়া বাড়িতে থাকলেও তিনি এক মিনিট বসে থাকেন না—শুক্‌নো লতাপাতা, কলার বাস্‌না, নারকেল-সুপুরির বেল্‌দো—এই সব সংগ্রহ ক'রে বেড়ান সারাদিন, অবিশ্রান্ত। জমেছে বিস্তর, বাড়ির একখানা ঘর, রক দালান বোঝাই, তবু সংগ্রহের বিরাম নেই। বলেন, 'কেউ কি আমাকে এক মণ কাঠ কি কয়লা কিনে দিয়ে সাহায্য করবে, এ আমার সম্বচ্ছরের জ্বালানি হয়ে থাকবে। বর্ষার সময় কি তোদের মত ছ আনা শ দিয়ে ঘুঁটে কিনব নাকি?'

যদি কেউ প্রশ্ন করত, 'ও বামুন মা, তোমার গত বছরের পাতাই যে রয়েছে—,' তিনি বেশ একটু ঝেঁজেই জবাব দিতেন, 'থাক্ না বাছা, পাতায় নজর দাও কেন? এক বছর যদি বর্ষা বেশিই হয়, তখন কার কাছে ধার করতে ছুটব বলো?'

শুকনো পাতা আর টাকার সুদ, এ ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা ওঁর ছিল না। সুদের লোভে আসল তাঁর অনেক বারই ডুবেছে। এমন সব জামিনে টাকা ধার দিয়েছেন যা আদায় হওয়া বা আদায় করা সম্ভব নয়। ঘটি বাটি বাসন রেখে বিস্তর টাকা ধার দিয়েছেন, সে সব স্তূপাকার হয়ে রয়েছে খাটের নিচে। কোন্‌টা কার এবং কত টাকা বা কত আনায় বাঁধা আছে সে হিসাবও আর করতে পারেন না—ফলে যে হয়ত এক টাকা ধার নিয়েছিল সে আট আনার ওপর সুদ হিসেব

ক'রে স্থদ-আসল দিয়ে বাসনটা ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

অবশ্য তাতে যে ওঁর বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে তা নয়। তিন ছেলে তাঁর, তিন মেয়ে; অসংখ্য নাতি নাতনী। নাতনীদেরও ছেলে-মেয়ে হয়ে গেছে। চাঁদের হাট বসবার কথা বাড়িতে। তবু আজ কেউ নেই তাঁর। এত বড় বাড়িটায় তিনি একা। সম্পূর্ণ একা। ঘরের জানলার পাশে অসংখ্য লতা, উঠানে এত গাছপালা যে একবিন্দু বাতাস কি একটুকরো আলো কোথাও দিয়ে ঢোকে না। চৈত্র-বৈশাখে যখন দম্‌কা দক্ষিণ-বাতাসে নারকেল গাছের মাথাগুলো মাতামাতি করে, বাঁশঝাড়ে বড় পাকা বাঁশের ডগাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ে, তখন এ-বাড়ির ঘরে বা রকে একটুও হাওয়ার আভাস টের পাওয়া যায় না। বেলা চারটে বাজলেই এ-বাড়িতে আলো জ্বালবার প্রয়োজন হয়, মশার গর্জন শুরু হয়ে যায় ঘরের কোণে কোণে—এই অন্ধকার ঝুপ্‌সি ভয়াবহ বাড়িতে শ্যামাঠাকরুন একা ঘুরে বেড়ান। সারাদিন পাতা কুড়িয়ে একরকম ক'রে কাটে কিংবা স্থদের হিসাব করে। কিন্তু রাত্রিটা বড় তুঃসহ। ঘুম হয় না তাঁর আদৌ। তেল খরচের ভয়ে আলোও জ্বালেন না। দিনের বেলার আহার সারতেই বেলা তিনটে বাজে—কাজেই রাত্রে কিছু খাবার প্রয়োজন হয় না। হ'লেও অন্ধকারেই উঠে হাতড়ে হাতড়ে টিনের কৌটোর ঢাকনি খুলে চালভাজা বার করেন, অন্ধকারেই একটু তেল-হাত বুলিয়ে নেন—তারপর দীর্ঘ রাত পর্যন্ত কুড়কুড় ক'রে বসে বসে খান। সেই গাঢ় অন্ধকারে, —নক্ষত্রের আলো আসার উপায়ও সেখানে নেই—সেই চাপা তুঃসহ অন্ধকারে, প্রেতিনীর মত জেগে বসে থাকেন শ্যামা।...মনকে বোঝান, 'চোখে যখন ভাল দেখতে পাই নে, তখন আলো জ্বাললেই বা কি, না জ্বাললেই বা কি।' দিনের বেলাতেই ত ভাল দেখতে পান না—কেউ এসে 'বামুন মা' বলে ডাক দিলে কপালের অসংখ্য বলিরেখাগুলোকে একত্র কুঁচকে প্রাণপণে চাইবার ভান ক'রে মনে মনে কণ্ঠস্বরটাকে চেনবার চেষ্টা করেন, 'কে? অ...মহাদেবের মা। এস এস। আমি বলি আর কে!'

যে এসেছে সে হয়ত প্রতিবাদ ক'রে বলে, 'অ বামুন মা, আমি যে তোমার সীতা-বৌ গো।'

'ও মা, সীতা-বৌ! আমি বলি মহাদেবের মা।...আর মা, চোখে আজকাল মোটেই দেখতে পাই নে। এই যে তুমি এসে দাঁড়িয়েছ, আমি একটা ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা মানুষের মত দেখছি। মুখ চোখ নাক কি ঠাওর পাচ্ছি?' বামুন মা স্বীকার করেন শেষ পর্যন্ত।

যে এসেছে সে হয়ত বলে, 'চোখের ছানি কাটাও না কেন বামুন মা, আজ-

কাল ত অনেকেই কাটাচ্ছে।'

'আর মা, ক-টা দিনই বা আছি, তার জন্যে আবার কাটাছেঁড়া টানাটানি কেন? কী হবে বা চোখে দেখে? বই পড়তে ত আর যাবো না? এমনিই ত বেশ চলে যাচ্ছে।'

তারপর একটু থেমে বলেন, 'শুধু শুধু একগাদা টাকা খরচ।'

'তা হাসপাতালে ত যেতে পারো। এখানকার সব ত হাসপাতালে গিয়েই কাটিয়ে আসে।'

'কে নিয়ে যাচ্ছে আর কে বা কি করছে, তুমিও যেমন! আমার আর কে আছে বলো! না, ওসব আশা ছেড়ে দাও, এখন কোনমতে তোমাদের রেখে চলে যেতে পারলেই হ'ল।'

যে এসেছে সে হয়ত একটা বাটি রেখে চার আনা পয়সা নিয়ে চলে যায়। শ্যামা আবার সেই আব্‌ছায়া অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। একা। শুকনো পাতা কুড়িয়ে, এখানের একটা গাছে একটু ঠেকো দিয়ে, ওখানে একটু মাটিটা কুপিয়ে দিয়ে—এমনি বাগানের তদ্বির ক'রে। ফসল হ'লেই বা কি, কে আর বাজারে গিয়ে বেচে আসবে? নাতি বলাইটা তবু ছিল, সে-ও শ্বশুর-বাড়িতে গিয়ে উঠল। 'বেইমান বেইমান। বেইমানের ঝাড় সব।' আপন মনেই গজগজ করেন শ্যামা, 'ঐ যে বলে না, ভাতারকে নিয়ে যে সুখী হতে পারলে না তার সুখ জন্মে হবে না! আমার সুখ! মুয়ে আগুন, যম ভুলে আছে তাই! এসব যে কার জন্যে করছি তার ঠিক নেই। সব ত মরে-হেজে গেছে, যমের দোরে গেছে সব!'

তবু তিনি ক'রেই চলেন। বাগান গাছপালার যত্নের ত্রুটি নেই। কৈফিয়ত-স্বরূপ নিজেকেই বলেন, 'ওরা কি আমার পর? বলে, কোলের বাছা আর বাড়ির গাছা!'

দুই

আজ আপনারা শ্যামাসুন্দরীকে যা দেখছেন তা থেকে কল্পনা করা শক্ত হ'লেও শ্যামা কিন্তু একদিন সত্যিই সুন্দরী ছিলেন। সাধারণ সুশ্রী মেয়ে নয়—বেশ একটু অসাধারণ রকমের সুন্দরী। ঐ ধনুকের মত বাঁকা দেহ একদিন কলাগাছের চারার মতই সতেজ সরল ও পুষ্ট ছিল, মাথাজোড়া টাকের জায়গায় ছিল মাথাভর্তি মেঘের মত নিবিড় কালো চুল; সারা পিঠ আচ্ছন্ন ক'রে কোমর ছেয়ে উরু পর্যন্ত ঢেকে দিত সে চুল। ঐ ছানি-পড়া স্তিমিত-দৃষ্টি চোখে একদিন বিদ্যুৎ খেলত,

সে কটাক্ষে পুরুষের চিত্তে অকস্মাৎ দাহ সৃষ্টি করার কথা। তবে চোখের তারা খুব কালো নয়, ঈষৎ পিঙ্গল বলা যায় কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি হ'ত না। উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সঙ্গে সেটা মানিয়ে যেত। পাতলা পাতলা চাপা ঠোঁটে যখন হাসির ঝিলিক খেলে যেত তখন তার আড়াল থেকে দেখা যেত মুক্তোর মত সাজানো সুন্দর দাঁত—তার কিছু চিহ্ন বরং এখনও আছে। সে রূপের কথা বিশ্বাস না করেন আমার সঙ্গে কল্পনায় আজ থেকে উনসত্তর বছর আগে শ্যামার বিবাহ-সভায় চলুন, আমি দেখিয়ে দেব।

ঠিক দশ বছর বয়সে শ্যামার বিয়ে হয়। তখন ঐরকমই হ'ত। বরং ওর বড়দির বিয়ে হয়েছিল একটু বেশি বয়সে; বারো বছরের মেয়ে তখন তিনি, তাইতেই লোকে বলত ধাড়ী মেয়ে। শ্যামার দিদি ছিলেন শ্যামবর্ণের, তাই পাত্র পেতে কিছু দেরি হয়েছিল। শ্যামা তার নাম মিথ্যা ক'রে গোলাপের মত গাত্র-বর্ণ নিয়ে অসাধারণ সুন্দরী হয়ে উঠেছিল—সুতরাং ঘটকী জোরগলায় সম্বন্ধ করেছিল, 'যদি এক কথায় সবাইকার পছন্দ না হয় তো ঘটকীর কাজ ছেড়ে দেব মা-ঠাকরুন, ডাকের সুন্দরী মেয়ে—এ মেয়ে পছন্দ হবে না, বলেন কি?'

তা ঘটকী পাত্রটিও বেশ যোগাড় করেছিল। চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল শ্যামার মায়ের। আঠার-উনিশ বছরের কিশোর ছেলে, বেশ চেহারা—বলিষ্ঠ গড়ন, উজ্জ্বল-শ্যাম বর্ণ, টানা টানা বড় চোখে ঘন কালো পাতা, কাজল-পরার মত মনে হয়; যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি শ্রী, বলবার কিছু নেই। তাছাড়া খিদিরপুরে নিজেদের বাড়ি আছে। ছেলের বাবা অবশ্য যজমানী করতেন, কিছু কিছু শিষ্যও ছিল। বড় ভাই কোথায় চাকরি করে, ছোটও একটা যা হয় জুটিয়ে নিতে পারবে। বাংলা লেখাপড়া কিছু জানে, এ ছাড়া টাকা-পয়সা জিনিসপত্র বেশ কিছু আছে। বিধবা শাশুড়ী আছেন—বড় ভাশুর, জা, তার একটি ছেলে,—সংসারও ছোট।

এক কথায় সব দিক দিয়েই সুপাত্র।

শ্যামার মা আর ইতস্তত করেন নি। খোঁজ-খবর যেটুকু করার করেছিলেন, তবে বেশি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তিনিও বিধবা, তিনটি মেয়ে নিয়ে অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন, বিষয়সম্পত্তি কিছুই পান নি—ঘটনাচক্রে শুধু সামান্য কিছু নগদ টাকা আর গহনাপত্র নিয়ে ভদ্রমহিলাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল কলকাতায়। ফলে দেশে যাবার আর তাঁর মুখ নেই। জ্ঞাতিরাও খবর নেয় না, দুর্নাম তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। এখানে তাঁর এক দাদা দেখাশুনো করতেন, তিনিও মারা গিয়েছেন। বড় জামাই অবশ্য খুবই ভাল, আর্থিক সাহায্য যথেষ্ট করে কিন্তু তার সময় কম—এসব কাজ তার দ্বারা হয়ে ওঠে না। পরকে ধরে

আর কতটুকু করা যায় ?

তাছাড়া, খবর নেবার আছেই বা কি ? এই ঘটকীই তাঁর বড় মেয়ের সম্বন্ধ করে দিয়েছিল। সুতরাং তাকে অবিশ্বাস করবেন কি করে ?

শ্যামারও সেদিন ব্যাপারটা মন্দ লাগে নি। এক-গা গয়না, বেনারসী কাপড় পরে মল বাজিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া—অমন সুন্দর বর (অবশ্য সবাই বলছে তাই, শ্যামাসুন্দরীর সেদিন অত বোঝবার কথা নয়)—সবটা জড়িয়ে ওর মনে যেন একটা নেশা লেগেছিল। আলো বাজনা লোকজন—শাশুড়ীর সদয় মিষ্টি ব্যবহার সবটাই ছিল মানসিক সেই অবস্থার অনুকূলে।

প্রথম একটা রূঢ় আঘাত পেলে শ্যামা ফুলশয্যার রাত্রে।

সবাই বর-কনেকে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, শ্যামা অপেক্ষা করছে দুরু-দুরু বুকে। কিসের যেন একটা আশা। ফুলশয্যার রাত্রে স্বামীরা অনেক রকম আদর করে, অনেক রকম মিষ্টি কথা বলে—এ তার শোনা আছে আব্ছা আব্ছা ; বিবাহিতা বন্ধুদের এবং বড়দির কথার আড়ালে সেই রকমই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। যদিও সঠিক কোন বর্ণনা পায় নি কারুর কাছেই। তখনকার দিনে বড় বোনরা সন্তানাদি হবার আগে ছোট বোনদের সঙ্গে এসব কথা আলোচনা করত না। আর পনেরো ষোল বছরের দিদি দশ বছরের বোনকে কীই বা বলবে ?

যাই হোক, আশা যেমন আছে, লজ্জাও বড় কম নেই। কোথা থেকে যেন রাজ্যের লজ্জা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, সে বসে বসে ঘামছে। কিন্তু নরেন বেশ সপ্রতিভ, সবাই চলে যেতেই সে এক লাফে উঠে দরজাটা বন্ধ করে আবার খাটে এসে বসল। তারপর মিনিটখানেক একটু ইতস্তত ক'রে চাপা গলায় ডাকল, 'এই, শোন।'

শ্যামা হয়ত এই আহ্বানেরই অপেক্ষা করছিল, তবু সুরটা যেন ঠিক বাজল না। ডাকলেই কি সাড়া দেওয়া যায় ?

'এই, শোন না। কী ইয়ারকি হচ্ছে !'

নরেন ওর একখানা হাত ধরে হ্যাঁচ্কা টানে কাছে নিয়ে এল। সে টানের জন্য প্রস্তুত ছিল না শ্যামা—একেবারে নরেনের গায়ের ওপর এসে পড়ল। অস্ফুট কি একটা বিস্ময়ের স্বরও ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'আহা, ঢং দেখ না। লজ্জা দেখে মরে যাই একেবারে ! দেখি, সোজা হয়ে বসো। মুখখানা দেখি একবার ভাল ক'রে। সবাই বলছে সুন্দর সুন্দর—আমার ছাই ভাল ক'রে দেখাই হ'ল না একবার।'

সে জোর ক'রে শ্যামার মুখখানা 'শেজ'-এর ক্ষীণ আলোয় যত তুলে ধরতে

যায় ততই ওর মুখ লজ্জায় গুঁজে পড়ে। সুগোর সুডৌল চন্দন-চর্চিত একটি ললাট ও আবীর-ছড়ানো দুটি গালের আভাস পায় নরেন অথচ ভাল ক'রে দেখতে পায় না কিছুতেই, এমনি মিনিটখানেক চেষ্টা করবার পর নরেন ওর মাথায় সজোরে এক গাঁট্টা মেরে বলল, 'ও আবার কি ছেনালি হচ্ছে—সোজা হয়ে বসো বলছি নইলে মেরে একেবারে পস্তা উড়িয়ে দেব। তেমন বর আমাকে পাও নি। হুঁ-হুঁ, আমি বাবা পুরুষ-বাচ্চা। মাগের ভেড়ো হবার বান্দা নয়। সোজাসুজি চলো বেশ আছি, ন্যাকামি করেছ কি আমি বাপের কুপুত্তর।'

শ্যামা আড়ষ্ট হয়ে গেছে ততক্ষণে। এই কি ফুলশয্যা তার ? এই তার স্বামীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ !

তাছাড়া তখনকার হিসাবে শ্যামার মা বেশ ভাল রকমই শিক্ষিতা ছিলেন, অনেক বাংলা সাহিত্যের বই আছে তাঁর তোরঙ্গে—শ্যামারাও দুই যমজ বোনে ছাত্রবৃত্তি অবধি পড়েছিল ; এ শ্রেণীর ভাষা তারা শুনতে অভ্যস্ত নয়—ভদ্রসমাজে এমন কথাবার্তা অচল বলেই জানে। কাজেই দৈহিক বেদনায় যত না হোক অজ্ঞাত একটা আশঙ্কায় ও আশাভঙ্গের ব্যথায় ওর দুটি প্রশস্ত সুন্দর চক্ষু ছাপিয়ে কপোল বেয়ে হু-হু করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

'উঁ! অমনি পান্‌সে চোখে পানি এসে গেল! আল্‌গোছলতা!...ন্যাখো এসব চালাকি আমার সঙ্গে চলবে না ব'লে দিলুম। আমি যা ধরেছি তা করবই, তুমি চেনো না আমাকে। ভাল চাও ত ভালয় ভালয় মুখখানা তোল। হ্যাঁ, এমনি ক'রে, আলোর দিকে—'

শ্যামা ভয়ে ভয়ে মুখ তুলতে বাধ্য হয়।

কিন্তু শুধু মুখ তুললেই চলবে না।

'চোখ চাও। দেখি কেমন ডাগর চোখ।'

চোখ চাওয়াটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ, বিশেষত এই অবস্থায়। চেষ্টা ক'রেও চোখ চাইতে পারে না শ্যামা।

'আবার ঢ্যাঁটামি করে! চোখ চাইতে পারছ না ভাল ক'রে?'

ওর বাহুমূলে সজোরে একটা চিমটি কাটে নরেন। দশ বছরের মেয়ের নরম শুভ্র চামড়ায় নীল দাগ পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। তার ফলে চোখে আরও বেশি জল এসে যায়—এবার যন্ত্রণায়। চোখ আর চাওয়া হয় না কিছুতেই।

'ধ্যেস্—বদমাইশ অবাধ্য কোথাকার!'

ওকে এক ঠেলা দিয়ে খাট থেকে নামিয়ে দিয়ে নরেন নিজে শুয়ে পড়ল বেশ আরামে পা ছড়িয়ে। একটু পরেই তার নিয়মিত নিঃশ্বাস পড়ার শব্দে বোঝা গেল

যে ঘুম বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে।

শ্যামা সেই অবস্থায় সারারাত মেঝের ওপর বসে রইল আড়ষ্ট স্তব্ধ হয়ে। চোখের জল ফেলতেও তখন যেন ভয় করছিল ওর।

পরের দিন ওর শাশুড়ী বোধ করি ওর রাত্রি জাগরণে ক্লিষ্ট মুখ ও আরক্ত চক্ষু দেখে কিছু অনুমান করলেন। ওকে কোলে বসিয়ে অনেক আদর ক'রে একসময় চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ বৌমা, ছেলেটা আমার একটু গোঁয়ার-গোবিন্দ, কাঠখোট্টা গোছের। কাল তোমাকে কিছু ধমক-ধামক করে নি ত?'

শ্যামা কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে চুপ ক'রে রইল। তার ফলে তিনি আরও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে আবারও প্রশ্ন করলেন, 'বলো না বৌমা, লজ্জা কি? আমিও যে তোমার মা হই মা!'

এই ব'লে তিনি ওর মুখখানা জোর ক'রে তুলে ধরে সস্নেহে একটি চুমো খেলেন।

এবার আর শ্যামা স্থির থাকতে পারলে না, ওর চোখের জল স্বাভাবিক সমস্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ ভেঙে বেরিয়ে এল। ততক্ষণে ক্ষমাসুন্দরীরও চোখ পড়েছে ওর আরক্তিম বাহুমূলের দিকে। তিনি প্রায় আর্তকণ্ঠেই বলে উঠলেন, 'বৌমা!'

শ্যামা এবার একটি একটি করে সব কথাই বললে। লজ্জায় ঘৃণায় ক্ষমাসুন্দরী যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইলেন। শ্যামার হাত দুটি ধরে বললেন, 'বৌমা, ও যে বামুনের ঘরের গোরু—ভদ্রলোকের ঘরে একটুও লেখাপড়া না শিখলে এই রকমই হয়।...তা হ'লেও ও যে এত অমানুষ হ'তে পারবে তা আমি ভাবি নি মা। তা হ'লে অন্তত তোমার মত মুক্তোর মালা ওর গলায় ঝুলিয়ে দিতুম না। তুমি কিছু মনে ক'রো না মা।'

সত্যিই তাঁর মনে বড় লেগেছিল। সারাদিন ইতস্তত ক'রে শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে বড় ছেলে দেবেনকে গিয়ে কথাটা তিনি বলেই ফেললেন। দেবেনও কম রগচটা নয়—সে পরিচয় শ্যামা উত্তর-জীবনে ভাল ক'রেই পেয়েছিল —সে তখনই বেরিয়ে এসে ছোট ভাইয়ের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে, 'নরো!'

নরেন তখনও ঘুমোচ্ছিল; সে একটু বিস্মিত, কিছু বা রুষ্টভাবেই বেরিয়ে এল।

'কেন?'

'কেন! হারামজাদা, সব তাইতে তোমার গোঁয়ারতুমি!'

'ছাখো দাদা—খামোকা গালাগাল দিও না বলে দিচ্ছি। কি—হয়েছে কি?'

'বৌমাকে অমন করে মেরেছিস কেন?'

'কে বললে মেরেছি !'

'কে আবার বলবে। এখনও কালশিটে পড়ে আছে।'

'বেশ করেছি মেরেছি,' মুখ গোঁজ করে উত্তর দেয় নরেন, 'আমার পরিবারকে আমি মেরেছি। তোমার বৌকে ত মারতে যাই নি !'

দেবেন ধাঁ করে এক চড় কষিয়ে দিলে ওর গালে, 'ফের আবার মুখে মুখে চোপা ! হারামজাদা, শুয়োর কম্‌নেকার !'

সে চড়ের ধাক্কা সামলাতে নরেনের কিছুক্ষণ সময় লাগল। দেবেনের রোগা রোগা শক্ত কেঠো হাত। পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গিয়েছিল নরেনের গালে।

কিন্তু নরেনও ক্ষেপে গেল যেন একেবারে। ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল তবু সে গালে হাত বুলোতে বুলোতে ওকে ভেংচি কেটে খিঁচিয়ে জবাব দিলে, 'ফের মুখে মুখে চোপা ! কেন চোপা করব না তাই শুনি ? তুমি আমাকে খাওয়াচ্ছ পরাচ্ছ ? তোমার খাই, না তোমার বাবার খাই ?'

'ফের্—ফের্ শালা, আবার কথা কইছিস ! আমার বাবার খাস না তো কার বাবার খাস ? তোর বাবা আমার বাবা কি আলাদা—মুখ্‌খুর ডিম কোথাকার !'

'তুমি আমাকে মারবার কে ? আমাকে গালাগাল দেবার কে ? আমার যা খুশি আমি তাই করব।'

নরেন রাগে গজরায় আর এক-একটা বাক্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেবেনের সামনে পা ঠোকে।

'দেখবি ? দেখবি একবার ?' তেড়ে এগিয়ে যায় দেবেন।

শুরু হয়ে গেল গজ-কচ্ছপের লড়াই। দেবেন ওর চুলের মুঠি ধরে মাথাটা হেঁট ক'রে পিঠে গুমগুম ক'রে কিল মারতে লাগল, নরেন ওর যে হাতটা সামনে পড়ল সেইটা ধরলে সজোরে কামড়ে। এমনই জোরে কামড়ে ধরেছিল যে কষ বেয়ে কয়েক ফোঁটা রক্তও গড়িয়ে পড়ল।

ফলে দেবেনের স্ত্রী মড়াকান্না জুড়ে দিল। শ্যামা প্রথমটা ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, এখন রাধারাণী কেঁদে উঠতে সেও চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আর ক্ষমাসুন্দরী ওদের কাছে এসে মেঝেতে মাথা খুঁড়তে শুরু করলেন, 'ওরে তোদের জ্বালায় কি আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব ! ওরে, কেউ আমাকে আপিং এনে দে, খেয়ে মরি। আমার আর সহ্য হয় না।'

বিয়েবাড়ির সব কুটুম্ব তখনও বিদায় নেয় নি। তাদেরই দু'চারজন ছুটে এসে অতিকষ্টে দুই ভাইকে আলাদা ক'রে দিলে। নরেনকে ঘরে পুরে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেওয়া হ'ল। সে ভেতরেই দাপাদাপি ক'রে গজরাতে লাগল।

আর দেবেন কামড়ানো জায়গাটা ফটকিরির জলে ধুয়ে কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে অবিশ্রান্ত গালাগালি দিতে লাগল। বলা বাহুল্য যে তার মধ্যে নিজের মা-বাবাও বাদ গেলেন না।

সেদিন সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ বিপন্নমুখে ইতস্তত করবার পর শ্যামা লাজলজ্জার মাথা খেয়ে একসময়ে ব'লেই ফেললে, 'মা, আজ আমি আপনার কাছে শোব।'

ক্ষমার মুখটা চকিতে রাঙা হয়ে উঠলেও সস্নেহে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তাই শুয়ো মা। দরকার নেই আজ আর ও বাঁদরটার কাছে গিয়ে।'

কিন্তু সে বন্দোবস্তের কথা নরেন জানত না। সে শুয়ে শুয়ে খানিকটা অপেক্ষা করার পর কান পেতে যখন বুঝতে পারলে, সব বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, অর্থাৎ সবাই শুয়ে পড়েছে, তখন আর স্থির থাকতে পারলে না। মার ঘরের বাইরে এসে শেকলটা নেড়ে প্রশ্ন করলে, 'মা, বৌ কোথায় ?'

শ্যামার বুক ভয়ে গুরগুর ক'রে উঠল। সে সজোরে শাশুড়ীকে আঁকড়ে ধরল।

ক্ষমা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বৌমা ঘুমিয়ে পড়েছে এখানে, তুই শুতে যা।'

'ওকে ডেকে দাও না। ঘুমিয়ে পড়েছে ত কি হয়েছে ? নবাব-নন্দিনী !'

'আজ থাক্ গে। ওর শরীরটা খারাপ।'

'বা রে, বৌ যদি তোমার কাছেই থাকবে ত আমার বিয়ে দিলে কেন ?'

'আ খেলে যা ! ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে চোপা করতে লজ্জা করছে না ? যা শুগে যা, এক রাত্তির বৌ আমার কাছে রইল ত মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল একেবারে !'

ওধারে দেবেন ততক্ষণে তার ঘরের জানলায় মুখ বাড়িয়েছে, 'ফের্ যদি কারুর গলার শব্দ পাই একবার ত কেটে দুখানা ক'রে ফেলব বলে দিচ্ছি।'

সে বেরিয়েই আসত যদি না রাধারাণী পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ত একেবারে।

কিন্তু কে জানে কেন, নরেনও আর বিশেষ গোলমাল করলে না, শুধু এ বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে তার আপত্তি এবং রাগ জানাবার জন্য দুমদুম করে পা ফেলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে ঝনাৎ করে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

তিন

তবুও বিয়ের আটদিন পরে শ্যামা যখন এক বছরের মত বাপের বাড়ি ফিরে এল তখন ওর কিশোর স্বামীর জন্য বেশ একটু মন-কেমনই করেছিল। স্বামীর যে

পরিচয় এ-কদিন সে পেয়েছে তা আশারও নয়, আনন্দেরও নয়। তবু কিসের একটা যেন আকর্ষণ ওকে উন্মনা করে তোলে। সে অবসর পেলে জানলায় বসে বসে নরেনের কথা ভাবে।

আসবার সময় অবশ্য নরেন ব'লে দিয়েছিল, 'গিয়ে চিঠি লিখিস।'

'ওমা –সে আবার কি! চিঠি লিখব কি?'

'কেন? তুই ত লেখাপড়া জানিস। আমিই কি আর একেবারে জানি না? আজকাল ত অনেকে চিঠি লেখে শুনেছি—।'

সবেগে ঘাড় নেড়ে শ্যামা জবাব দিয়েছিল, 'না না—সে আমি পারব না। হয়ত বট্-ঠাকুরের হাতে পড়বে, নয়ত দিদির হাতে—কি ধরো মার হাতেই পড়ল, সে ভারি ঘেন্নার কথা! তারপর তুমি যদি জবাব দাও, আর মা যদি দেখতে পান? মা গো!'

নরেন খাটে বসে পা দোলাতে দোলাতে এক হাতের একটা নখ কাটছিল দাঁত দিয়ে, সে জবাব দিতে পারে নি ভালরকম। শুধু প্রশ্ন করেছিল, 'তবে?'

'এই ত এইখান থেকে এইখানে। তুমি যাবে রোজ রোজ।'

'হ্যাঁ—তোর মা যদি নেমন্তন্ন না করে?'

তখন বিনা নিমন্ত্রণে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা কেউ ভাবতেও পারত না।

'ফের্ তোর মা? বলে দিয়েছি না তিনি তোমারও মা, শুধু মা বলবে।'

'ধ্যেস্—লজ্জা করে।'

প্রসঙ্গটা সেইখানেই চাপা পড়লেও শ্যামা ভোলে নি। ওর যমজ বোন উমাকে দিয়ে মার কাছে কথাটা পাড়িয়েছিল। মা-ও অবিবেচক নন। তিনি প্রথম একটু ঘনঘনই নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন।

কিন্তু তার ফলে জামাইয়ের স্বভাব আর চাপা রইল না। প্রেম-সম্ভাষণের উষ্ণতা ও উগ্রতা শুধু পাশের ঘরে কেন, মধ্যে মধ্যে গোটা বাড়িটাই কাঁপিয়ে তোলে। বিশেষ ক'রে যেদিন গালে পাঁচ আঙুলের দাগসুদ্ধ মেয়ে ভোরবেলা বেরিয়ে এল সেদিন আর ওর মা রাসমণি স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি খুব রাশভারী মানুষ ছিলেন, একা মেয়েছেলে তিনটি বালিকা নিয়ে বাস করলেও কেউ একটা কথা বলতে সাহস পেত না কোনদিন। তিনি ঘরে ঢুকে সোজা তর্জনী দিয়ে সদর দরজা দেখিয়ে জামাইকে বললেন, 'যাও, আভি নেকাল যাও। আর কোনদিন এ দরজায় ঢুকো না। মেয়েও আর আমি পাঠাবো না। বুঝবো মেয়ে আমার বিধবা হয়েছে—যাও বলছি!'

ওঁর রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে জামাই নরেন ভয় পেয়ে গেল। সে আমতা আমতা

ক'রে বললে, 'মাইরি মা, এই আপনার দিব্যি, হঠাৎ রাগের মাথায়—মানে মেয়েও আপনার বড় ট্যাটা। এই আপনার পায়ে ধরছি, আর কখনো—'

সে হেঁট হয়ে পায়ে ধরতে যেতেই রাসমণি দু পা পেছিয়ে গিয়ে আরও কঠোর স্বরে বললেন, 'যাও—। কোন কথা শুনতে চাই না—আভি নেকাল যাও—'

অগত্যা এক পা এক পা ক'রে সেদিন নরেনকে বেরিয়ে যেতেই হয়েছিল।

শ্যামা কিন্তু এ ঘটনায় অত্যন্ত মনমরা হয়ে পড়ল। বিশেষ ক'রে কথাটা চাপা রইল না। এ নিয়ে যেমন আলোচনা চলতে লাগল পাড়া-ঘরে, তেমনি দলে দলে দুঃখ ও সমবেদনা জানাবার লোকের অভাব রইল না। স্বামী ঠিক কী বস্তু বা ভবিষ্যৎ জীবনে তার কী হতে পারে এ সম্বন্ধে স্বচ্ছ কোন ধারণা না থাকলেও শ্যামা বুঝতে পারলে তার মস্তবড় একটা সর্বনাশ হ'তে চলেছে। সে রীতিমত কান্নাকাটি জুড়ে দিল এবং এই সমস্ত দুঃখের মূল ব'লে আকারে ইঙ্গিতে মাকেই দায়ী করতে লাগল।

রাসমণি মাস পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে নিজেই জামাইকে নেমন্তন্ন করে আনাবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় শ্রীমান স্বয়ং একদিন এসে হাজির। মুখটা একটু শুকনো, এক হাঁটু ধুলো, কোথা থেকে বিরাট এক মানকচু ঘাড়ে করে বাড়ি ঢুকল। শাশুড়ীকে দেখেই মানকচুটা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে একেবারে গড় হয়ে এক প্রণাম, তারপর একটু কাঁচুমাচু ভাবেই বললে, 'এই এদিকে এসেছিলুম, মানে একটু কাজ ছিল কি না, তা মা বললে, যাচ্ছিস যখন কচুটা বেয়ানঠাকরুনকে দিয়ে আয়। মানে, বললে বিশ্বাস করবেন না--কচুটা আমাদের বাগানের।'

অতিকষ্টে হাসি সামলে রাসমণি বললেন, 'আচ্ছা হয়েছে, তোমাকে বাবা আর একঝুড়ি মিছে কথা বানিয়ে বলতে হবে না। হাত মুখ ধোও। খাওয়া-দাওয়া করো।'

নরেন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। জলখাওয়া শেষ ক'রে শাশুড়ীর রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে। কত কি গল্প! সে অনর্গল বকুনিতে রাসমণি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। দু-একবার ধমকও দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সে ধমক গায়ে মাখবার পাত্র নরেন নয়।

তবে রাসমণি তাঁর মত বদলাবার মেয়ে নন। পরের দিন সকালে উঠতেই জামাইকে তিনি বললেন, 'আজকে ভাল দিন আছে, শ্যামাকে নিয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও।'

নরেন তখনও বুঝতে পারে নি। সে বললে, 'কিন্তু এখনও ত এক বছর হয়

নি। তাছাড়া সেই দ্বিরাগমনের কি সব আছে-টাছে।'

'তা থাক্।' নিস্পৃহ কঠিন কণ্ঠে বলেন রাসমণি 'মেয়ে থাকতে পারে এখানে, কিন্তু তোমার তা হ'লে আসা হবে না। যা ভাল বোঝ করো। তবে মেয়ে যেতে চায়, সে ব্যস্ত হয়েছে—নিয়ে যেতে পারো। আমি গাড়ি ভাড়া ক'রে দিচ্ছি, ভাড়াও দিয়ে দিচ্ছি। ঘর-বসতের যা জিনিস সঙ্গে দেবার আনিয়ে দিচ্ছি। স্বামী সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে দোষ নেই শুনেছি। আজই নিয়ে যাও।'

কিছুতেই কোনমতেই তাঁকে টলানো গেল না। শ্যামা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। রাসমণি খুঁটিয়ে সব বাজার ক'রে গাড়িতে তুলে ওদের বিদায় ক'রে দিয়ে কাঁদতে বসলেন। তার আগে ওঁর মুখের একটি শিরাও কেউ কাঁপতে দেখে নি।

যদিও শেষ পর্যন্ত ওঁর প্রতিজ্ঞা রাখা সম্ভব হয় নি। ক্ষমাসুন্দরী নিজে এসে ছেলের হয়ে হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে গেলেন। বললেন, 'ভাই, এ হিন্দুর বিয়ে। ও সিঁদুরের দাগ ত মোছবার নয়। তাই ব'লে পেটের মেয়েটাকে স্বদ্ধ ত্যাগ করবে? আমার মুখ চেয়ে তুমি ওকে মাপ করো।'

রাসমণিও মনে মনে বোধ হয় দুর্বল হয়ে এসেছিলেন। তিনি মেয়ে জামাইকে আবার নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে আনলেন। আবার আসা যাওয়া শুরু হ'ল।

দিন কাটতে লাগল।

কিন্তু দিন-মাস-বছর একটু একটু ক'রে বালিকা শ্যামার তনু-দেহই শুধু কৈশোরের লাবণ্যে ভরে দিয়ে গেল, ওর অদৃষ্টের কোন পরিবর্তন আনতে পারল না। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি আসক্তি বাড়তে লাগল এটা ঠিক, তবে তাই ব'লে লাঞ্ছনা বা প্রহারের মাত্রা শ্যামার একটুও কমল না। সে যেন নরেনের নিজস্ব সম্পত্তি আর শুধু যদৃচ্ছ অত্যাচার করার জন্যই যেন ভগবান এই সম্পত্তি ওকে মিলিয়ে দিয়েছেন। দেবেন নিজে রগচটা ও রাগী হ'লেও এতটা ইতরতা সহ্য করতে পারত না, মধ্যে মধ্যে শাসন করতেও যেত, তার ফলে অধিকাংশ সময়ই একটা বীভৎস বিবাদ এমন কি হাতাহাতিও বেধে যেত। দুই ভাই-ই অপরকে নির্বিচারে এমন মা-বাপ তুলে গালাগালি করত যে, শ্যামা ও রাধারাণীর দু হাতে কান ঢেকে পালানো ছাড়া উপায় থাকত না এবং ক্ষমা ঘরের মধ্যে ঢুকে ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে মাথা খুঁড়তেন।

আবার সে পালা শেষ হলে ঘরে ঢুকে নরেন আর একবার শ্যামাকে নিয়ে পড়ত, 'বল্ শালী, বল্, ওর এত মাথাব্যথা কেন? আমি তোকে মারি তাতে ওর টনক নড়ে কেন? বল্ শীগগির!' তার সঙ্গে দুড়দাড় কিল চড় লাথি চলতে থাকত।

সে সব ক্ষেত্রে প্রহারের চেয়ে ঐ ইঙ্গিতটার মধ্যে যে ইতরতা প্রকাশ পেত তাইতেই যেন শ্যামা মরমে মরে যেত !···

সব কথাই রাসমণির কানে আসত। তিনি কোনদিনই কোন ব্যাপারে অধীরতা প্রকাশ করতেন না—ঘরের কথা পরকে বলাও তাঁর অভ্যাস ছিল না। শুধু পূজার আসনে বসে মনে মনে যখন সব বেদনা ইষ্টের পায়ে সমর্পণ করতেন সেই সময় মনে হ'ত তাঁর বুকটা যেন ভেঙে পিষে যাচ্ছে।

কিন্তু কি করবেন, উপায় কি ? জামাইকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করলে মেয়ের একটু খবর পর্যন্ত পাবেন না।

এক একদিন সে খবর নরেন নিজেই বহন ক'রে আনত। মেয়ে যে তাঁর কি পরিমাণ অবাধ্য এবং বদমাইশ, তার সবিশেষ বর্ণনা দিয়ে, সেই বদমাইশকে জব্দ করারও যে কি ওষুধ তার কাছে আছে এবং কেমন করে জব্দ করেছে সেই গল্প করত।

একদিন দুপুরবেলা এসে হাজির হ'ল ডান হাতখানায় ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়ে। দেখা গেল হাতটা ফুলেও উঠেছে।

বাড়িতে পা দিয়েই, বিন্দুমাত্র ভণিতা না ক'রে বললে, 'দিন মা, চাট্টি ভাত দিন—আজ আর বাড়ি ফেরা হ'ল না।'

ভাত তখন রাসমণি নিজে খেতে যাচ্ছিলেন, সেই ভাতই ধরে দিলেন।

'উঁহু—আমি হাতে করে খেতে পারব না। আমাকে খাইয়ে দিতে হবে। দেখছেন না হাতের অবস্থা !'

'হাতে কি হল বাবা ?'

'আর কি হবে ! আপনার কন্যাকে (নরেনের সাধু ভাষা বলাই অভ্যাস ছিল !) শাসন করতে গিয়ে এই কাণ্ড। মারতে গিয়ে এমন বেকায়দায় হাতটা লেগে গেল —দেখুন না ফুলে ঢোল হয়েছে একেবারে। কখনও ত দাঁড়িয়ে মার খাবে না, এমন বদমাইশ।'

তারপরই থালার দিকে চেয়ে,—'এ যে সব নিরিমিষ দেখছি। ইয়ে কিছু নেই ? দিন না একটু পিঁয়াজ কুঁচিয়ে বেগুন-পোড়ার সঙ্গে, বেশ লাগবে'খন।'

যে মেরেছে তারই যদি এই অবস্থা হয় ত মার যে খেয়েছে তার কি অবস্থা কল্পনা ক'রে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল তখন রাসমণির। কিন্তু এ পশুর সামনে চোখের জল ফেলতেও যেন লজ্জা হয়। অতিকষ্টে উদ্‌গত অশ্রু দমন করে তিনি একটা চামচ এনে ওর পাতে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এইটে দিয়ে বাঁ হাতে খাও বাবা—আমি আর এখন খাওয়াতে পারব না।'

'তা মন্দ নয়—তবে পিঁয়াজটা ? দিন না, না হয় আমি নিজেই কেটে নিচ্ছি। আপনি আবার এখন হাতে গন্ধ করবেন!'

'না, উমা দিচ্ছে।'

তিনি অস্ফুট কণ্ঠে একটা 'উঃ' উচ্চারণ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক

কিছুদিন পরে সংবাদ এল নরেনদের বাড়িটা সরকার বাহাদুর কিনে নিচ্ছেন। খিদিরপুর ডকে পড়বে—শুধু ও বাড়িটা নয়, ও অঞ্চলের আরও অনেক বাড়ি।

এ খবর নাকি বহুদিন আগেই পাওয়া গেছে, কিন্তু না বড় ভাই, না ছোট ভাই কেউ কোন ব্যবস্থা করে নি। যখন আর সাত আট দিন মাত্র বাকি আছে দখল করার, তখন চৈতন্য হ'ল। কোথায় যাওয়া যায় এ এক সমস্যা! জিনিসপত্র বিস্তর। বাসনকোসন খাট-বিছানা সিন্দুক-বাক্স—গুরুগিরির প্রাপ্য বহু জিনিস জমেছে বংশ পরম্পরায়!

ক্ষমা এলেন দেখা করতে রাসমণির কাছে।

'তুমি যদি ভাই কিছু রাখো—'

রাসমণি অল্প কথার মানুষ। তিনি কথা শেষ করতে না দিয়েই বললেন, 'সে হয় না দিদি, একে আমি ভাড়াটে বাড়িতে বাস করি, স্থান কম—তার ওপর কুটুমের জিনিস আমি রাখতে পারব না। এ নিয়ে ভবিষ্যতে অনেক কথা হতে পারে। আমাকে মাপ করুন।'

অগত্যা ক্ষমাকে চেপে যেতে হ'ল।

চলে আসার সময় রাসমণি পরামর্শ দিলেন, 'দিদি একটা কথা বলি, মনে কিছু করবেন না। ছেলেগুলি আপনার কেউ ভাল নয়—অনেক দুঃখ পেতে হবে ওদের নিয়ে। অত জিনিস আপনি কি করবেন? যত বড় সংসার হোক্ অত জিনিস লাগবে না কখনই। মিছিমিছি এখান ওখান করায় বিস্তর লোকসান হবে দেখবেন। বরং এক কাজ করুন, কিছু কিছু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বেচে দিন, টাকাটা নিজের কোন বিশ্বাসী লোকের কাছে রেখে যান। এর পর ঢের কাজে দেখবে।'

কথাটা ক্ষমার পছন্দ হ'ল না। যেমন বহু সৎপরামর্শই বহু লোকের হয় না।

স্থির হ'ল যে কিছু জিনিসপত্র এবং এক সিন্দুক বাসন বৌবাজারে এক শিষ্য-বাড়ি রাখা হবে এবং বাকি জিনিসপত্র দুটি নৌকোয় বোঝাই দিয়ে ওঁরা চলে যাবেন গুপ্তিপাড়ায়। সেখানে ওঁদের এক যজমানের বাড়ি পড়ে আছে, থাকার কোন

অসুবিধাই হবে না। শুধু পুরুষ দুজন কলকাতায় থাকবে একটা ঘর ভাড়া ক'রে, সরকারী টাকাটা হাতে পেলেই জমি কিনে অন্যত্র বাড়ি আরম্ভ করবে। মেয়েরা একেবারে ফিরবে নতুন বাড়িতে। ক্ষমা যাবার সময় বার বার দুই ছেলের হাতে ধরে বলে গেলেন, 'দেখিস্ বাবা, তোরা যেন নিশ্চিন্দি হয়ে থাকিস্ নি আমাদের সেই জঙ্গলে পাঠিয়ে। তাছাড়া নগদ টাকা হাতে বেশী দিন থাকে না, খরচ হয়ে গেলে আর বাড়ি করাই হবে না। আর দেখিস্—দুই ভাই রইলি, সদ্ভাবে থাকিস দোহাই তোদের।'

নরেনই ওদের পৌঁছে দিতে গিয়েছিল, আসবার সময় বিশেষ ক'রে তাকে বলে দিলেন, 'দাদাকে মান্য করবি, অমন ক'রে যখন-তখন ঝগড়াঝাঁটি করিস্ নি। বুঝলি? আর যত শিগ্‌গির পারিস আমাদের নিয়ে যাস্। এই নিবান্দা-পুরীতে তিনটি মেয়ে-ছেলে রইলুম।'

'নিশ্চয়ই মা! সে কথা বলতে। ছাখো না—তিন মাসের মধ্যেই বাড়ি শেষ ক'রে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।'

সরবে আশ্বাস দেয় নরেন।

এর পরের ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট।

বাড়ির টাকাটা পাওয়া গিয়েছিল মাস-কতকের মধ্যেই, ক্ষমা তা জানেন। এর ভেতর দু ভাই-ই নিয়মিত আসত। কিন্তু টাকা পাওয়ার পরই ওদের দেখা পাওয়া দায় হয়ে উঠল।

টাকাটা পাওয়ার দিন পনেরো পরে প্রথম একদিন নরেন এল অত্যন্ত সেজে গুজে। দামী সিল্কের পাঞ্জাবি, পকেটে সোনার ঘড়ি, ভাল পাম্পশু জুতো। ক্ষমা ছেলের রকম-সকম দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন, 'হ্যাঁরে টাকা পয়সা ওড়াচ্ছিস্ না ত দু'হাতে? এত সাজগোজ কেন? এ সব এল কোথা থেকে?'

নরেন রাগ ক'রে বললে, 'তোমার এক কথা! আমি বুঝি রোজগার করতে পারি না?'

'হ্যাঁ, তুই আবার রোজগার করবি! মুখ্খুর ডিম!'

'কী বলব অবোধ মেয়েমানুষ, তায় মা, নইলে এ কথা অন্য কেউ বললে এক চড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতুম!'

অপমানের ভয়ে ক্ষমা চুপ ক'রে গেলেন। শ্যামা কিন্তু ছাড়লে না, রাত্রে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁগা, মাকে ত খুব বড় বড় কথা বলে ধমকে দিলে, মোদ্দা টাকাটা কিসে রোজগার করলে তা ত বললে না?'

'তুই থাম! তুই কি বুঝবি?'

'তবু শুনিই না। বুঝি না বুঝি কানে শুনেই জীবন সার্থক করি।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে নরেন বললে, 'ফাট্কা খেলে জিতেছি।'

'খেলায় আবার টাকা জিতবে কিগো?'

'হুঁ।'

'তাকেই বুঝি জুয়ো বলে?' কতকটা ভীত-কণ্ঠেই প্রশ্ন করে শ্যামা।

'সব তাতেই বড্ড ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস্ ছোট বৌ। চুপ কর।'

এর পর চুপ না করলে কী হবে শ্যামা তা জানত, সে চুপ ক'রেই গেল।

নরেন তার পরের দিনই কলকাতা ফিরে গেল। বহু অনুরোধেও থাকতে রাজী হ'ল না। বললে, 'দিন রাত জমি খুঁজতে হচ্ছে। তোমাদের এই অবস্থায় ফেলে রেখেছি—আমার একটা আক্কেল আছে ত! দাদার আর কি, না করবে খোঁজ না করবে দেখাশুনো। যা করব সব আমি।'

ক্ষমা ভয়ে ভয়ে তবু বললেন, 'হ্যাঁরে, তা এত জমি কলকাতায়—খুঁজতে হচ্ছে কেন তবে?'

'তবে আর মেয়েমানুষের বুদ্ধি বলেছে কেন? জমি অমনি কিনলেই হ'ল? পাড়া ভাল হবে, জমি সস্তা হবে—নির্দায় নির্দোষ, তবে ত দেখেশুনে কিনব! যা তা একটা জমি কিনি, আর টাকা-কড়ি খরচা হওয়ার পর তার ফ্যাকড়া বেরুক! ওসব কাজ আমার দ্বারা হবে না।'

এর পর কিন্তু মাসখানেক আর কোন ভাইয়ের পাত্তা রইল না। ক্ষমা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। খরচপত্র তাঁর কাছে ছিল সামান্যই, সে সব ফুরিয়ে এসেছে—তার চেয়েও বড় কষ্ট বাজার-হাট করে কে? দুটি অল্পবয়সী বধূ নিয়ে তিনি একা স্ত্রীলোক। প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে বাড়ি, কাউকে ডাকলে সহসা সাড়া পাবার উপায় নেই। একটি মেয়ে বাইরের তোলা কাজ করে দিয়ে যায়, তাকে দিয়ে হাট করানো যায় না। সে যদি দয়া ক'রে কোন ছেলে-পুলেকে ডেকে দেয় এবং তারা কেউ দয়া ক'রে হাট ক'রে দেয় ত হয়, নইলে হয় না। ইতিমধ্যেই দিন-দু'তিন ক'রে চার-পাঁচবার উপোস করতে হয়েছে সবাইকে। বিরাট বিরাট কুমড়ো হয় বাগানে, শুধু কুমড়োর ডালনা রেঁধে খেয়ে কাটিয়েছে। অবশ্য ফলমূল বিস্তর, শাক-ডাঁটারও অভাব নেই—কিন্তু ভাত ছাড়া এসব খাওয়ার অর্থ কি ওদের কাছে!

শেষে পুরো এক মাস হয়েযেতে শ্যামাকেদিয়ে চিঠি লেখানো হ'ল। রাধারাণীও নিজের জবানীতে দেবেনের নামে একখানা চিঠি লিখিয়ে নিলে।

দিন কতক পরে উত্তর এল দেবেনেরই; সে লিখেছে মার নামে চিঠি। প্রণামাদি সম্ভাষণের পর লিখেছে—

'পরে বিস্তারিত লিখি এই যে শ্রীমান নরেন সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তির পরই জোর করিয়া তাহার অর্ধাংশ লইয়া নিজের হেপাজতে রাখে। আমি পাছে তাহার তঙ্কাও খরচ করিয়া ফেলি বা পরে অস্বীকার হই, শ্রীমানের সেই আশঙ্কা। তাহার পর হইতে অর্থাৎ তঙ্কা হস্তগত হওয়ার পর শ্রীমানের সাক্ষাৎ মেলাও দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় থাকে, কি করে তাহা আমরা কেহই অবগত নহি। বাসায় আসে কদাচিৎ, আসিলেও ব্যস্তভাবে আসে এবং ব্যস্তভাবেই চলিয়া যায়। জিজ্ঞাসা করিলে বলে জমির সন্ধানে দিবারাত্র ঘুরিতে হইতেছে। সে সব জমি কোথায় এবং তাহার বিশদ বৃত্তান্তই বা কি—জিজ্ঞাসা করিলেও ভাল রকম জবাবদিহি করিতে পারে না। ইতোমধ্যে আমি কয়েকটি জমি দেখিয়াছিলাম, তাহাদের মূল্যও সুলভ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু অদ্যাপি শ্রীমানকে সে সব দেখাইতে পারি নাই। অথচ তাহার সম্মতি-ব্যতিরেকে কিনাও আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ বাটি-বিক্রয়ের মূল্য আমার হাতে যে অর্ধাংশ আছে তাহা যথেষ্ট নহে। এমতাবস্থায় কী যে করি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। এধারে আমি যে মোকামে চাকুরি করিতাম তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ায় আমার চাকুরিও গিয়াছে। এক্ষণে চাকুরি খুঁজিব, না বাড়ি খুঁজিব, না শ্রীমানেরই খোঁজ করিয়া বেড়াইব—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে সেবকের প্রতি আপনার আজ্ঞা কি জানিতে পারিলে সুখী হইতাম। প্রণামান্তে নিবেদনমিতি—'

চিঠি শুনে ক্ষমা কাঠ হয়ে উঠলেন। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শুধু বললেন, 'ছোট বৌমা, সে সব ঘড়ি আংটি জামা কোথা থেকে করলে নরেন আমাকে ত বললে না, তোমাকে কি কিছু বলেছিল?

শ্যামা নত মুখে উত্তর দিলে, 'বলেছিলেন কী এক জুয়া খেলায় জিতেছেন কিন্তু সে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না মা।'

ক্ষমার বুক ফেটে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। তিনি একটা উত্তরও আর দিতে পারেন না।

এর পর দুটো দিন সেই তিনটি প্রাণীর কাটল অবর্ণনীয় দুশ্চিন্তার মধ্যে। দেবেনকে কী লিখবেন ক্ষমা তাও ভেবে পান না। কিন্তু তৃতীয় দিনের দিন অকস্মাৎ নরেনের এক চিঠি এসে গেল।

সে চিঠিও মায়ের নামে। কারণ গুরুজনরা থাকতে স্ত্রীকে চিঠি লেখা তখন নির্লজ্জতা বলে গণ্য হ'ত। আঁকা-বাঁকা হরপে বিশ্রী লেখা, অসংখ্য বানান ভুলে ভর্তি।

'দাদাকে জমীর সন্দান দিয়া দিয়া হয়রান হইয়া গেলাম। না হয় দাদার পসন্দ,

না হয় মতীর স্থির। এমতাবস্থায় কী করীব লিখিবেন। এধারে তঙ্কা সব জলের মত খরচ হঙ্গৈয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া আপনার নিকট লিকিতে লয্যা হয়, দাদার শভাব চরিত্তও বোধ হয় খারাপ হইয়া যাইতেছে। দাদা হামেশাই রাত্তে বাসায় ফেরেন না।' ইত্যাদি—

শ্যামা চিঠি পড়া শেষ করতেই রাধারাণী ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। ক্ষমা ব্যাকুল হয়ে ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু শ্যামা জোর ক'রে বলে উঠল, 'কেন দিদি মিথ্যে মন খারাপ করছ, এ সমস্ত মিছে কথা—বুঝতে পারছ না!'

তবু বহুক্ষণ পর্যন্ত রাধারাণীর চোখের জল থামল না। তার নিজের স্বামীর ওপরও বিশেষ আস্থা ছিল না।

ক্ষমা সারারাত ভেবে পরের দিন ভোরবেলা উঠে শ্যামাকে বললেন, 'ছোট বৌমা, তুমি আমার জবানীতে ও দুই বাঁদরকেই চিঠি লিখে দাও, এখানে পত্রপাঠ চলে আসতে। লিখে দাও যে আমার খুব অসুখ—বাঁচবার আশা নেই। এসে পড়লে যেমন ক'রেই হোক আটকাতে হবে আর আমার কলকাতায় বাড়িঘরে দরকার নেই, এখানে কিছু ধান-জমি ক'রে একটা চালা তুলে নিক। শেষে কিছুই আর থাকবে না।'

শ্যামা একটু ইতস্তত ক'রে শেষ পর্যন্ত (ভাশুরকে পরের জবানীতে চিঠি লেখাও বড় লজ্জার কথা) সেই মর্মে চিঠি লিখে দিলে। পাশের বাড়ি তাঁতি ছেলেটিকে দিয়ে অনেক কষ্টে সে চিঠি ফেলানোও হ'ল। তারপর তিনজনে সেই নির্জন বিরাট বাড়িতে সংশয়-কণ্টকিত চিত্তে প্রতীক্ষা করতে লাগল -- মানুষের বা অন্তত একটা উত্তরের। কিন্তু একটির পর একটি ক'রে দীর্ঘ দিন দীর্ঘতর রাত্রির সঙ্গে গ্রথিত হতে লাগল শুধু, না এল মানুষ আর না এল উত্তর।

মাসখানেক দেখে পাড়ার লোকদের ধরে একজনকে ক্ষমা কলকাতা পাঠালেন। সে ফিরে এসে বললে, 'ও বাসায় কেউ থাকে না। কোথায় থাকে তাও কেউ বলতে পারলে না।'

দুই

এর পর স্ত্রীলোক তিনটির যে ভাবে দিন কাটতে লাগল তা সহজেই অনুমেয়।

ক্ষমার সম্ভ্রম-বোধ ছিল অসাধারণ। এখানে আশ-পাশে প্রতিবেশী বলতে ব্রাহ্মণেতর জাতিই বেশি; ক্ষমা এসে পর্যন্ত এদের সঙ্গে একটা ব্যবধান রেখে

চলতেন, তারাও সম্ভ্রমের সঙ্গে সে দূরত্বকে মেনে নিত।

এখন কিন্তু আর ব্যবধান রাখা গেল না। এমন হ'ল যে পর পর তিনদিন কুমড়ো সিদ্ধ খেয়ে তিনজনে দিন কাটালেন। তাও না হয় সম্ভব, কিন্তু রাধারাণীর শিশু পুত্রটিকে বাঁচানো যায় কি ক'রে এই হ'ল তাঁদের সমস্যা। শেষে প্রতিবেশী-দের দ্বারস্থ হ'তে হ'ল। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া আর কারুর কাছে তাঁরা প্রতিগ্রহ করেন নি কখনও, একথা ক্ষমা প্রায়ই গর্ব ক'রে বলতেন—কিন্তু সে গর্ব আর বজায় রাখা গেল না। চালের জন্যই পরের বাড়ি যেতে হ'ল। প্রথমটা বাসন-কোসন বেচে চালাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্রাহ্মণের বাসন কেউই কিনতে রাজী হ'ল না। ধান চা'ল প্রায় সকলের বাড়িতেই যথেষ্ট, একটা সিধা দেওয়া ঢের সোজা। ক্ষমার কাছে সব কথা শুনে অনেকেই সিধা পাঠালেন। ছেলের জন্য দুধও একজনরা নিয়মিত এক ঘটি ক'রে পাঠাতে লাগলেন।

তাতে উপবাসটা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হ'ল বটে, তবে তাও একেবারে নয়। কারণ দানের জন্য তাগাদা করতে পারতেন না ক্ষমা। সিধা যারা পাঠাত তারাও অত নির্ভুল হিসেব করে পাঠাতে পারত না। ফলে যখন ভাঁড়ার খালি হয়ে আসত তখন শিশুর জন্য কিছু রেখে তিন শাশুড়ী-বৌয়ে উপবাস করতেন। তাল পাকার সময় তাল খেয়ে অনেকদিন কেটে যেত। সজনে ডাঁটা বা অযত্ন-বর্ধিত পুঁই-ডাঁটা সেদ্ধ ক'রে নুন দিয়ে খাওয়া চলত কোন কোন দিন। তরুণী বধূদের সবই সইত অবশ্য, কিন্তু ক্ষমারই শরীর ভেঙে আসতে লাগল। নানা রকম পেটের গোলমাল হতে লাগল। তবু ক্ষমা ভিক্ষায় বার হ'তে পারলেন না। শুধু যখন খুব অসহ্য হ'ত, এক এক সময় ওপরের দিকে চোখতুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, 'ওরে কী ছেলেই পেটে ধরেছিলুম রে, তিলে তিলে মাতৃহত্যা করছে।'

বৌয়েদের মুখের দিকে তিনি তাকাতে পারতেন না, লজ্জায় মাথা কাটা যেত তাঁর। মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে বলতেন, 'এমন জানলে কিছুতে ওদের বিয়ে দিতুম না মা, তোমাদের মুখের দিকে যে চাইতে পারি না। আমাকে তোমরা মাপ করো।'

মাস দুই এমনি কাটবার পর ক্ষমা প্রস্তাব করলেন, 'আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে মা, তোমরা বাপের বাড়ি চলে যাও। আর কতদিন এভাবে কাটাবে?'

সে প্রস্তাবে ওরা কেউ রাজী হল না। রাধারাণীর বাপের বাড়ির অবস্থা বিশেষ ভাল নয়—তার ওপর দেবেন ইতিপূর্বে এমন ঝগড়াঝাঁটি করেছে যে তাদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। যদি বা দেবেন কোনদিন এখানে আসে ত বাপের বাড়ি থেকে যে স্ত্রীকে সে আনতে যাবে না, এটা রাধারাণী নিশ্চিত জানে।

আর শ্যামা! তারও ওই অবস্থা। তার মা তাকে আশ্রয় দিতে পারতেন হয়ত, কিন্তু সে যে একরকম জোর ক'রেই শ্বশুর-ঘর করতে এসেছে। এখন আবার কোন্ মুখে সেখানে ফিরে যাবে?

মুখে বললে, 'সে হয় না মা, আপনাকে এই অবস্থায় ফেলে কোথায় যাবো?'

আনন্দে স্নেহে বিগলিত হয়ে ক্ষমা ওকে বুকে চেপে ধরলেন!

ওদের এই জীবনে আনন্দ ও আশার দিন হয়ে উঠেছিল পাড়ার নিমন্ত্রণের দিনগুলি। আগে ক্ষমা এখানে কোন নিমন্ত্রণ নেন নি কিন্তু এখন আর বৌদের আটকান না। উপবাস ত লেগেই আছে, বেচারারা এক-আধদিনও যদি পেট ভরে খেতে পায় ত সেই ভাল। বিয়ে বা অন্নপ্রাশন উপলক্ষে হ'লেই বিপদ হয়, যৌতুক করার প্রশ্ন ওঠে। ক্ষমা অতি কষ্টে লক্ষ্মীর কৌটো ঝেড়ে-ঝুড়ে সিঁদুর-মাখা আধুলি বা সিকি বার করেন। শ্যামা প্রথম প্রথম একটু অপ্রস্তুত হ'ত কারণ তার শহরের জীবনের অভিজ্ঞতায় এক টাকার কম যৌতুক করার কথা জানে না সে। তবে এখন এখানে দেখে যে সিকি আধুলি কেন, দুআনিও যৌতুক করে অনেকে। পাড়ার গরীব দুঃখী বা নিম্নশ্রেণীর যারা খেতে আসে তাদের অনেক সময় দয়া ক'রেই খেতে বলা হয় কিন্তু সে দয়া তারা গ্রহণ করতে চায় না, সামাজিক মর্যাদা না পেলে খেতে প্রস্তুত নয়। সেই জন্যই দুআনি পর্যন্ত যৌতুক নিতে হয়।

অবশ্য বিয়ে বা অন্নপ্রাশন (উপনয়নও বটে—তবে সে কদাচিৎ, কারণ নিকটে ব্রাহ্মণ-বসতি কম) ছাড়া অন্য নিমন্ত্রণগুলিই লোভনীয়। অসংখ্য ব্রত ও পার্বণ লেগেই আছে। ব্রাহ্মণের সধবা চাই-ই সে সব কাজে। এ উপলক্ষে শুধু খাওয়াই নয়, সিঁদুর আলতা দক্ষিণা মিষ্টি পান সুপারি এ ত আছেই, সময়ে সময়ে গামছা ও কাপড়ও মেলে। রীতিমত রোজগার। উপার্জন করার যে কি আনন্দ, সে স্বাদ শ্যামা প্রথম পায় ঐ ভাবেই।

বেশ মনে আছে ওর প্রথম দিনকার কথা। তাঁতিগিন্নী এসে হাতজোড় ক'রে ক্ষমার কাছে বললেন, 'বামুন মা, বলতে সাহস হয় না, কাল আমার বড় বৌয়ের নিত্‌সিঁদুরের ব্রত উদ্‌যাপন; দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ সধবা অন্তত খাওয়াতে হবে। বৌমারা যদি দয়া করে যান—। আরও অনেকে ত আসবে!'

ক্ষমা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। বোধ করি নিজের মনের সঙ্গেই একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল। কালই এই তাঁতিগিন্নী এক ধামা চাল পাঠিয়ে দিয়েছেন তবে চার দিনের পর পেটে ভাত গেছে। দান যখন নিয়েইছেন তখন আর

মানুষটাকে মনঃক্ষুণ্ণ ক'রে লাভ কি ?

প্রায় মিনিট-দুই পরে শুধু প্রশ্ন করলেন, 'আয়োজন সেই ভাবেই ত হচ্ছে ?'

প্রবলভাবে মাথা হেলিয়ে জিভ্ কেটে তাঁতিগিন্নী বললেন, 'নিশ্চয়ই, আমার প্রাণে ভয় নেই মা ? বাপ্‌রে ! বামুনের মেয়ে নিয়ে যাবো—এ যে গোখ্‌রো সাপ নিয়ে খেলা !'

আয়োজনটা কিভাবে হওয়া দরকার, অনেক ভেবেও শ্যামা বুঝতে পারলে না। রাধারাণীকে প্রশ্ন ক'রেও সদুত্তর পাওয়া গেল না। অথচ শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জা হয়। মনে হয় বামুনের মেয়ে নিয়ে গেলে কি করা দরকার তা বামুনের মেয়ের অন্তত জানা উচিত। 'জানি না' শুনলে তিনি কি ভাববেন ?

অবশ্য বোঝা গেল তার পরের দিনই।

তাঁতিগিন্নী বেলা দুটো নাগাদ নিজে এসে ওদের ডেকে নিয়ে গেলেন। আয়োজন বেশ বড় রকমেরই। বিরাট আটচালা বাঁধা হয়েছে। বামুন বৈষ্ণব অনেক বসেছে, সধবাও জন বারো, তার সঙ্গে ছেলেমেয়ে যে কত তার হিসেব নেই। তাঁতিগিন্নীর বড বৌ নিজে হাতে ওদের পিঁডিতে দাঁড় করিয়ে পা ধুইযে সেই পাদোদক জল একটা বাটিতে সংগ্রহ করলে, তারপর নতুন গামছা দিয়ে পা মুছিয়ে আলতা পরিয়ে দিলে। এরপর প্রত্যেককে এক এক কাঠের কৌটো বোঝাই নতুন সিঁদুর দিয়ে অনুমতি নিয়ে সিঁথিতে ও লোহার ধারে একটু ক'রে সিঁদুর পরিয়ে দিলে। বামুনের মেয়ের মাথায় হাত দেবে এই জন্যে অনুমতি। তারপর একখানা ক'রে কোরা কাপড় পরিয়ে ওদের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে আসনে বসালে।

তবু তখনও বিশেষ আয়োজনটা যে কি বুঝতে পারে নি শ্যামা। খেতে বসে বুঝলে। পাতে পডেছে খান আষ্টেক ক'রে লুচি, বেগুন ভাজা, পটোল ভাজা আর কুমডোর ডালনা। আর একরাশ করে নুন। কুমড়োর ডালনার চেহারাটা যেন কেমন সাদা-সাদা—মুখে দিয়ে দেখলে নুন নেই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর জাতের বাড়িতে ব্রাহ্মণরা নুন-হলুদ দেওয়া তরকারি খাবে না। আলাদা ক'রে নুন দিলে এবং সে নুন নিজে মেখে খেলে দোষ নেই। যাক্—লুচির স্বাদ যে কি তা শ্যামা প্রায় ভুলে যেতেই বসেছিল। এতদিন পরে সে বেশ তৃপ্তি ক'রেই খেল। এরপর পাতে পড়ল ক্ষীর ও উৎকৃষ্ট কাঁচাগোল্লা। খেয়ে যখন ফিরছে ওরা শুনলে বামুনরা বলাবলি করতে করতে যাচ্ছে, এমন পাকা ফলার এ অঞ্চলে অনেকদিন হয় নি। কলকাতার সে সব আয়োজন—মতিচুর দরবেশ অমৃতি—খেলে এরা না জানি কি বলত। আর মাছের কালিয়া ! হলুদ দেওয়া তরকারিই খায় না ত মাছ ! নিজের অজ্ঞাতসারেই শ্যামার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল—মাছের কথা প্রায় ভুলে যেতেই

বসেছে। হাতে সদ্য দক্ষিণা পাওয়া দুআনিটা ছিল, শ্যামা স্থির করলে পরের দিন কাউকে খোশামুদি ক'রে নদীর ধারে পাঠাবে মাছের জন্য।

এর দিন কতক পরেই এক কায়স্থ বাড়ি ওদের নিমন্ত্রণ হ'ল। সে আর এক বিস্ময়! কারণ এইবার আলুনি কুমড়োর ডালনা ঠিক থাকলেও লুচি পড়ল পাতে তেলেভাজা। মানুষকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে তেলেভাজা লুচি খাওয়ায় কেউ, তা কলকাতার মেয়ে শ্যামা এতদিন ভাবতেও পারত না। খেতে কিন্তু ভালই লাগল। ঘরে ভাঙা টাট্‌কা তেলে ভাজা লুচি—যেমন সুগন্ধ, তেমনি স্বাদ। ভয় ছিল একটু যে খেয়ে হয়তো অসুখ করবে কিন্তু কিছুই হ'ল না। ওরা আবার ষোলটা মোণ্ডা সন্দেশ ছাঁদা দিলে দুই জা-কে। ক্ষমার কথা মনে ক'রে খুশী মনেই নিয়ে এল শ্যামারা। তাঁর ত আর অন্য উপায় নেই।

গোটা বৈশাখ মাসটাই চলল ওদের নিমন্ত্রণ। ওরা যে 'ভিন্ন জাতে'র বাড়ি খেতে যাচ্ছে এই কথাটা একবার ছড়িয়ে পড়াতে অনেকেই সাহস ক'রে বলতে এল। ফলে কতরকম যে অভিজ্ঞতা হ'ল শ্যামার! কলু-বাড়ি খেতে গিয়ে দেখে রান্না বান্নার কোন বালাই-ই নেই। একটা ক'রে বড় পাথরের খোরাতে দই ঢেলে দিলে এক এক কাতান, তাতে মর্তমান কলা চার-পাঁচটা ক'রে, পাঁচ-সাত জোড়া মোণ্ডা আর আলগোছে খই ঢেলে দিতে লাগল। অর্থাৎ ফলার মেখে খাও। শেষে এক বাটি ক'রে ক্ষীর। তবে পাওনা ওদের ওখানেই সবচেয়ে বেশী হয়েছিল। নতুন গামছা, একটা ক'রে নতুন পেতলের সরায় এক-সরা মোণ্ডা, আবার দুআনি দক্ষিণা।

বৈশাখ মাসের পর নিমন্ত্রণ কমে এলেও জ্যৈষ্ঠ মাসটা আম খেয়ে এবং দু'চার দিন নিমন্ত্রণ খেয়ে এক রকম কাটল। কিন্তু শ্রাবণে আবার দুর্গতি। ওদের বাড়ির বিরাট আম-কাঁঠালের বাগানখানা আচ্ছন্ন ক'রে অন্ধকার ঘনিয়ে আসত যখন, বাইরে অবিশ্রাম বর্ষণ, কাদা জল থৈ থৈ করত এবং ভেতরে স্যাঁতসেঁতে ভিজে আব্‌হাওয়া—তখন শ্যামার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠত। ইচ্ছা করত এক একদিন আত্মহত্যা করতে কিন্তু গর্ভের সন্তানের কথা স্মরণ হ'তে আর সাহসে কুলোত না। দেহ ভারী হয়ে আসছে ক্রমশ, কেমন যেন দুর্বল বোধ হয়। হাতে প্রায়ই খিল লাগে। এই সময় ভাল ক'রে খাওয়ার কথা, সে জায়গায় অর্ধেকেরও ওপর দিন কিছুই খাওয়া হয় না। এই ঘোর বর্ষায় কে কার খবর রাখে, কে-ই বা চাল পাঠায়। তাল এবং কুমড়ো ও ডুমুর সেদ্ধ খেয়ে খেয়ে ওদের অরুচি হয়ে গেছে। তার ওপর এই অন্ধকার। প্রদীপ জ্বালবারও তেল নেই। কোনমতে সন্ধ্যা দেখিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়। এখানে আসবার আগে ডাকাতির

হয়ে কলকাতাতেই এক যজমানবাড়ি সব গহনা খুলে রেখে আসা হয়েছে। যা আছে তা নাম-মাত্র। তবু তারই মধ্যে একটা আংটি ও এক জোড়া মাকড়ী বিক্রি করতে হয়েছে। একটি অনুগত চাষী ছেলেকে দিয়ে অনেক কষ্টে বিক্রি করানো হয়েছে--কিন্তু তাতেই বা ক'দিন চলে?

সব চেয়ে মজা হচ্ছে এই—এত দুঃখের মূল যে, সেই স্বামীর ওপর শ্যামার রাগ হত হয় তার চেয়ে ঢের বেশী মন-কেমন করে। এক একটা দুর্যোগের রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে ওর যেন রাত আর কাটে না। ওর সেই বলিষ্ঠ সুন্দর স্বামী। কোথায় আছে কী করছে কে জানে! যদি অসুখই ক'রে থাকে? হয়তো ওরা যা ভাবছে তা নয়। হয়ত রোজগার করতেই সে কোন্ দূর দেশে গিয়ে পড়েছে—সেখান থেকে চিঠি আসে না। ওর মন স্নেহশীলা জননীর মতই একান্ত স্নেহে স্বামীর সব দোষ ঢেকে দিতে চাইত—অনুপস্থিত কোন প্রতি-পক্ষের সঙ্গে তর্ক ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। কাকে যে সে বোঝাচ্ছে, কার কাছে নরেনের দোষ-স্খালনের চেষ্টা করছে তা সে নিজেই জানে না তবু ওর মনের দ্বন্দ্বের ও যুক্তি-সৃষ্টির বিরাম থাকত না।

মাঝে মাঝে প্রাণ যখন খুব আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠত—তখন বেদনার অসহ্য তীব্রতায় শ্যামা জোরে আঁকড়ে ধরত শাশুড়ীকেই। ক্ষমা হয়ত ঘুম ভেঙে প্রশ্ন করতেন, 'কী হয়েছে ছোট বৌমা, ভয় পেয়েছ মা? এই যে আমি আছি মা—ভয় কি? আহা ঘুমের ঘোরে বুঝি কি স্বপন দেখেছে বাছা আমার। ষাট্ ষাট্!'

অপ্রস্তুত হয়ে শ্যামা বলত, 'না না।' পাশ ফিরে শান্ত, সংযত হয়ে শুত। ঘুম আসত না ওর তবুও।

বাইরে অন্ধ তামসী নিশি মাতামাতি ক'রে চলত অবিশ্রান্ত। তাল ও নারকেল গাছের মাথাগুলোয় প্রতিহত হয়ে বাতাস গোঁ গো শব্দ করত। বন্ধ খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চোখে বিদ্যুৎ-চমকের আভাস লাগত ক্ষণে ক্ষণে, মেঘের গর্জন চমকে দিত সেই অন্যমনস্কতার মধ্যেই। শুয়ে শুয়ে ভাবত স্বামীর কথা। সে সময় ওর নিজের দুঃখের একটি কথাও মনে পড়ত না। অন্তরের সমস্ত বর্ষণ চলত একটি মাত্র লোককে কেন্দ্র ক'রেই।

হয়ত অনেকক্ষণ পরে চোখের জল ধারায় ধারায় নিঃশব্দে ঝ'রে পড়তে শুরু হ'ত। অবশেষে শ্রান্ত হয়ে শ্যামা ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ত।

তিন

ভাদ্রের প্রথমেই অপ্রত্যাশিতভাবে পনেরোটা টাকা মনিঅর্ডারে এল দেবেনের কাছ থেকে। তাতে দু'ছত্র চিঠি লেখা শুধু—'বিশেষ ব্যস্ত থাকায় সংবাদ লইতে পারি নাই। শীঘ্রই যাইতেছি।'

তার মধ্যে নরেনের কোন কথা নেই। তা না থাক—নতুন ক'রে যেন একটা আশার জোয়ার এল মনে। রাধারাণী, ওদের দুজনের স্বামীই সমান স্তরে নেমে এসেছে এই চিন্তাতেই, যেন বেশী রকম মুষড়ে ছিল, এইবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ওর সমস্ত কথাবার্তায় নতুন-ক'রে ফিরে-পাওয়া স্বামী-সৌভাগ্যের অহংকার যেন নতুন পালিশ করা চুড়ির ঝিলিকের মত অনবরত ঠিকরে বেরোতে লাগল। ছোট জায়ের প্রতি সহানুভূতির শেষ রইল না ওর। সে সহানুভূতির সরল অর্থ হ'ল ছোট জাকে জানিয়ে দেওয়া যে, এই কমাসে যা ধারণা করেছিলে তা ঠিক নয়—আমার স্বামী হাজার হোক তোমার স্বামীর চেয়ে ঢের ভাল।

তা হোক—শ্যামা তাতে তত দুঃখিত নয়। সে-ও একান্ত মনে ভাশুরের আগমনের জন্যে দিন নয়—প্রহর গুনতে লাগল। ওর আশা যে ভাশুর এলেস্বামীর খবর ও একটা পাবেই। শুধু সেই আশায় ও সমস্ত অপমান সইতে পারে অনায়াসেই।

কিন্তু তার আগেই একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেল।

ভাদ্রের মাঝামাঝি শ্যামা একদিন শাশুড়ীকে ডেকে বললে, 'মা, পেটটা কেমন করছে। একটু উঠুন না।'

তখনও ক্ষমা বুঝতে পারেন নি। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বাললেন।

কিন্তু বাইরে থেকে ঘুরে এসে শ্যামা যন্ত্রণায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। কী তীব্র অসহ্য যন্ত্রণা পেটে—মনে হ'ল যেন সাঁড়াশি দিয়ে কে ওর পেটের মাংস টেনে টেনে ছিঁড়ছে।

'ওকি বৌমা! ওমা কি হবে! এর মধ্যে তোমার ছেলেপুলে হবে নাকি? সাধ হ'ল না যে এখনও! দাইকেই বা কে খবর দেয়? ও বড় বৌমা, কি হবে মা, ওঠো না একবার!'

উঃ বাপ রে! শ্যামার মুখ বিবর্ণ, চোখ ঠেলে বেরোচ্ছে। যন্ত্রণায় সমস্ত দেহ কুঁচ্‌কে কুঁচ্‌কে উঠছে। তবু সম্ভাবনাটা মাথায় আসার পর থেকে যেন কী একটা আনন্দও হচ্ছে ওর, ঐ যন্ত্রণার মধ্যেই।

ক্ষমা তাড়াতাড়ি ছুটলেন পাশের বাড়িতে। অন্ধকারে, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে। পাশের বাড়ির গিন্নীটি অবশ্য খুব ভাল বলতে হবে। তিনি তখনই নিজের বড় ছেলেকে দাইয়ের সন্ধানে পাঠিয়ে ক্ষমার সঙ্গে চলে এলেন।

কিন্তু ততক্ষণে শ্যামায় ছেলে হয়ে গেছে, টুকটুকে কোল-আলো-করা পুত্র-সন্তান। শ্রান্তিতে শ্যামা চোখ বুজেছে।

ক্ষমা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে খোকাকে কোলে তুলে নিলেন।

হতভাগাটা কোথায় আছে, কী করছে কে জানে। পুত্র-সন্তানের মুখ প্রথম তারই দেখার কথা। তা সে ভাগ্যি কি আছে! ক্ষমার মনে মনে পরিতাপের শেষ রইল না।

·

আশ্বিন মাসের গোড়ার দিকে সত্যই দেবেন এসে হাজির হল একদা।

তাকে দেখে ক্ষমার চোখের জল আর বাঁধ মানে না; তাঁর অমন সুন্দর ছেলের কী হাল হয়েছে! নরেন তবু একটু ময়লা, দেবেনের রং ছিল কাঁচা সোনার মত। সে রং পুড়ে কালো হয়ে গেছে। চোখ কোটরগত, দৃষ্টি নিষ্প্রভ। গাল চড়িয়ে, রোগা হয়ে—একেবারে যেন বুড়ো হয়ে গেছে। হাতে পায়ে কি ঘা হয়েছিল, এখনও সব সারে নি।

রাধারাণীও বার বার চোখ মুছতে লাগল।

দেবেন বললে, 'কী করব? ছোটবাবুর তো ঐ অবস্থা। কোন পাত্তাই নেই। এধারে আমার চাকরিটি গেল—'

'সে কি রে, তোর যে পাকা চাকরি শুনেছিলুম।' ক্ষমা বাধা দিয়ে বলেন।

'তুমি ক্ষেপেছ মা! চাকরি আবার পাকা! বিশেষ আজকালকার বাজারে। সে থাক। এখন ঐ ত অবস্থা, বাড়ি কেনা হয় না, অথচ হাতে যা টাকা আছে, বসে বসে খেলে আর কদিন বলো? কী করব ভাবছি, এক বন্ধু পরামর্শ দিলে উড়িষ্যায় গিয়ে হরতুকির ব্যবসা করতে। নৌকো আর হাঁটাপথে সেখানে যেতে হয় কিন্তু খুব নাকি পয়সা কারবারটায়। তার ভোচ্‌কানিতে ভুলে সেই কারবার করতে গিয়ে হাড়ির হাল একেবারে। দেখ না, পথে ডাকাতি হয়ে যথাসর্বস্ব গেল, তারপর পড়লুম রোগে, তিন মাস হাসপাতালে পড়ে। একটু ভাল হয়ে উঠতেই সেখানে থেকে ছাড়া পেলুম বটে কিন্তু কোন্ মুখে তোমাদের কাছে এসে দাঁড়াব শুধু-হাতে? তাই ওখান থেকে চলে গেলুম আরায়—'

'সে আবার কোথায় রে?'

'সে আছে, বহু দূরে, পশ্চিমে। সেই কাশীর কাছাকাছি। ওখানে গিয়ে আর এক বন্ধুর পরামর্শ শুনে লাগিয়ে দিলুম ডাক্তারি। তা বলতে নেই, এখন একরকম জমিয়ে বসেছি।'

'ডাক্তারি? তুই কি ডাক্তারি করবি রে? শুনেছি পড়তে হয়, পাস করতে হয়!'

'সে তুমি জানো না। ওসব বন-দেশ, ওখানে কে পাস-করা ডাক্তার যাবে? পাঁচ সাত রকম মোটামুটি ওষুধ নিয়ে গিয়ে ওখানে বসেছি, তাইতেই চলে যায়। ওরা তাতেই খুশী।'

'তার পর? মানুষ-টানুষ মারবি না ত রে? শেষে কি হাতে দড়ি পড়বে?'

'কৈ এই ত ছ মাস কাটিয়ে এলুম। এখন সবাই আসছে আমার কাছে।'

মুখে মুখে এমনি উপন্যাস রচিত হয়ে গেল। আসলে দেবেনের এই শেষের ডাক্তারী করার গল্পটাই ঠিক। আগেরটা সর্বৈব মিথ্যা। মূর্খের হাতে টাকা পড়লে যা হয় তাই হয়েছিল ওরও। কয়েকটি হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জুটেছিল। তারপর দিনকতক একটু ফুর্তি না করতে করতেই টাকা কটা যেন পাখায় ভর করে উড়ে গেল। রেখে গেল শুধু নানাপ্রকারের কুৎসিত রোগ।

হাসপাতালে যাওয়ার কথাও অবশ্য ঠিক। নইলে উপায় ছিল না। সেখান থেকে বেরিয়ে পাঁচ-সাত টাকা ধার ক'রে ও আরায় চলে যায়। ওষুধ ছিল না একটাও, কেনবার টাকা কোথায়? ছিল এক বোতল সিরাপ আর রঙীন কাঁচের শিশিতে জল। আর শুধু ছিল একটু সোডা, সেও ঐ বন্ধুর পরামর্শ 'ডালরুটি আর ছাতু খায় ব্যাটারা—সোডা একটু ক'রে দিস জলের সঙ্গে মিশিয়ে, তাতে উপকারই হবে। রোগ যা ভাল হবার তা আপনিই হয়, যা হবে না তা কি আর ডাক্তারই ভাল করতে পারবে? ডাক্তারের হাতেই কি সব রুগী বাঁচে? তবে আর ভাবনা ছিল কি?'

এই বন্ধুটি সৎ-পরামর্শই দিয়েছিল। শহরে চার আনা ক'রে ফি নেয় দেবেন, গ্রামে গেলে আট আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত। গম্ভীরভাবে নাড়ী দেখে, চোঙ্গা বসায়—ফিরে এসে ওষুধ পাঠিয়ে দেয়। এক শিশি ওষুধ দু আনা রোগ সেরে গেলে লাউটা কুমড়োটা কপিটা—ডাল কড়াই গম, এসব ত আছেই ফলে এই দু'তিন মাসেই দেবেন একটা খচ্চর কিনেছে, এখন তাইতে চেপে দেহাতে ডাক্তারী করতে যায়।

দিন-তিনেক পরে মার কাছে বসে মাথাটাথা চুলকে দেবেন বললে, 'মা, আমাকে ত ফিরতে হয় এবার।'

'সে কি রে? এরি মধ্যে?'

'নইলে রুগীপত্তর যা হাতে এসেছে অন্য ঘরে চলে যাবে যে। এই কি আমার আসা উচিত হয়েছে! নেহাত তোমাদের জন্যে প্রাণটা ছটফট করছিল তাই।'

'তা তবে যা। কিন্তু আমাদের কি গতি হবে?'

আর একটু ইতস্তত ক'রে দেবেন বললে, 'ওখানে একটা ঘর নিয়েছি বটে—কিন্তু খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে। খেটেখুটে এসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়া—সে আর পোষায় না।'

'কেন ওখানে ঠাকুর-টাকুর—'

'তুমি ক্ষেপেছ মা! এতকাল পরে ঐ খোট্টা বামুনের হাতে খাব আমি? ওদের কি জাতের ঠিক আছে! মাঠ থেকে ফিরে এসে কাপড় ছাড়ে না!'

ক্ষমা কল্পনাও করতে পারবেন না কোনদিন যে পতিতালয়ের ভাত ও মাংস দুইই দেবেনের চলে গিয়েছে ইতিমধ্যে। সেটা জেনেই দেবেন নিশ্চিন্ত হয়ে কথাটা বলতে পারলে।

ক্ষমা একটুখানি চুপ করে থেকে চিন্তিতভাবেই বললেন, 'তা হ'লে তুই কি আমাদের নিয়ে যেতে চাস? কিন্তু নরো ত কোন খবরই রাখছে না, কোনদিন যদি ফিরে আসে আমাদের খোঁজটা পর্যন্ত পাবে না!'

দেবেন চীৎকার ক'রে উঠল, 'ও হারামজাদার নাম করবে না আমার সামনে এই বলে দিলুম, বাস্। নইলে খুনোখুনি হয়ে যাবে। চিরদিন তোমার এক ভাবেই গেল। তোমার যেন একটা অযথা স্নেহ ওর ওপরে, তোমার প্রশ্রয়েই ত ও এতটা উচ্ছন্ন যেতে পারলে! নচ্ছার, বোম্বেটে, বদমাইশ, বেজন্মা কোথাকার!'

শ্যামা আড়াল থেকে শিউরে উঠল। ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল—ভাশুরের কথার মধ্যে যে সংশয়টা প্রচ্ছন্ন ছিল সেটা অনুমান ক'রে।

ক্ষমাও ছেলের রাগ দেখে তাড়াতাড়ি কথাটা চেপে গিয়ে বললেন, 'তা সে তার যা খুশি হোক গে, এখানে না পায় বৌমার মার কাছে ত একবার খবর নেবে। কী আর করা যাবে।'

দেবেন মুখখানা গোঁজ করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'সব সুদ্ধ যাবার কথাই বা কে বলেছে? আমার নতুন ডাক্তারী, এতগুলো লোককে ঘাড়ে নিয়ে গিয়ে চালাবো কি ক'রে? থাকি তো একখানা ঘরে।'

অবাক হয়ে ক্ষমা প্রশ্ন করেন, 'তবে?'

'এখনকার মত তোমার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকেই শুধু নিয়ে যাব।'

দেবেন উদাসীনভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত বিস্ময়ে ক্ষমার মুখ দিয়ে কথাই বেরোল না। তারপর শুধু আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলেন, 'তা হ'লে আমাদের কি হবে? এই নির্জন বান্দাপুরীতে দুটো মেয়েছেলে পড়ে থাকব? আমি ত এই বুড়ো হয়েছি, যদি ভালমন্দ কিছু হয়? ও ত দুধের মেয়ে—তার সঙ্গে একটা বাচ্চা, কি ক'রে

সামলাবে? আমরা খাবোই বা কি তাও ত জানি না। সব ত উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলি!''

দেবেন বললে, 'তা ব'লে কি সবাই চলে যাওয়াই ঠিক হবে? এই ত নিজেই বলছিলে যদি নরো ফিরে আসে? সে কাউকে খুঁজে না পেয়ে কী করবে সেটা ভেবে দেখেছ? তাকে কি একেবারে ভাসিয়ে দেওয়া ঠিক? তুমি ত তারও মা।'

ক্ষমার আর বেশি বিস্মিত হবার অবস্থা ছিল না। তিনি শুধু ওর দিকে চেয়েই রইলেন। দেবেন একটু থেমে বললে, 'না হয় বৌমাকে কলকাতাতে ওর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও। তুমি থাকো এখানে—একটা ঝি-টি দেখে নাও। আমি না হয় চার-পাঁচ টাকা ক'রে পাঠাবো'খন্। না হয়...চার-পাঁচ মাস দ্যাখো অন্তত, তখনও নরো না ফেরে আমি তোমাকে এসে নিয়ে যাবো এখন।'

'তোমাকে' শব্দটার ওপর অতিরিক্ত জোর দিলে দেবেন।

ক্ষমা একটুখানি চুপ করে থেকে উঠে অন্যত্র চলে গেলেন। যাবার সময় শুধু শান্ত ভাবেই বলে গেলেন, 'সে আমরা যা হয় করব এখন—তোমার যাওয়ার দরকার, ভাল দিন দেখে চলে যাও। আমাদের জন্য ভাবতে হবে না তোমাকে।'

'ঐ ত—সে ত জানি চিরদিন। নরোর সাত খুন মাপ। আমি যদি ভাল করতে যাই ত সেও খারাপ। বেশ তাই করব। কালই নিয়ে যাব। তার মা নয়; আমার একার মা? আমিই বা বইব কেন? আমি উড়িয়ে দিয়েছি পয়সা, সে ওড়ায় নি? বেশ করেছি উড়িয়েছি, আমার পৈতৃক সম্পত্তি আমি উড়িয়েছি!'

চীৎকার ক'রে দেবেন গজরাতে লাগল বহুক্ষণ পর্যন্ত।

রাধারাণী অভিশাপের ভয়ে শাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়ে ছলোছলো চোখে বললে, 'আমাকে মাপ করুন মা—উনি যে এমন কথা বলবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। না বলবারও যো নেই, জানেন ত মানুষকে। আমার যেন মাথা কাটা যাচ্ছে মা লজ্জায়।'

সস্নেহে ওকে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে ক্ষমা বললেন, 'তোমার লজ্জা কি মা, তোমার দোষই বা কি? ওকে কি আর চিনি না। অমানুষ ছেলে পেটে ধরেছি, তার ফল ভোগ ত আমাকেই করতে হবে। তোমাদেরও এই শাস্তির মধ্যে ফেললুম—সেই আমার সব চেয়ে বড় লজ্জা। বিয়ে যখন হয়েছে মা, স্বামী যেখানে নিয়ে যাবে তোমাকে ত যেতেই হবে।'

রাধা জায়ের হাত ধরে কেঁদেই ফেললে। এতদিন একান্ত সাহচর্যে সে জাকে ভালই বেসেছিল একটু। বললে, 'ভাই, এ আমার সুখের যাওয়া নয় বিশ্বাস কর!' তারপর একটু থেমে মাথা নীচু ক'রে বললে, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে ভাই, ও

খারাপ রোগ-টোগ কিছু নিয়ে এসেছে। বড্ড ভয় করছে।'

শ্যামা অবাক হয়ে বললে, 'খারাপ রোগ কি দিদি? সে কেমন ক'রে হয়?'

'তা ঠিক জানি নে ভাই, তবে শুনেছি লোকের মুখে, খারাপ মেয়েমানুষের কাছে গেলে নাকি কী সব হয়! তোমাকে যেন কোনদিন জানতেও না হয়। কিন্তু আমার যেন কেমন লাগছে।'

দেবেন পরের দিনই রাধারাণীকে নিয়ে চলে, গেল যাবার সময় মাকে প্রণাম ক'রে পায়ের কাছে তিনটি টাকা রেখে গেল। ওপাশের দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'এখন আর নেই হাতে, এতটা পথ যেতে হবে, খালি হাতে ত যাওয়া যায় না। গিয়ে বরং দু-একদিনের মধ্যে কিছু পাঠাব এখন—'

ক্ষমা সারাদিন রান্নাঘরে বন্ধ হয়ে ছিলেন কিন্তু যাত্রার সময় পুত্রবধূ বিশেষত, পৌত্রের কল্যাণের কথা স্মরণ ক'রেই না বেরিয়ে থাকতে পারলেন না। তেমনি আর একটি পুত্রবধুর কথা স্মরণ ক'রেই টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দেবার লোভ সংবরণ করলেন। শুধু বললেন, 'ওকে বলো বড় বৌমা, পথেঘাটে যদি দরকার হয় ত ওটাও নিয়ে যাক্। যখন ভাল বুঝবে পাঠাবে। আমাদের এতকাল যেভাবে কেটেছে সেই ভাবেই কাটবে।'

দেবেন ততক্ষণে গরুর গাড়িতে গিয়ে উঠেছে—সে আর উত্তর দিলে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক

বিরাট খালি বাড়িটা হা হা করে। সব ঘরগুলোই বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে একটা ছাড়া। তবু যেন শ্যামার গা ছমছম করে। সেটাই যেন একটা বিভীষিকা। দেবেনরা চলে যাওয়ার পর থেকে ক্ষমাও কথাবার্তা বিশেষ বলেন না, শুধু নিঃশব্দে চোখের জল মোছেন আর মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। শ্যামাই বা নিজে থেকে তাঁর সঙ্গে কী কথা কইবে, কী ব'লে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায় না। সে-ও চুপ ক'রে থাকে। সেই প্রচণ্ড এবং দুঃসহ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় একমাত্র যখন ওর খোকা কেঁদে ওঠে তখনই। কিন্তু তার কান্নার শব্দ খালি বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়ে এমন একটা বিচিত্র ধ্বনির সৃষ্টি করে যে শ্যামা কতকটা ভয় পেয়েই তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে চুপ করাতে চেষ্টা করে।

ক্ষমা অবশ্য একাধিক দিন বলেছেন শ্যামাকে, ছেলেই যখন মায়ের মুখ চাইলে না তখন তুমি পরের মেয়ে কেন মিছে কষ্ট করছ মা, তোমার কিসের দায়িত্ব,

তুমি কলকাতা চলে যাও, আমার দিন একরকম ক'রে কাটবেই।'

শ্যামা কিছুতেই রাজী হয় নি, সেও উল্‌টো প্রস্তাব করেছে, 'তা হ'লে আপনিও চলুন কলকাতায়। আমার মা আপনাকে মাথায় ক'রে রাখবেন।'

ক্ষমা জিভ কেটে বলতেন, 'সে আমি জানি মা। কিন্তু বুড়ো বয়সে ছেলের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠব এক মুঠো ভাতের জন্যে, সে বড় লজ্জার কথা। সে পারব না।'

পাড়ার সবাই ছি ছি করে। তাদের সেই সরব সহানুভূতি যেন তীরের মত বেঁধে শ্যামাকে, অথচ কী বা তার বলবার আছে ? তার স্বামী বা ভাশুর যা—তাই তারা বলে মাত্র। তারা ওদের প্রাণ-ধারণের উপায় ক'রে দিয়ে ধিক্কার দিচ্ছে তাদের, যাদের সে উপায় করবার কথা। রাগ করার কথা নয়, বিবাদ করার কথাও নয়—কৃতজ্ঞ থাকারই কথা। শ্যামাও তাই থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু তখনও যেটুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান তার ছিল তা যেন নিঃশব্দ দহনে তাকে দগ্ধ করে।

স্বামীর কথা ওর মনে হয় যেন ছবির মত। এরই মধ্যে যেন তার চেহারাটা মনের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। যারা বহুদিন পর্যন্ত স্বামীর চেহারা ধ্যানের মধ্যে উজ্জ্বল ক'রে রাখে তাদের কথা শ্যামা জানে না—তবে তার এখনই স্পষ্ট ক'রে মনে করতে যেন অসুবিধা হয়। শুধু মনে আছে স্বামী তার সুন্দর ; তার সঙ্গের, তার সাহচর্যের আনন্দানুভূতিটা শুধু আজও ভোলে নি।

মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ভাবে, উন্মত্ত ভাবেই সেটা মনে পড়ে। সমস্ত মন আকুলি-বিকুলি ক'রে ওঠে তাকে পাবার জন্য, তাকে জড়িয়ে ধরার জন্য। ক্ষোভে দুঃখে সে সময় ওর মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করে, মনে হয় নিজের কোন দৈহিক যন্ত্রণার কারণ ঘটলে যেন সে কতকটা সুস্থ হ'তে পারত। এই সময়গুলোতে স্বামীর কোন অপরাধের কথাই মনে থাকে না, শুধু মনে হয় সে ফিরে আসুক। কিছু বলব না তাকে।

এমনি ক'রে আরও কয়েক মাস কাটবার পর হঠাৎ কলকাতা থেকে চিঠি এল, উমার বিয়ে। শ্যামাকে কি পাঠানো সম্ভব হবে ? তাহ'লে রাসমণি লোক পাঠাতে পারেন তাকে নিয়ে যাবার জন্য।

ক্ষমা চিঠি পড়া শেষ ক'রে বধূর মুখের দিকে চাইলেন।

'কি করবে বৌমা ?'

উমা তার যমজ বোন। শৈশব ও বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গিনী। একই বোঁটায় দুটি ফুল একসঙ্গে ফুটে উঠেছিল।

উমা, এক মুহূর্তও যাকে দেখতে না পেলে শ্যামা ঠিক থাকতে পারত না।

রাত্রে মায়ের ছু'পাশে ছুজন শুয়ে মায়ের বুকের ওপর দিয়ে পরস্পরের হাত ধরে থাকত। উমা যেন তার নিজের অস্তিত্বেরই একটা স্বতন্ত্র প্রকাশ ছিল।

সেই উমার বিয়ে! ওর সমস্ত মন দেহ, ওর সমস্ত সত্তা সেই মুহূর্তে চাইল পাখা মেলে উড়ে যেতে ওদের কলকাতার সেই ছোট্ট দোতলা বাড়িটাতে। যার ছাত ও চিলেকোঠায় ওদের ছুই বোনের বাল্যের শত সহস্র স্মৃতি জড়িত আছে।

কিন্তু সেই উমার বিয়ে ব'লেই যাওয়া সম্ভব নয়।

বধূকে নিরুত্তর দেখে ক্ষমা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিলেন। ম্লান হেসে বললেন, 'ভাবছি, কী যৌতুক করবে তোমার বোনকে। একটা কিছু না দিলে ত মান থাকে না। অন্তত আইবুড়ো ভাতের একটা শাড়িও ত নিয়ে যেতে হবে।'

'আমি যাবো না মা।'

'যাবে না বৌমা? কেন মা?' প্রশ্ন করলেন বটে কিন্তু ক্ষমার কণ্ঠে যে উদ্বেগ প্রকাশ পেল সে যেন, যদি বৌমা মত বদল করে এই আশঙ্কার।

শ্যামা নতমুখেই জবাব দিল, 'কী প'রে গিয়ে দাঁড়াব মা? গহনা ত সবই সেখানে রইল। আছে কিনা তাও জানি না। বেনারসী শাড়িটা পর্যন্ত এখানে নেই। ভাল কাপড়ও ত নেই একখানা। এ অবস্থায় সেখানে গেলে নানা লোকে নানা কথা বলবে মা—কটার উত্তর আমি দেব? আপনার ছেলের কথাই বা কি বলব। আর যৌতুকের কথা ত আছেই। তাছাড়া একেবারে একা আপনাকেই বা কার কাছে রেখে যাব?'

'সে না হয় ছুলে-বৌকে ছুদিন রাত্তিরে থাকতে বললুম। কিন্তু বাকী কথা গুলোই—'এই পর্যন্ত ব'লে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোমার কপাল মা! নইলে নিজের বোনের বিয়ে আর এই তোমার মায়ের শেষ কাজ, যেতে পারলে না। আমারও কপাল যে জোর ক'রে তোমাকে যাও বলতে পারলুম না। সত্যিই ত, কীই বা প'রে যাবে, দেওয়ার কথা বাদই দাও। তোমার মাকেই বা কী বলবে, তিনি ত আর কিছু কম দেন নি!'

তারপর একটু থেমে ওর পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বললেন, 'তবে একটা কথা ব'লে রাখি, স্বামীর সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গেলে কারুর ছেলে কি কারুর বাবা এমন ব'লে উল্লেখ করতে নেই মা—ওতে নিন্দে হয়।'

কটা দিন যেন ভূতে পাওয়ার মত কী এক ঘোরে ঘুরে বেড়াল শ্যামা। ওর দেহটা আছে এখানে কিন্তু সমস্ত আত্মা যেন সেখানকার সেই বাড়িতে। কখন কি হচ্ছে সেখানে—এ ওকে ব'লে দেবার দরকার নেই। অবসর বা কাজকর্মের

মধ্যেও সবটা যেন ওর চোখের সামনে ঘটছে। চোখ বোজবারও দরকার নেই, এমন কি চোখ অপর কোন বস্তুর বা ব্যক্তির দিকে মেলা থাকলেও দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে অন্য জিনিস। দিদি এসেছে। দাদাবাবু। খোকা। বড় মাসিমা তাঁর বিখ্যাত হেঁসেলের ঘটি নিয়ে রান্নাঘরের চৌকাঠে এসে বসেছেন। তিনি বাল্যবিধবা, হুতাশনের মত প্রচণ্ড জ্বালা বুকে নিয়ে আজ এর বাড়ি কাল ওর বাড়ি ক'রে বেড়ান। ইহজগতের সম্বল বলতে তাঁর আছে মাত্র ঐ ঘটিটি। কোথাও কোন আশ্রয় নেই, আর কোন সম্পত্তি নেই। থান-দুই-তিন থান কাপড় ও ঐ ঘটি—তাঁর সংসার। যখন যেখানে থাকেন গৃহস্থর কোন কাজে আসেন না, তাদের খান অথচ অহরহ গালাগালি দেন। কুলীনের ঘর—বাপ-মা দেখেশুনে এক অথর্ব বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিধবা হবার পর বলতেন, 'ভবিতব্য, নইলে কত বুড়ো ত বেঁচে আছে!' সেইজন্য বাপ-মাকেও গালাগালি না দিয়ে বড় মাসিমা জলগ্রহণ করেন না। তাঁদের উল্লেখ করতে গেলেই বলতেন—'উঁ, বলে কিনা ভবিতব্যি! দিলি জেনে-শুনে ঘাটের মড়াকে, তার আবার ভবিতব্যি কি? তোরাই ত ভবিতব্যি। ইনি ভবি আর উনি তব্যি। দুজনে মিলে আমার কপালটাকে কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়েছেন!'

তবু বড় মাসিমাকে বাদ দেবেন না মা নিশ্চয়ই। তিনি রান্নাঘরের চৌকাঠ জুড়ে বসে পাহারা দিচ্ছেন তাঁর নিরামিষ রান্না কেউ আঁশ ক'রে না ফেলে কিংবা অপর কেউ না ছোঁয়। আর এসেছেন মেজমামা। মেজমামা আর মেজমামার ছেলে, এঁরা কখনও মাকে ত্যাগ করেন নি। কাকারা কেউ আসবেন না এটা ঠিক, তবে এক খুড়তুতো দাদা কলকাতাতেই থাকে মেসে, সে মাঝে মাঝে এসে মার কাছে খেয়ে যায়—সে আসবে। আরও এদিক ওদিক থেকে—পাড়ার সব কাকীমা মাসিমা বৌদির দল।

কোথায় বাজারগুলো এনে ঢালা আছে তা শ্যামা জানে। পান সাজার সরঞ্জাম সিন্দুকের নিচেই রয়েছে নিশ্চয়। দিদি উমার বেনারসী কাপড়খানা দেখাচ্ছে সবাইকে। দাদাবাবু রসিকতা করছেন আর ভিয়েনের আয়োজনে ব্যস্ত। ঐ কাজটা তিনি জানেন ভাল।

উমার বর কেমন দেখতে হ'ল কে জানে! উমা শ্যামারই যমজ, ঐ রকমই সুন্দর দেখতে, তবে রঙটা ওর মত অত গোলাপী নয়—একটু হল্‌দেটে। মা বলেন, হরতেলের মত রং। তা হোক, তাতেই যেন আরও সুন্দর দেখায়—উমা, নামেও উমা দেখতেও তাই, সাক্ষাৎ দুর্গা যেন। নিশ্চয় ওর বরও দেখতে ভাল হয়েছে। মা জামাই না দেখে করেন না। দিদিকে দোজবরেয় দিয়েছেন বটে—কিন্তু

দাদাবাবুর কী চেহারা, যেন মহাদেব। তারও ত—

থাক্, তার স্বামীর কথা নির্জনে মনে হ'লেও চোখে জল ভরে আসে।

আহা উমা যেন সুখী হয় তার স্বামীকে নিয়ে। যেমনই দেখতে হোক সে সুন্দরে আর কাজ নেই!

বিয়ের তারিখ যত এগিয়ে আসে শ্যামার মন তত হু-হু করে। ক্ষমা বধূর দিকে চেয়ে দেখেন আর নিজেও চোখের জল মোছেন আড়ালে। বিয়ের তারিখ যেটা, সেদিন ভোরে আর শ্যামা কিছুতেই স্থির থাকতে পারলে না। ভোরবেলা ওর কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে উঠে ক্ষমা দেখেন ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে মেঝেতে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে শ্যামা। আজ আর তার কোনও বাঁধ নেই, আজ আর ধৈর্যের অভিনয় করা সম্ভব নয়।

ক্ষমা একটি সান্ত্বনার কথাও মুখে উচ্চারণ করতে পারলেন না। শুধু পাশে গিয়ে বসে ওর মাথাটা জোর ক'রে নিজের কোলে তুলে নিলেন।

সারারাত ঘুমোয় নি শ্যামা। ওদের রাত জেগে কুটনো কোটার সময় সে অদৃশ্য থেকেই সারারাত যেন সেখানে ছিল। শুধু জল সইতে যাবার সময়টা মনে পড়ে আর কিছুতেই নিজেকে বেঁধে রাখতে পারে নি।

সত্যিই সে উমার বিয়েতে রইল না!

দুই

কিন্তু তার পরের দিনের পরের দিন, আইনত যেদিন উমার ফুলশয্যা হবার কথা, সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসে হাজির হ'ল নরেন।

শ্যামা যেন চোখকে বিশ্বাসই করতে পারে না, সে বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল শুধু। নরেন রসিকতা করার চেষ্টা ক'রে বললে, 'কি গো', ভূত দেখলে নাকি? মাইরি, এত রকম ন্যাকামোও জানো!'

শ্যামা আরও অবাক হয়ে গিয়েছিল ওর চেহারা দেখে। শেষ ওকে দেখেছিল, সিল্কের পাঞ্জাবি দেশী ধুতি পরনে; সোনার ঘড়ি চেন। আজ সেখানে ছেঁড়া আধ-ময়লা কাপড়, একটা সুতো-সরা ছিটের কোট। কাপড় হাঁটু অবধি তোলা, এক পা ধুলো, খালি পা। একটা পুঁটুলি হাতে। আর তেমনি চেহারা, চুল গুলো রুক্ষ, সর্বাঙ্গে কে কালি মেড়ে দিয়েছে যেন—এত কালো ওর স্বামী কখনই নয়! রোগা, ঘাড়টা সরু হয়ে গিয়েছে। অমন পুরন্ত গাল কে যেন চড়িয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে ভেতরে। অত বড় বড় চোখ তাও কোটরগত। সবচেয়ে ওর সন্দেহ হ'ল—বোধ হয় চুলেও কিছু কিছু পাক ধরেছে এই বয়সেই। হাতের কব্জিতে

ও পায়ের গোছে পাঁচড়ার মত ঘা। সর্বাঙ্গে খড়ি উঠেছে—মনে হয় যেন কত মাস স্নান করে নি।

সে অবাক হয়ে দেখেই চলেছে, এমন সময় ক্ষমাও 'কে এল গা বৌমা' ব'লে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে যেন পাথর হয়ে গেলেন ছেলেকে দেখে। কী যেন বলবার চেষ্টা করলেন, কিছুক্ষণ পরে ঠোঁট দুটো নড়লও বার কয়েক, কিন্তু কোন স্বরই বেরোল না তা থেকে—এবং নরেন যখন এগিয়ে এল ওঁর দিকে, বোধ হয় প্রণাম করবারই ইচ্ছে ছিল,—তিনি একটি কথাও না বলে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে সশব্দে দোর বন্ধ ক'রে দিলেন।

'বা রে! বেশ ত! মজা মন্দ নয়! মাও ঢং শিখেছে কত!'

অপ্রতিভ না হবার চেষ্টা করতে করতে নরেন আবার পিছিয়ে এল। তারপর পুঁটুলিটা শ্যামার কাছাকাছি মেঝেতে নামিয়ে রেখে বলল, 'উমির যে বিয়ে হয়ে গেল। কৈ, তোমরা যাও নি ত কেউ ?'

এ প্রশ্ন নরেনের পক্ষেই করা সম্ভব, শ্যামা এতদিনে স্বামীকে এটুকু বুঝেছিল। তাই সে কোন অনুযোগের চেষ্টাই করলে না। কিন্তু বিস্মিত সে হ'ল রীতিমতই। সব ভুলে গিয়ে প্রশ্ন করলে, 'তুমি কি ক'রে জানলে ?'

'আরে, আমি কি জানি যে তুমি এখনও এখানে আছ। আমি ভেবেছি তোমাকে শাশুড়ী ঠাকরুন নিশ্চয় কলকাতাতে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন—যা আদুরে মেয়ে তুমি !'

'অনুযোগ করব না' মনে করলেও এক এক সময় অসহ্য হয় বৈকি। শ্যামা ব'লে ফেললে, 'আর বুড়ো মা তোমার, তাঁকে কোথায় রেখে যাবো ?'

'আমি ত ভেবেছিলুম মা-টা এতদিনে মরেই গেছে। নইলে দাদা হয়ত এসে নিয়ে-টিয়ে গেছে কোথাও। তাই আগেই খোঁজ করতে গিয়েছিলুম কলকাতাতে।'

'তুমি, তুমি এই ভাবে সেখানে গিয়েছিলে নাকি ?' শিউরে ওঠে শ্যামা; প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে সে।

এবার নরেনও একটু অপ্রতিভ হয়, 'আরে, আমি কি আর বিয়েবাড়ি জেনে গিয়েছিলুম ! তারপর শাশুড়ী ছাড়লেন না, তা কি করি বলো। তিনি এত কথা জানতেনও না দেখলুম। আমার মুখেই সব শুনলেন। তুমি ত আচ্ছা চাপা মেয়ে ! ধড়িবাজ বটে বাবা !'

তারপর নিজের রসিকতায় নিজেই খানিক হেসে নিয়ে বললে, 'তাই ব'লে বলতে পারবে না যে একা একা খেয়ে এসেছি সাথকপরের মত। তোমার জন্যে দিব্যি ক'রে চেয়ে-চিনতে ছাঁদা বেঁধে এনেছি। লুচি মিষ্টি সব রকম। মাছটা

খারাপ হয়ে যাবে তাই—'

আর শ্যামার পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব হ'ল না।

'তোমার গলায় দড়ি জুটল না, তাই আবার তুমি ঐ খাবার বয়ে নিয়ে এলে! গলায় পৈতেগাছটা ত ছিল। না, তাও বেচে খেয়েছ? ছি ছি, আমারই যে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে।'

শ্যামাও তার শয়নঘরে ঢুকে সশব্দে কপাটটা বন্ধ ক'রে দিলে।

'ইস্, ভারি যে লম্বা লম্বা কথা শেখা হয়েছে! দ্যাখো সবাই মিলে অমন ক'রে আমাকে ঘাঁটিও না বলে দিচ্ছি। গলায় দড়ি! দড়ি দেওয়া বার ক'রে দেব একেবারে। বজ্জাতের ঝাড় কম্‌নেকার!'

পূর্ব-অভ্যাসমত খানিকটা দাপাদাপি করলেও আগের মত জোর আর পাওয়া গেল না নরেনের কণ্ঠস্বরে। বরং কিছুক্ষণ পরে ক্ষমার দোরের কাছে গিয়ে অনভ্যস্ত কণ্ঠে একটু মাপ চাইবারও চেষ্টা করলে!

ক্ষমাকেও বেরিয়ে আসতে হ'ল। যে অমানুষ তাকে ক্ষমতা থাকলে শাসন করা যায় কিন্তু তার ওপর অভিমান করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছু নেই। তিরস্কারও করলেন খানিকটা—বৃথা জেনেও।

নরেন কিন্তু বেশ সপ্রতিভ ভাবেই আত্মসমর্থন করলে। বললে, 'বা রে, সব দোষ বুঝি আমার? একে কলকাতা শহর, তায় আমি ছেলেমানুষ, হাতে অতগুলো কাঁচা পয়সা—মাথার ঠিক থাকে কখনও? আর আমি না হয় ঠিক রাখলুম, পাঁচজনে রাখতে দেবে কেন? দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে ইয়ারবগ্‌গ এসে জুটল—ব্যস্, মদ মেয়েমানুষ, ও কটা পয়সা আর কদিন?'

'য়্যাঁ।' প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠেন ক্ষমা, 'তুই বাড়ি করার টাকা এমনি ক'রে মদে-মেয়েমানুষে উড়িয়ে দিয়ে এলি? আর তাই আবার বড় গলা ক'রে আমার সামনে বলছিস্? হ্যাঁ রে, ঘেন্না পিত্তি কি তোদের কিছু নেই কোথাও? সেও এক-জন কি পেঁসের কারবার করার নাম ক'রে সব উড়িয়ে দিলেন আর ইনি—'

বিশ্রী একটা ভঙ্গি ক'রে নরেন বলে, 'ইল্ লো! কে কারবার ক'রে পয়সা উড়িয়েছে তাই শুনি? দাদা?'

ক্ষমার মনে প্রথম একটা সংশয় দেখা দেয়। তিনি থতিয়ে গিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, তাই ত বললে সে।'

হো হো ক'রে অনেকক্ষণ ধরে হাসে নরেন, 'মাইরি, দাদা বেশ বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারে ত! নবেল লিখলে ওর দু পয়সা হ'ত। ঐ আমিও যে পথে গিয়েছি, দাদাও সেই পথের যাত্রী। এক পাড়াতেই যে দুজনে গিয়ে পড়েছিলুম। দাদা কার

ঘরে যেত তা আর আমি জানি নি! দুজনেরই খারাপ রোগ ধরল, আমি সামলে নিলুম, দাদা এখনও ভুগ্‌ছে।...কারবার! কারবারই বটে!'

সম্পূর্ণ নির্লজ্জ ভাবে কথাগুলো ব'লে সগর্বে চেয়ে রইল নরেন। দাদার জুচ্চুরিটা ধরে দিতে পেরে সে এইবার সত্যি-সত্যই খুশি হয়েছে।

ক্ষমা স্তম্ভিত ভাবে বসে রইলেন। নরেন অমানুষ এ তিনি চিরকালই জানেন, কিন্তু দেবেন? সেও এতগুলো মিছে কথা ব'লে গেল?

নরেন বললে, 'দাদা আর কি বানিয়ে ব'লে গেছে তাই শুনি।'

'সে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে না তুই বলছিস্ কেমন ক'রে বুঝব? নিজে ল্যাজ-কাটা শিয়াল, অপরের ল্যাজও কাটতে চাইছিস্ কিনা কে জানে!'

'মাইরি মা, তোমার দিব্যি বলছি—'

নরেন মায়ের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল, ক্ষমা যেন সভয়ে গিয়ে বললেন,—'ছুঁস নি ছুঁস নি—তোদের পেটে ধরেছি এই পাপেই আমাকে নরকে যেতে হবে—আর ছুঁয়ে এখন পাপ বাড়াব না। কত জন্মের পাপ ছিল তাই এ জন্মে এমন ছেলে পেটে ধরেছি!'

নরেন ঠিক এতটা আশা করে নি। কারণ তার নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সে নিজে মোটেই সচেতন নয়। মাকে সে ধরতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তিনি সরে যাওয়ায় পড়ে যাবার উপক্রম হ'ল। সেটা সামলে নিতে বেশ একটু বেগ পেলে। একটু অপ্রতিভও হ'ল—ও নিজে বুঝতে পারলে না কেন—তারপর সেটা সামলাবার জন্যে আপন মনেই সেই শূন্য দালানে দাঁড়িয়ে খানিক আস্ফালন করতে লাগল, 'ও, না ছুঁলে ত বড় বয়েই গেল। ভারি ত! আমার ত বড় ক্ষেতি! দাদা এসে মিছে ক'রে বানিয়ে ব'লে বেশ সতী হয়ে গেল। আমার বেলা যত বাচ-বিচার। বেশ, আমি আসব না না-হয়, অত কি!'

রাত্রে আহারাদির পর শ্যামা অন্য দিনের মত যখন ক্ষমার বিছানাতে এসেই বসল তখন তিনি একটু বিস্মিত হলেন। বোধ হয় একটু উদ্বিগ্নও। বললেন, 'আর এত রাত্রে এখানে কেন মা, একেবারে ও ঘরে শুয়ে পড়োগে। খোকা বরং থাক্ এখানে—যদি রাত্রে খুব কান্নাকাটি করে ত ডেকে দিয়ে আসব এখন!'

শ্যামা অভ্যাসমত শাশুড়ীর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে খানিক পরে বললে, 'আমি এখানেই থাকি না মা। আমার আর ভাল লাগছে না।'

ক্ষমা উঠে বসলেন। বধূকে প্রায় কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, 'তা জানি মা। আমিও ত মেয়েছেলে, ও সব কথা শোনবার পর স্বামীর কাছে যেতে যে কী

ঘেন্না হয় মা তা আমি বুঝতে পারি। আমরা বরং সতীন সয়েছি অনায়াসে। তাতে অত ঘেন্না হয় না—এর ভেতরে যে নীচতা আছে তাতে তা নেই, কিন্তু কী করবে মা। এ হিন্দুর বিয়ে, মুছে ফেলবার নয়, তালাক দেবারও নিয়ম নেই। যখন ঐ ঘরই করতে হবে তখন সহ্য করা ছাড়া উপায় কি বলো! শুধু শুধু, ওকে তো জানো মা—একটা চেঁচামেচি গণ্ডগোল, মারপিট করাও বিচিত্র নয়। এই নিষুতি রাত, একটু চেঁচালেই শোনা যায়। পাড়াশুদ্ধ ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে মা!'

শ্যামা ওর শাশুড়ীর কোলের মধ্যেই মুখ গুঁজে পড়ে ছিল এইবার উঠে বসল। আঁচলে চোখ মুছে মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল।

'আপনি দোর দিয়ে শুয়ে পড়ুন মা।'

বাইরে থেকে সহজ অথচ শুষ্ক স্বরে কথাগুলো বললে সে, কতকটা যন্ত্র-চালিতের মত।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে যেখানে পড়ল সেটা ঘেরা দরদালান। ক্ষমার ঘরের পাশেই সিঁড়ি, তার পাশের ঘরে আজ নরেনের বিছানা করা হয়েছে। তাদের বিছানা।

কলের পুতুলের মতই শ্যামা সেদিকে দু পা এগিয়ে গেল কিন্তু সিঁড়ির কাছাকাছি যেতেই যেন ওর চমক ভাঙল। আছে, এখনও উপায় আছে। পালিয়েই যাবে নাকি শেষ পর্যন্ত!

ঐ সিঁড়ি, সিঁড়ি দিয়ে নামলেই নিচের দালান—দোর খুলে বেরিয়ে পডলে কেউ জানতেও পারবে না।

তারপর?

পাশেই কুণ্ডুদের পুকুর। আর একটু এগিয়ে গেলেই গঙ্গা।

চিরদিনের মত শান্তি। এ যন্ত্রণা আর সইতে হবে না।

শ্যামা স্থির হয়ে দাঁড়াল। লোভ! হয়ত লোভই হবে। মৃত্যুর ওপর যে লোভ হয় তা কে জানত! এই ত ওর মোটে পনরো-ষোল বছর বয়স, ভরা যৌবন এতদিন কি প্রচণ্ড ভাবেই না কামনা করেছিল ও স্বামীকে। নিষ্ঠুর নির্বোধ, পশু—তবু ও তাকে চেয়েছিল, ওর প্রথম যৌবনের সমস্ত উগ্র কামনা দিয়ে স্বামীর কথাই চিন্তা করেছিল শুধু। আজ সেই স্বামীই উপস্থিত, প্রায় এক বৎসরের অনুপস্থিতির পর।

তবে?

কিন্তু এ বুঝি পশুরও বেশি। ঘরে যার নববিকশিত পদ্মের মত রূপসী বধূ সমস্ত অন্তরের বাসনায় দীপটি জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছে, স্বপ্নের মত প্রণয়রজনীগুলি আবেগ-থরথর বাসনায় যেখানে উন্মুখ হয়ে রয়েছে—সেখানে না এসে, সে বধূর দিকে

না চেয়ে যে গেল একটা ঘৃণ্য রূপোপজীবিনীর ঘরে, কুৎসিত ব্যাধিতে নিজের স্বাস্থ্য ও যৌবনলাবণ্য বোধ হয় চিরকালের মতই নষ্ট ক'রে এল, সে পশুর চেয়েও অধম। পশু চায় দেহের প্রয়োজন মেটাতে, সেখানে সে পাত্রাপাত্র বিচার করে না—কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন ছিল না? যেখানে শুধু জঘন্য জীবন, শুধু পাঁক, শুধু মালিন্য, শুধু ক্লেদের প্রতি আকর্ষণ, মোহ—সেখানে কোন্ স্তরে ফেলবে সে মানুষকে?

সেই পুরুষের আলিঙ্গনের মধ্যে নিজের দেহকে এলিয়ে দিতে হবে?

ভাবতেও যেন শিউরে ওঠে সে। অথচ—

খোকা? শিউলি ফুলের মত নরম, পদ্মের মত পবিত্র যে ফুলটি তার এই দেহ-লতায় মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে, যা তার ঈশ্বরের দেওয়া দান, তাকে ছেড়ে যেতে হবে?

মা, দিদি, উমি। জননীর মত স্নেহশীলা তার শাশুড়ী।

শ্যামা সিঁড়ির কাছ থেকে সরে এল। দক্ষিণের একটা জানালার ধারে এসে ঠাণ্ডা গরাদেতে ওর উত্তপ্ত ললাট চেপে দাঁড়াল। আঃ! কী ঠাণ্ডা! কী শান্তি!

বাইরে রাত্রি যেমন অন্ধকার তেমনি নিস্তব্ধ। দূরে কোথায় একটা সরীসৃপ চলে গেল বোধ হয় শুকনো পাতার ওপর দিয়ে। তার শব্দ এখানে এসে যেন ওর আচ্ছন্ন চৈতন্যে আঘাত করল। ঐ সরীসৃপের স্পর্শও বোধ হয় এতটা ক্লেদাক্ত নয়।...

এবার সঙ্গে ক'রে হুঁকো-কলকে এনেছিল নরেন। তামাকের অভ্যাস হয়েছে এই ক'দিনে। এখনও বসে বসে তামাক টানছে সে। সে শব্দ এবং গন্ধ এখান থেকে স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে এখনও জেগে আছে। মনে মনে একটা অত্যন্ত দুরাশা পোষণ করছিল শ্যামা যে, হয়ত ঘুমিয়েই পড়বে নরেন শীগ্‌গির।

হঠাৎ একসময় সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অন্ধকার দালানে শ্যামাকে অমন নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে যেন একটু ভয় পেয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ওকে চিনতে পেরে কাছে এসে তিক্ত চাপা গলায় বললে, 'এই যে, এত রাত্তিরে আবার ন্যাকামি ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েছে কেন? আমি কি সারারাত জেগে শুয়ে থাকব নাকি?'

সেই ক্রূর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর! এর পরে প্রহার—তা শ্যামা জানে।

তবু, কোথা থেকে যেন একটা অসম সাহস ওর এসে গেল।

সে শান্ত সহজকণ্ঠে বললে, 'তুমি যাও শোও গে—আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

নরেন ওর একটা হাত ধরে টানবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'ওসব ন্যাকামি ছেড়ে দাও দিকি চাঁদু, ভাল চাও ত শোবে চলো ভালমানুষের মত। নইলে—'

'নইলে কি ?' শ্যামার কঠিন ও মৃদু কণ্ঠস্বর যেন চমকে দেয় নরেনকে, 'নইলে অদৃষ্টে দুঃখ আছে, এই ত ? কী করবে তুমি, মারবে ? বেশী ক'রে মারতে পারবে ? বঁটি এনে দিলে গলায় বসিয়ে দিতে পারবে ? ছাখো, একটা কথাও বলব না আমি, কাঁদব না পর্যন্ত, কেউ টের পাবে না।'

ওর এ চেহারার সঙ্গে নরেন মোটেই পরিচিত নয়। সে বেশ একটু ঘাবড়ে গেল।

'ও সব কি ইয়ার্কি হচ্ছে ? 'চলো শোবে চলো—'থতিয়ে থতিয়ে বললে নরেন। কিন্তু বেশ বোঝা গেল, আগের জোর আর ওর গলায় নেই।

শ্যামা এবার সহজেই হাতখানা নরেনের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'তুমি শোও গে, আমি ঠিক শুতে যাবো। আমার খুশিমত যাবো। কিন্তু যদি জুলুম করো ত এখনই ওপরের ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ব। এ কথার আর নড়চড় হবে না।'

নরেন রীতিমত ভীত কণ্ঠেই বললে, 'তুমি, তুমি আমার ঘর করবে না নাকি ?'

'করতে ত হবেই ! কিন্তু আজ রাতটা আমায় অব্যাহতি দাও, দোহাই তোমার !'

নরেন আস্তে আস্তে, যেন পিছিয়ে পিছিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে পৌঁছে কিন্তু ওর পূর্ব অভ্যাস ফিরে পেলে সে। আস্ফালন করতে লাগল, 'উঁ, বেশ্যাবাড়ি যেন কেউ যায় না। কত তাবড় তাবড় লোক যাচ্ছে, দেখগে যা। বেশ করেছি গেছি, পুরুষমানুষ গিয়েই থাকে। এসে পর্যন্ত শাশুড়ী-বৌয়ে করছে দেখ না ! সতীর বেটি সতী ! ও সব সতীপনা ঢের দেখেছি। ও নাটুকেপনা ঢিট্ করতে আমার বেশি সময় লাগবে না ব'লে দিলুম।...আচ্ছা, আজ থাক, রাত্তিরে আর বেশী হাঙ্গামা করলুম না। কাল সকালে তোমার একদিন কি আমার একদিন !'

আস্ফালনও ক্রমে ক্রমে থেমে আসে। তারপর এক সময় নিয়মিত নাক ডাকার শব্দ কানে যায় অর্থাৎ নরেন ঘুমিয়ে পড়ছে।

শ্যামা সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তেমনি একহাতে জানালার গরাদেটা ধরে, স্তব্ধ হয়ে। বসল না পর্যন্ত। এমনি ভাবেই কেটে গেল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আজ উমার ফুলশয্যা। তার আবার কি ফুলশয্যা হ'ল তা কে জানে !।

ভগবান তাকে বাঁচাও !...তাকে যেন এ অপমান কোনদিন না সইতে হয়।

এতক্ষণ যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল শ্যামা। উমার কথা মনে হয়ে মার কথা মনে পড়ল—মার কত স্নেহের মেয়ে ছিল সে। তার সেই ছেলেবেলাকার মধু-

মাখা দিনগুলি — । সে ছেলেবেলা খুব সুদূরও নয়।

এবার যেন সহসা পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে নিঝ'রিণী নামল। শ্যামা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

তিন

রাসমণি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ—ভারি রাশভারি। সেজন্য বাইরে থেকে তাঁর অন্তরের কোন আঘাতেরই পরিমাণ বোঝা যেত না। কিন্তু শ্যামার ব্যাপারে সত্যিই তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর অমন রূপসী মেয়ে, বুদ্ধিমতী কর্মনিপুণা মেয়ে, যে সংসারে যাবে সে সংসারকে সুখী করতে পারবে, ভবিষ্যতে একদিন তার হাল ধরতে পারবে—একথা তিনি প্রায়ই গর্ব ক'রে বলতেন। সেই শ্যামার এমন বিয়ে হবে কে জানত !

রাসমণি অনেক আঘাত পেয়েছেন জীবনে। সতীনের ওপর বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। নৌকা ক'রে যেতে যেতে আটান্ন বছরের বৃদ্ধ তেরো বছরের মেয়েকে গঙ্গাস্নান করতে দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। ঘটক পাঠান বিয়ের প্রস্তাব ক'রে, জমিদার তিনি—পয়সা দেখে বাপ-মাও দিয়েছিলেন। অবশ্য স্বামীকে নিয়ে যে খুব অসুখী হয়েছিলেন রাসমণি, তা বলা যায় না। কিন্তু প্রথম যৌবনেই তিনটি শিশুকন্যা নিয়ে বিধবা হন। শেষ সময়ে স্বামীর কাছে তিনি থাকতে পর্যন্ত পারেন নি। দেবররা সতীন-পুত্রের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে এক সুচতুর চক্রান্তে তাঁকে সরিয়ে দেয়, মরবার সময় অচৈতন্য নিরক্ষর স্বামীর টিপসই নিয়ে এক মিথ্যা উইল খাড়া করে। তার ফলে তিনি সমস্ত বিষয়ে বঞ্চিত, তাঁর মিথ্যা দুর্নামে শ্বশুরবাড়ির দেশের আকাশ-বাতাস কলুষিত। এই অবস্থায় নিজের গহনা বিক্রি ক'রে এবং সামান্য যা কিছু টাকা হাতে ছিল তাই দিয়ে মেয়েদের মানুষ করতে হচ্ছে তাঁর। মোকদ্দমা করলে হয়ত জ্ঞাতিদের জব্দ করা যেত, কিন্তু সে চেষ্টা করবে কে ? তা ছাড়া তখন ঐ ক'টা টাকাই শেষ অবলম্বন—সেটাও উকীল-মোক্তারের হাতে তুলে দিতে ভরসা হয় নি।

এত দুঃখের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দেওয়া—তারও এই অবস্থা ! রাসমণি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। মেয়ে চাপা, সে প্রায় কিছুই বলে না কিন্তু নরেনের মুখে যেটুকু প্রকাশ পায় তাই যথেষ্ট। বাকীটা অনুমান ক'রে নিতে পারেন অনায়াসেই। তার ফলে ইদানীং তিনি রাত্রে ঘুমোতে পারতেন না। বহু রাত্রি পর্যন্ত একা জেগে বসে থাকতেন। কত কী আকাশ পাতাল ভাবতেন। এক এক সময় মনে হ'ত তিনি পাগল হয়ে যাবেন। আবার এক এক সময় যেন ভাবতে ভাবতে

বুকটা ভেঙে যেতে চাইত, 'বাপ রে !' ব'লে প্রচণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলতেন। সে নিশ্বাসের শব্দে উমার ঘুম ভেঙে যেত।

এমনি বসে থাকতে থাকতে এক একদিন রাত ভোর হয়ে আসত, চারটে বাজলেই উঠে বাড়িতে তালা লাগিয়ে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন।

অবশ্য এ লক্ষণগুলোর সঙ্গে বাইরের লোকের পরিচয় ছিল না।

একটি মাত্র লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, উমার বিয়ে দিতে তাঁর অনিচ্ছা।

মেয়ে ক্রমশ গাছের মত হয়ে যাচ্ছে—আর কবে বিয়ে দেবে উমার মা ? মুখে অন্নজল যাচ্ছে কি ক'রে ? তে'রো পেরিয়ে গেল—মেয়ে অবিবাহিত অবস্থায় যৌবনপ্রাপ্তা হ'লে পূর্বপুরুষ যে নরকগামী হবেন ! এমনি নানা অনুযোগ, যুক্তি ও শাস্ত্রের কথা বর্ষিত হ'ত তাঁর ওপর। কিন্তু তবু রাসমণি অটল থাকতেন।

'মেয়ে আমার কাছে যে ক'টা দিন হেসে কাটাতে পারে কাটাক। ওর বিয়ে আমি কিছুতেই তাড়াতাড়ি দেব না।'

শুধু তাঁকে সমর্থন করতেন তাঁর বড়দি, 'দিস্ নি দিস্ নি। কি হবে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে ? কথায় কথায় ত ভবিতব্যি দেখানো হয় সব—এর বেলা ভবিতব্যি নেই ? কেউ বললে বলবি যে ভবিতব্যি থাকে ত বিয়ে হবে। আমি কি জানি ?'

বাঁ হাত দিয়ে ঘটিটা ধরে রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই বলতেন কথাগুলো।

উমা কিন্তু ক্রমে যখন চোদ্দও পার হ'ল তখন আর রাসমণি স্থির থাকতে পারলেন না। চতুর্দিকে খোঁজ খবর করতে শুরু করলেন। আরও মাস কতক পরে এই সম্বন্ধটা হাতে এল।

কুলীনের ছেলে, পরম রূপবান—এমন রূপ বাঙালীর ঘরে দুর্লভ। দুধে-আলতায় রং, কোঁকড়ানো চুল চেরা-সিঁথির দু দিকে স্তবকে স্তবকে সাজানো, পাত্‌লা গোঁফ—যেন প্রতিমার কার্তিক। বয়সও কম—বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। তবে অবস্থা খুব ভাল নয়, ঘর-বাড়ি জমি জায়গা নেই। ছেলে এক প্রেসে কাজ করে—মাইনে ভালই, এরই মধ্যে কুড়ি টাকা পায়, এ ছাড়া 'ওপর টাইম' খাটলে আলাদা পাওনা। মা আর এক ভাই, সে ভাইও কোন জমিদারী সেরেস্তায় য়্যাপ্রেন্টিস ঢুকেছে—শীগ্‌গিরই মাইনে হবে।

ঘটকীর মুখে সব কথা শুনে রাসমণি বললেন, 'ঘর-বাড়ি নেই, কোথায় দেব মেয়ে ?'

'তা দিদিমণি, সে কথাও ছেলের মা বলেছে। বলেছে ওদের সেই মানিক-তলায় কোথায় জমি নেওয়া আছে খাজনা-করা—সেইখানে দুখানা খোলার ঘর

তুলে দিক—পাইখানাটানা সবসুদ্ধ ছ'শ টাকা হলেই হয়ে যাবে। তিনি আর নগদ টাকা এক পয়সাও নেবে না বলেছে। ভালই তো হবে দিদি, মেয়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠবে।'

রাসমণি বললেন, 'ছ'শ টাকা নগদ! ঐ ছেলেকে ছ'শ টাকা নগদ দেব—গহনা আছে, সেও কোন্ না পঁচিশ-ত্রিশ ভরি যাবে, ধরো ছ'শ টাকা আরও, দানসামিগ্রী—অন্য খরচা—ঘর খরচা আছে—কোথায় পাবো বাছা! এ সম্বন্ধ আমার চলবে না। গরীব বিধবা-বেওয়া মানুষ।'

ঘটকী জেদ করতে লাগল, 'বাড়ি ত তোমার মেয়েরই রইল দিদি। তোমারই মেয়ে থাকবে। মেয়ে আর জামাই। ও মাগী আর কদ্দিন? বরং গহনা না হয় কিছু কম দিও।'

রাসমণি বললেন, 'জমি তা'হলে মেয়ের নামে ক'রে দিক। বাড়ি আমি ক'রে দেব—ছোট ভাইও ত থাকবে! তাছাড়া মায়ের নামে জমি—যদি শাশুড়ী-বোয়ে বনিবনাও না হয়?'

'তা দিদি হবার জো নেই। খাজনা-করা জমি হস্তান্তরের হুকুম নেই। এব ও জমি ছেড়ে দিতে হয়—আবার মেয়ের নামে পাট্টা করাতে হয় কিন্তু তাতে ত নতুন ক'রে সেলামী লাগবে!'

রাসমণি বললেন, 'তা'হলে তুমি ও সম্বন্ধ ছেড়ে দাও, অন্য পাত্তর ছাখো।'

ঘটকী পাকা লোক। বড় মেজ মেয়ের সম্বন্ধ যে করেছিল তাকে আর রাসমণি ডাকেন নি শ্যামার এই ব্যাপারের পর। নতুন লোক—কিন্তু এরই মধ্যে হাড়হদ্দ সব জেনে নিয়েছে। সে একটু চোখ টিপে বললে, 'অত তাড়াতাড়ি ঝেড়ে জবাব দিও না দিদি, ভেবে ছ্যাখো।...নতুন সম্বন্ধ করব কি, ভাল সম্বন্ধ ত করবারই কথা, অমন সোন্দর মেয়ে তোমার। কিন্তু জানো ত—এমন দেশ যেখানে যাই তোমার শ্বশুরবাড়ির খবরটি আগে গিয়ে বসে থাকে—ভাল ভাল জায়গায় কেউ এ কথা শুনতেই চায় না। তার ওপর গাছের মত মেয়ে ক'রে রেখেছ সে আবার আর এক বদনাম। বলে, এতকাল বিয়ে হয় নি কেন?'

রাসমণির মুখ অপমানে রাঙা হয়ে উঠল। দৃষ্টি হয়ে উঠল কঠোর। তিনি বললেন, 'না হয় মেয়ের বিয়ে দেব না। তুমি যাও—পারো অন্য সম্বন্ধ ছ্যাখো।'

কিন্তু ঘটকীর তাতে চলবে না। ও পক্ষে মোটা টাকার লোভ ছিল। সে ওঁর বড় মেয়ে কমলাকে ধরলে। কমলা নিজে সৎপাত্রে পড়েছে—পৃথিবীতে যে অসৎপাত্র এত আছে সে কথাটা যেন তার বিশ্বাসই হয় না। শ্যামার বিয়েটা দৈব-দুর্ঘটনা, তা কি আর বার বার ঘটে? কমলা এসে মাকে ধরলে, 'অমন

কার্তিকের মত ছেলে মা, হাতছাড়া করো না। আমি ওঁকে বলেছি—উনি বলেছেন যে মা যদি অপরাধ না নেন আমি কিছু টাকা দিতে পারি।'

ম্লান হাসলেন রাসমণি, 'অপরাধ নেওয়ার কথাই আর ওঠে না। বহু দিন থেকেই জামাইয়ের সাহায্য নিতে হচ্ছে। নগদ টাকা হাত পেতে তিনি কখনও নেন নি বটে কিন্তু জামাই অবস্থাপন্ন লোক—তার দেশে জমি, শহরতলীতে বাগান-বাগিচা আছে। চাষের চাল ডাল, বাগানের ফসল ইদানীং প্রায়ই পাঠায়—সব গুলো ঠিক বাগানের কিনা সন্দেহ থাকলেও রাসমণি বেশী জেরা করেন না। কারণ সে অবস্থা আর তাঁর নেই; মুদীর দোকানের ফর্দ কমেছে, বাজারের খরচ বিশেষ লাগছে না—এটা তাঁর কাছে যে কত তা অন্তর্যামীই জানেন। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা বলে গহনা তিনি জমিদার স্বামীর কাছ থেকে কিছু বেশিই পেয়েছিলেন কিন্তু সে তো আর কুবেরের ঐশ্বর্য নয়। কলকাতায় বাড়িভাড়া ক'রে থাকা—পাঁচটা ভাড়াটের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকার মেজাজ তাঁর নয়, জমিদারী অভ্যাসের ঐটুকু এখনও ছাড়তে পারেন নি—তাতেই কত টাকা বেরিয়ে যায়! একটা লোকও রাখতে হয়েছে, নইলে দেখাশুনো বাজার-হাট করে কে! কলসীর জল ক্রমাগত ঢাললে একদিন ফুরোবেই।

রাসমণি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তার জন্যে নয় রে। জামাইয়ের কাছ থেকে তা নিচ্ছিই, একদিন হয়ত জামাই বাড়ি গিয়েই দাঁড়াতে হবে একটু আশ্রয়ের জন্যে। কিন্তু ছেলেও ত এমন কিছু নয়। ছাপাখানার চাকরি—'

'ঘটকী বলছিল যে ও নিজেই ছাপাখানা করবে শীগ্‌গির। ওর এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগে।'

'ঘটকীরা কত কথা বলে মা, সব বিশ্বাস করতে নেই। এখন যেটা দেখছি তা ঐ। মেয়েকে গিয়ে বাসন মাজতে হবে, রাস্তার কল থেকে জল তুলতে হবে।'

'ঘাড়ে সংসার পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অমন সুন্দর ছেলে—উর্মির সঙ্গে কেমন মানাবে বলো দেখি।'

'আবার রাঙামুলো দেখে ভুলছিস! একবারে তোদের চৈতন্য হ'ল না?'

'বারবারই কি আর অমন হয়! তাছাড়া ডকে ওদের বাড়ি পড়ল তাই—নইলে কি আর এমন থানছাড়া মানছাড়া হয়ে পড়ত!…উনি বলছিলেন ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওঁর খুব ভাল লেগেছে, মুখ্‌খু ছাপাখানার লোক যেমন হয় তেমন নাকি নয়—। সেরকম যদি বোঝেন উনিই কি ওকে একটা ভাল চাকরি ক'রে দিতে পারবেন না?'

রাসমণি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'গ্যাখো যা ভাল বোঝ। আমি আর

যেন ভাল ক'রে কিছু ভাবতেও পারি না।...জামাই যদি ভাল বোঝেন ত ঠিক করো ওখানেই—। জামাই ত একটা ভাল পাত্তরও দেখে দিতে পারলেন না।'

কমলা নতমুখে বসে মেঝের একটা গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে বিলিতি মাটির চাপড়া তুলতে তুলতে বললে, 'জানই ত মা। উনি এসব জানতেন না—মাথার ওপর আর কোন অভিভাবক ছিল না তাই খোঁজখবর করেন নি। যেখানে সম্বন্ধ করতে যাবেন তারাই ত খোঁজখবর করবে। তখন? ওঁর সুদ্ধ যে মাথা হেঁট হবে। সবাই বলবে উনিও ত এইখানে বিয়ে করেছেন।'

নিজের মেয়ের মুখে পর্যন্ত এই সব ইঙ্গিত শুনলে বুকটা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় রাসমণির। অথচ ঈশ্বর জানেন—ওঁর অপরাধ কি!

সে দুর্যোগের দিনগুলো আজও চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে আছে। বৃদ্ধ স্বামী চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এলেন। দিন-সাতেক পরে ছেলে গিয়ে বললে, 'ছোট মা, বাবার বোধ করি শেষ অবস্থা—আপনাকে আর মেয়েদের দেখতে চান।' তখনই এক কাপড়ে রাসমণি আসছিলেন বেরিয়ে, পুরোনো বুড়ী ঝি বললে, 'ছোট মা, জমিদার বাড়ির ব্যাপার, গহনার বাক্স আর টাকাকড়ি যা আছে ফেলে যেও না। ফিরে এসে আর পাবে কিনা সন্দেহ! তবু রাসমণি নিতে চান নি, সেই বুড়ীই জোর ক'রে একটা কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকে সব পুরে নৌকোয় তুলে দিয়েছিল। কলকাতা এসে শুনলেন স্বামী দেশে ফিরে গেছেন। ছেলে বললে, 'তাই ত, কি রকম হ'ল—আপনারা ততক্ষণ একটু বসুন—দেখি একটু খবর নিয়ে।'

সে সরে পড়ল।

এক মাসের জন্য বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। বিরাট বাড়ি। তখনও সামান্য কিছু বাসন-কোসন ছড়ানো পড়ে রয়েছে। ওষুধের শিশি, ময়লা কাপড়-চোপড় —দ্রুত স্থানত্যাগের চিহ্ন সর্বত্র। তারই মধ্যে সারাদিন উপবাসী রাসমণি বসে বৃথা অপেক্ষা করলেন, তারপর পাশের বাড়ির একটি মহিলার জিম্মায় মেয়েদের রেখে একাই যাত্রা করলেন আবার দেশে। সঙ্গে পুরোনো চাকর ঝি ছিল, ঝিকে রেখে গেলেন মেয়েদের কাছে, চাকরকে সঙ্গে নিলেন। দেশে পৌঁছে শুনলেন যে স্বামীকে হাওয়া বদলের নাম ক'রে দেশে নিয়ে গিয়ে দেখানো হয়েছে তিনি নেই, তিনি নাকি (সে ঘেন্নার কথা শুনলে আজও তাঁর গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়) চাকরের সঙ্গে কুলত্যাগ করেছেন। গহনাপত্র টাকা-কড়ি সব নিয়েই গেছেন—অকাট্য প্রমাণ। সেই আঘাতেই বৃদ্ধ একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন, কোন্ উইলে সই করেছেন তা তিনি জানেনও না। অজ্ঞান অবস্থায় টিপ নিয়ে মজুত-রাখা সাক্ষীদের দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। বৃ

জানতেন যে তিনি আরো ঢের দিন বাঁচবেন, কলকাতায় গিয়ে একটু সুস্থও হয়েছিলেন। পশ্চিমে চেঞ্জে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'তার আগে দেশে চল্, ছোট বৌকে সঙ্গে নোব, সে না হলে সেবা করতে পারে না কেউ।' যার ওপর এতটা আশা-ভরসা ক'রে এসেছিলেন তার সম্বন্ধে এই সব শুনে ভেঙে পড়বেন না ত কি!

রাসমণি বাড়িতে ঢোকবারও অনুমতি পান নি। শুনলেন তিনি নাকি কুলত্যাগিনী। সেইজন্য স্বামী তাঁর বা কন্যাদের ভরণ-পোষণেরও কোন ব্যবস্থা করে যান নি, উইলে সে কথার উল্লেখ ক'রে অধিকাংশ বিষয় ছেলেকে এবং ভাইদের কিছু কিছু দিয়ে গেছেন। ওদের আশঙ্কা ছিল যে অন্তিম সময় আসন্ন জানলে রাসমণি নিজের নামেই সব বিষয় লিখিয়ে নেবেন। তাই এত আয়োজন। ...আরো শুনলেন যে তিনি নাকি স্বামীর বিবাহিতা স্ত্রী নন—রক্ষিতা, এমন প্রমাণ করবার ব্যবস্থাও দেবরদের হাতে আছে। সেই চলে এসেছিলেন শ্বশুরবাড়ি থেকে, আর সেখানে ফিরে যেতে পারেন নি।

রাসমণি আবারও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যা ভাল বোঝ তোমরা করো মা, জামাইয়ের মত নাও, আমি আর ভাবতে পারব না কিছু।'

কমলা ছেলেকে দেখে নি, শুধু তার রূপের বর্ণনা শুনেই আর কোন দিকে তাকালে না, একরকম জোর করেই এখানে সম্বন্ধ ঠিক করলে।

চার

উমার বিয়ে চুকে গেল নির্বিঘ্নে। বাড়ি আগেই তৈরী ক'রে দেওয়া হ'ল—যাতে নববধূ নতুন বাড়িতেই গিয়ে উঠতে পারে। মাটির গাঁথুনি, ইটের দেওয়াল, চুনের পেটা মেঝে আর খোলার চাল। ছ'শ টাকাতে কুলোল না, কিছু বেশিই পড়ল। কত তা রাসমণি জানেন না, শেষ অবধি তিনি বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন ব'লে কমলা নিজের টাকা থেকে গোপনে দিয়েছে বাকিটা।

বিবাহসভায় বর দেখে সবাই একবাক্যে উমার ভাগ্যের প্রশংসা করলে। শুভদৃষ্টির সময় ভাল ক'রে দেখা যায় নি কিন্তু পরে উমাও ভাল ক'রে দেখে নিলে। শ্যামার অনুপস্থিতি তাকে আঘাত করেছিল খুব, প্রথমটা সে খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিল কিন্তু বর দেখে সে দুঃখও তার রইল না। বরং নরেন্দ্রনাথের সহসা আবির্ভাবে চারিদিকে যখন একটা চাপা ধিক্কারের স্রোত বয়ে গেল, ওর মা শিউরে উঠে ওর হাতটা চেপে ধরে বলেছিলেন, 'জানি নে মা, তোর আবার কী বিয়ে দিলুম!' তখন কিন্তু উমার মনে মনে ছোড়দির ওপর করুণাই হয়েছিল, আর

সেই সঙ্গে মনে হয়েছিল 'আমার এমন হবে না কখনও। এত যার রূপ তার গুণও আছে নিশ্চয়!' সে একটু গর্বই অনুভব করেছিল তার স্বামী-সৌভাগ্যে।

প্রথমে সে সম্বন্ধে ওর মনে সংশয় দেখা দিল শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে। নিচু একতলা খোলার বাড়ি, জন্মে পর্যন্ত কখনও এমন বাড়িতে থাকার কল্পনা করে নি। কুয়া হয় নি, পাশের বাড়ির কুয়া থেকে জল আনতে হয়। বাড়িতে লোকজনও তেমন নেই, আত্মীয়-স্বজনদের দয়াময়ী বিশেষ জানান নি, বলেছিলেন, 'নগদ পয়সা ত একটা পেলুম না। খরচ করব কোথা থেকে, ধার করব নাকি ছেলের বিয়েতে?'

দয়াময়ী নাম কে রেখেছিল কে জানে, উমা তাঁর মূর্তির মধ্যে দয়ার লেশ কোথাও খুঁজে পেলে না। ঢ্যাঙা মদ্দাটে গঠন, চওড়া চওড়া হাড়—বেশ জোয়ান পুরুষের মত। গলার আওয়াজও মোটা আর ভাঙা ভাঙা। বৌ তখনও পাল্‌কি থেকে নামে নি—তিনি মন্তব্য করলেন, 'এই বউ এত সুন্দরী, ত্যাত সুন্দরী! ঘট্‌কী বেটি গেল কোথায়; আসুক না।…আমার ছেলের কাছে কি!'

তারপরই ওর হাতে একটা হ্যাচ্‌কা টান মেরে বলেছিলেন, 'নামো গো বাছা ভালমানুষের মেয়ে। বুড়ো হাতী বৌ, কোলে করতে পারব না।'

কোনমতে বরণ ক'রে বউ ঘরে তোলা হ'ল। তিনটি না চারটি এয়ো। ভাল ক'রে শাঁখও বাজল না বোধ হয়। কড়ি খেলা প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠান—তাও নামমাত্র। ভাগ্যে কুশণ্ডিকা ওখান থেকে সেরে আসা হয়েছিল, উমা মনে মনে ভাবলে, নইলে তাও হ'ত না বোধ হয়। তারপরই শাশুড়ী একখানা বিলিতি কোরা শাড়ি ওর গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'নাও, বেনারসীখানা ছেড়ে ফ্যালো চট্‌পট। ঐ ওদিকে জল আছে, মুখ হাত ধুয়ে এসো গে। দেখো, সাবধানে খরচ করো, তোমার বাপের বাড়ির মত আময়দা জল নয়, অনেক কষ্ট ক'রে তুলে আনতে হয়েছে নিজেকে—পঞ্চাশটা দাসী চাকর ত নেই।'

উমা ত কাঠ। ওর বর শরৎ আড়ে একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে উঠে পড়ল, আড়ালে গিয়ে উমার বাপের বাড়ি থেকে যে ঝি এসেছিল তাকে ডেকে বললে, 'তুমি ওকে কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে যাও না কলতলায়।'

ঝি ফিসফিস ক'রে বললে, 'আমি ত আগেই যেতুম জামাইবাবু, আপনার মাকে দেখে আমার ডর লাগছে—'

'না না যাও। মার অমনি ধরন, ওঁর কথা ধরো না।'

শরৎ ত সরে পড়ল। ঝি কাছে গিয়ে ওকে কাপড় ছাড়াতে ছাড়াতে চুপি চুপি বললে, 'তোমার বর বেশ লোক দিদিমণি, এরই মধ্যে কত টান, তোমার অসুবিধে হচ্ছে দেখে নিজে গিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিলে। কিন্তুক্ তোমার শাশুড়ী যেন

কেমনতরো—'

ইতিমধ্যে দয়াময়ীর প্রবেশ।

'তুমি বাছা না বলা-কওয়া এ ঘরে ঢুকেছ কেন? আমাদের দাসীচাকরের পাট নেই! ঝি ছাড়া যদি নবাব-নন্দিনীর চলবে না ত মা-মাগী খোলার ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে কেন? এখানে জল তুলতে হবে, বাসন মাজতে হবে— সব কাজ করতে হবে। অত ঝিয়ের র‍্যালা এখানে চলবে না।'

'সে ত দুদিন পরে হবেই মা। আজ বিয়ের কনে—আর সেই জন্যেই ত— আমার সঙ্গে আসা—'

'চোপরাও হারামজাদী! মুখের ওপর কথা! আস্পদ্দা! এ আমার বাড়ি, আমি যা বলব তাই হবে।'

ঝি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দয়াময়ীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর উমার যে বেনারসী কাপড়খানা পাট করছিল, সেখানা ওর পায়ের কাছে আছড়ে ফেলে বললে, 'ঘর তুমি করো দিদিমণি সোয়ামীর। আমি চনু। আমরা গতর খাটিয়ে খাই, যেখানে খাটব সেখানে পয়সা। গাল খেতে যাব কিসের জন্যে? গাত্তোর বামুন-ভদ্দর লোকের ঘর রে!'

দয়াময়ী আগুন হয়ে বললেন, 'নেকালো হারামজাদী, আবি নেকালো। আবার লম্বা লম্বা বাত!'

'কেন বলব না বাছা। আমি কি তোমার ব্যাটার বউ? বিনি দোষে তোমার গাল শুনব কিসের জন্যে?'

ঝি বেরিয়ে চলে গেল। উমার তখন স্তম্ভিত অবস্থা, চোখের বাঁধ ভেঙে কখন জল নেমেছে তা সে টেরও পায় নি। দয়াময়ী ধমক দিয়ে উঠলেন, 'নাও নাও, আর প্যান-প্যানাতে হবে না। চটপট কাজ সেরে নাও। এই ত বৌ, রূপের ধুচুনী—কত নশো পঞ্চাশ টাকা তোমার মা দিয়েছে তাই শুনি যে আবার ঢং ক'রে ঝি দিয়েছে সঙ্গে? আর দিয়েছে দিয়েছে এমন ছোটলোক ঝি দেয়! সহবৎ শেখে নি। ভদ্দর লোকের ঘরে কখনও কাজ করে নি তা কি হবে! কুটুম যা হ'ল তা ঝি দেখেই টের পাচ্ছি। যেমন ছোটলোকের ঘর, তেমনি তার ঝি।...তাও বলে দিচ্ছি বাছা, চোখ রাঙিয়ে বেরিয়ে গেল ঐ ঝি, সে অপমানের শোধ আমি তোমার উপর দিয়ে তুলব। মাকে বলে দিও। এ ক-টা দিন যাক্ না।'

আশা ও আশ্বাসের কথাই বটে। ভয়ে উমা এ কথাটাও বলতে পারলে না যে ও ঝি তাদের বারোমেসে ঝি নয়। নিজের সংসারের ঝি কেউ কনের সঙ্গে

পাঠায় না। কে জানে, কথা কইতে গেলে যদি আরও গালাগাল শুনতে হয়!···
চোখের জলের ওপরই নামে মাত্র মুখে হাতে জল দিয়ে ফিরে এসে বসল।
দেরি করতে আর সাহস হ'ল না।

কে যেন একজন বললে, 'বৌকে জলখাবার দিলে না নতুন-বৌ?'

উত্তর এল, 'এই ত বাপের বাড়ি থেকে গিলে এসেছে। কোন্ পেটে খাবে?
মিছিমিছি লোক-দেখানো নৌকতা আমি করতে পারি নে।'

সেদিন এবং তার পরের সারাটা দিন উমার চোখের জল শুকোল না। তাও
প্রকাশ্যে ফেলবার উপায় নেই—দেখতে পেলে আর রক্ষা থাকবে না। এর
ভেতরে শুধ্ একটিমাত্র অভয়বাণীকে সে মন্ত্রের মত জপ করেছে—সে ওর ঝিয়ের
কথা, 'তোমার বর বেশ লোক দিদিমণি!' ঐ একমাত্র ওর আশ্বাস। ঐ একটি
আশার শিখাকে চারিদিকের নিষ্ঠুর ঝড়ের মধ্যে ও বাঁচিয়ে রাখল অন্তরের সমস্ত
তাগিদ দিয়ে, কামনা দিয়ে ঘিরে।

বৌভাতের আয়োজনও সামান্য। মোট জন পঞ্চাশেক লোক খেলে।
দয়াময়ী ও অন্য দুটি স্ত্রীলোক নিজেরাই রান্না করলেন। ভিয়ান হ'ল না, হালুই-
কর এল না—এ যেন খেলাঘরের বিয়ে! উমা দুই বোনের বিয়ের গল্প শুনেছে,
পাড়ায় আরও দেখেছে কিন্তু এমন বিয়ে যে হয় তা সে কখনও শোনে নি।

তবুও সে ভেবেছে, স্বামী যদি ভাল হয়, মনের মতন হয়—এ সব বাইরের
তুচ্ছ ব্যাপার নাই বা হ'ল ঠিক ঠিক! সে দিকে ত ঈশ্বর তার প্রতি কার্পণ্য
করেন নি! স্বামীর ভালবাসার অমৃত-প্রলেপে ওর এই সব আঘাতের ক্ষত শুকিয়ে
উঠবে।

তখনও সে জানে না যে ভাগ্যদেবতা তাঁর সবচেয়ে বড় পরিহাসটাই ওর জন্য
তুলে রেখেছেন।

ফুলশয্যার আচার-অনুষ্ঠান শেষ হয়ে সকলে চলে গেলে দুরু দুরু বক্ষে উমা
যখন প্রতীক্ষা করছে সেই পরম শুভক্ষণের—স্বামীর কাছ থেকে প্রেমের প্রথম
নিদর্শন যখন আসবে ওর দিকে এগিয়ে, স্বামী হয়ত কাছে ডাকবেন কি হাত
ধরে টানবেন বুকের মধ্যে কিংবা আরও অচিন্তিতপূর্ব কিছু, যা সে এখনও শোনে
নি কারও মুখে,—চাপা গলায় শোনা গেল, 'শোন, এদিকে এসে বোস।'

হৃৎপিণ্ডটা ধ্বক্ ক'রে উঠে থেমে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। কেমন যেন শুষ্ক
শোনাচ্ছে কণ্ঠস্বর। এ কি!

উমা বসে বসে ঘামছে। শরৎ আবারও ডাকলে, 'খুব জরুরী কথা আছে,
এদিকে কান দাও। আমি প্রেমালাপ করার জন্যে ডাকি নি। এসো এসো—

সরে এসো।'

শেজের মৃদু আলোয় ভাল ক'রে কিছু দেখতে পায় না উমা, চুপ ক'রে বসেই থাকে। চোখের দৃষ্টিটা শুধু আরও ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ—কেউ আড়ি পাতবে না তা উমাও জানে। সে রকম লোকই নেই এ বাড়িতে।

শরৎ অস্ফুট একটা বিরক্তিসূচক শব্দ ক'রে নিজেই এগিয়ে আসে, ওর মুখের অনেকটা কাছে মুখ এনে বলে, 'ভ্যাখো একটা কথা আজ থেকেই পরিষ্কার ক'রে রাখতে চাই। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না; আমার কাছে কিছু প্রত্যাশাও ক'রো না। মানে স্বামীর কাছে স্ত্রী যা আশা করে সে ভালবাসা তোমাকে আমি দিতে পারব না। বিয়ে করেছি মার জুলুমে, তা ব'লে তোমার সঙ্গে ঘর করা হবে না আমার দ্বারা।'

উমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেল? সে কি ভুল শুনছে? না ভুল বুঝছে? ওর বুকের রক্ত-চলাচল বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে—

ঠিক কি ভাবছিল, কি শুনছিল কিছুই জানে না উমা ভাল ক'রে। সে রাত্রের কথাগুলো অনেকদিন সে ভাববার চেষ্টা করেছে, মানে করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু—

লক্ষ যোজন দূর থেকে কে যেন কথা কইছে না?

শরৎ বলছে, 'তুমি রক্ষিতা কাকে বলে জানো? জানো না? তাই ত! মানে আমি আর একটি মেয়েকে ভালোবাসি, তার সঙ্গেই ঘর করি। তাকে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে আমি ঘর করতে পারব না। আজ তিন বছরের পুরোনো অভ্যেস, সে আর বদল হবে না। ছেলের চরিত্র খারাপ হচ্ছে ব'লে মা বিয়ে দিতে চাইলে, বড় জ্বালাতন করে—তাই বিয়ে করতে হ'ল। নইলে আমার ইচ্ছা ছিল না। কী করব, মা সেখানে পর্যন্ত গিয়ে চেঁচামেচি করে। তাই গোলাপীও বললে, কাজ কি বাপু অত হ্যাঙ্গামে, একটা বিয়ে ক'রে ফেলে রেখে দাও। তাও আমি ভেবেছিলুম যে, যে মেয়ে দেবে সে ত খোঁজখবর করবে, আমার মা-টি যে কি চীজ্‌ তা জানলে আর বিয়ে দিতে চাইবে না কেউ। তা তোমার মা যে এমন ফট ক'রে রাজী হয়ে যাবেন তা কে জানত! তুমি ত বেশ সুন্দর, মা পয়সা খরচও করলেন—এমন পাত্রে দিলেন কেন?'

উমার মুখ দিয়ে একটিমাত্র প্রশ্ন বের হ'ল, 'আপনি তাকে বিয়ে করেন নি কেন?'

প্রশান্ত মুখে বললে শরৎ, 'হরি হরি! সে যে বেশ্যা, কিন্তু সেও বেশ সুন্দরী।

ছোট জাতের মেয়ে—তাহলেও চেহারায় বেশ লাজ্জত আছে। তাছাড়া সে খুব ভালবাসে। আমি ত বেশি পয়সা-কড়ি দিই না, মাইনের টাকা মা মাইনের তারিখে ছাপাখানায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আদায় ক'রে নেয়।...শুধু ওপর-টাইমের টাকাটা, তা সে আর কত। ও-ই আমাকে খাওয়ায়। ওর মায়ের কিছু ছিল, তাছাড়া এদিক ওদিক কিছু কামায়, তাইতেই চলে। নইলে দুটো প্রাণীর চলে কিসে বলো,—এই দিনকাল।'

উমা আজকালকার মেয়ে নয়। সেদিন এ প্রশ্ন তার মাথাতেও আসে নি যে, এক্ষেত্রে কোন্ অধিকারে বিয়ে করেছে শরৎ? ওর নারী-জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দেবার কি অধিকার ছিল ওর? তখনকার দিনে স্বামী না নিলে মেয়েরা নিজেদের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিত। উমাও তাই দেবে নিশ্চয়। তখন সেই মুহূর্তে কিন্তু কোন কথাই মনে ছিল না ওর—স্তম্ভিত, জড় হয়ে বসে রইল।

আর শরৎও—শুদ্ধ মাত্র মার জালাতনে উত্যক্ত হয়ে একটি মেয়ের সারা জীবন নষ্ট ক'রে দিতে বসেছে—এটা অম্লান বদনে বলতে পারল, একটুও বাধল না কোথাও।

তবে আশ্বাসও দিলে বৈকি সে, বললে, 'তা ব'লে আমি কোন জুলুমও করব না। তোমার ওপর কোন আক্রোশ নেই ত। তুমি সংসার নিয়ে থেকো, আমি আমার কাজ নিয়ে থাকব। মার সঙ্গে ঐ শর্তই হয়েছিল, বৌ এনে দেব ওর সংসারের কাজের জন্যে। তারপর আমাকে কোন কথা বলতে পারবে না। বোধ হয় ভেবেছিল সুন্দরী বৌ এলে আমি নিজেই সেদিকে ঢলব, আর কিছু বলতে হবে না। ছেলেকে ত চেনে নি এখনও।'

একটু হেসে ওঠে শরৎ। বোধ হয় রসিকতাটা অনুভব করতেই থামে একটু, তারপর বলে, 'এই পাঁচ-ছ'টা দিন। তারপর কি আর বাড়ি আসব ভেবেছ? এই কটা দিন মাঝে বালিশ রেখে শোও। কী আর করবে। দ্যাখো সব পরিষ্কার ক'রে দিলুম—এর পর যেন কোনরকম দুষো না।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক

দিন তিনেক ওখানে কাটিয়ে নরেন যখন কলকাতায় ফেরবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তখন স্বাভাবিক ভাবে শাশুড়ী এবং বধূ দুজনেরই মুখে এক প্রশ্ন ফুটে উঠল, 'তার পর?'

নরেন বোকার মত হাসতে হাসতে মাথা চুলকোতে লাগল, উত্তর দিতে পারলে না।

ক্ষমা একটু কঠিন কণ্ঠেই বললেন, 'দয়া ক'রে তোমার মাগ-ছেলে তুমি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো বাবা, তাহ'লেই আমি বাঁচি। মা গঙ্গায় গা ঢেলে নিশ্চিন্তি হই।'

নরেন হি-হি ক'রে হেসে বললে, 'এ মজা মন্দ নয়। ও কাল রাত্তিরে ঠিক এই কথাই বলছিল যে তোমার মার একটা যা হোক ব্যবস্থা করো— তাহ'লে মরে রেহাই পাই। হি হি! তুজনে পরামর্শ ক'রে বলছো বুঝি?'

'এ ত পরামর্শ করবার দরকার নেই বাবা, তোমার মত মানুষের সঙ্গে যাদের ঘর করতে হয়,—এ ছাড়া আর তাদের গতি কি বলো।'

'বা-রে, সব দোষ বুঝি আমার! সাত-তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে দিয়ে ন্যাঙ্গারি ক'রে দিলে, এখন আমাকে সব সামলাতে হবে!'

'বিয়ে যখন দিয়েছিলুম তখন সম্পত্তিও ছিল। যা ছিল চিরকাল বসে খেলেও খেতে পারতিস্। সব খোয়ালি, তার জন্যে দায়ী কি আমি?'

'বা! তা ব'লে পুরুষমানুষ—আমোদ-আহ্লাদ করব না!'

এ লোকের সঙ্গে কথা কইতে যাওয়া বৃথা জেনেই ক্ষমা চুপ ক'রে গেলেন। খানিকটা ভেবে নিয়ে নরেন বললে, 'দেখা যাক্—দিন-কতক ত ঘুরে আসি।'

'তার পর? আমাদের এই দিন-কতক চলবে কিসে?'

'রাজা বিনে কি আর রাজ্য আটকায়? এতদিন চলল কি ক'রে? হেঁ হেঁ —তাছাড়া তোমার হাতেও কিছু ছিল নিশ্চয়ই। কম চাপা মেয়েমানুষ তুমি!'

ঘৃণায় এত বড় কথাটারও জবাব দিলেন না ক্ষমা। শুধু ছেলে চলে যাবার পরে তুলসীতলায় এসে ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে মাথা খুঁড়তে লাগলেন, 'ঠাকুর, আমাকে নাও! আজও প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না, এত কি পাপ করেছিলুম ঠাকুর?'

এর পর আবার সেই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা। দিন এবং রাত যেন প্রতিদিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'তে থাকে। প্রতিটি দিন কিসে কাটাবে সেই এক সমস্যা। তার ওপর শ্যামার আরও বিপদ তার শাশুড়ীকে নিয়ে। এবার নরেন যাবার পর থেকে তিনি যেন খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন। যা সামান্য ধানচালের যোগাড় হয় তাও তিনি সঞ্চয় ক'রে রাখেন পৌত্র আর পুত্রবধূর জন্য। একেবারে না বসলে শ্যামাও খাবে না ব'লে মাত্র একবার বসেন। শুধুমাত্র মুখে দেওয়া—একটা ছোট পাখীর চেয়েও কম খান তিনি।

প্রথম প্রথম অনুযোগ করার চেষ্টা করেছে শ্যামা, 'মা, এমন খেলে বাঁচবেন কী

ক'রে ?'

'বাঁচবার কি আর দরকার আছে আমার ? আরও আমাকে বাঁচতে বলো ? আত্মহত্যা মহাপাপ ব'লেই করি না। নইলে মরবার ভয় আর আমার এক তিল নেই মা—'

'কিন্তু আমরা কোথায় দাঁড়াবো মা ? আমাদের কি উপায় হবে ?' শ্যামা হয়ত বলে।

'উপায় আমি ত কিছু করতে পারছি না মা, সেইটেই ত দুঃখ। এখন যে ভাবে দিন কাটছে তোমার, তার চেয়ে খারাপ আর কি কাটবে মা ? এখনও তোমার মা বেঁচে আছেন—এক মুঠো ভাত তোমার মিলবেই সে আমি জানি।'

বধূ আর দেবার মত উত্তর খুঁজে পায় না।

নরেনের কোন খবরই পাওয়া যায় না। দেবেনেরও তথৈবচ। রাধারাণী সামান্য কিছু লেখাপড়া জানে কিন্তু চিঠি লেখার অভ্যাস নেই। একখানা মাত্র চিঠি দেবেন দিয়েছিল, তাতে শুধু নরেনের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালিগালি—কিন্তু এই দুটি আশ্রয়হীনা মেয়েছেলের এখানে দিন কি ক'রে কাটবে—সে কথার উল্লেখ-মাত্র নেই।

মধ্যে খুব অসহ্য হওয়ায় মা একখানি চিঠি লিখিয়েছিলেন শ্যামাকে দিয়ে পুত্রবধূর নামে। ছেলেটা কি না খেতে পেয়ে মরে যাবে ? অন্তত দেবেন যদি পাঁচটা টাকা পাঠায় ! দেবেন পাঠিয়েছিল দুটি টাকা। সেই কুপনে লিখেছিল যে, 'এখানে এক বেটা ইংরেজী-জানা লোক আসিয়া বসিয়াছে—যদিও সে আমার চেয়ে বেশী ডাক্তারী জানে না, তথাপি ইংরেজীর ভুচুং দিয়া আমার পসার মাটি করিতে বসিয়াছে। এক্ষণে আমার সংসার চলাই দায়। নচেৎ শ্রীমানকে দেখা ত আমার কর্তব্যের মধ্যেই।' ইত্যাদি—

লেখা চলত তার মাকে, সে ইঙ্গিতও যে ক্ষমা দেন নি তা নয় কিন্তু সেখানে শ্যামা অটল। কোন কারণেই সে মার কাছে এই অবস্থায় হাত পাতবে না। মাকে অন্তত সে জানতে দেবে না তার অবস্থাটা। শাশুড়ীও বধূর মন বুঝে স্পষ্ট ক'রে বলতে সাহস করেন নি কথাটা।

কিন্তু মাস ছয়েকের মধ্যেই ক্ষমার শরীর অসম্ভব ভেঙে পড়ল। রক্তাল্পতার সমস্ত লক্ষণ দেখা দিল, হাত পা ফুলতে শুরু হ'ল। এইবার যথার্থ প্রমাদ গুনলে শ্যামা। এই বিদেশ-বিভুঁয়ে একা এই অবস্থায় কি করবে সে ? বিশেষ তার অল্প বয়স এবং সে সুশ্রী দেখতে—এটার যে কী বিপদ তা পদে পদেই বুঝতে পারে আজকাল। পাশের তাঁতিগিন্নী খুব দেখাশুনো করেন, তেলিপাড়ার দুটি-তিনটি

পরিবারও নিয়মিত সাহায্য করে, সেজন্য বিপদ খুব কাছে আসে না—কিন্তু আশেপাশেই যে ঘোরে, সে আভাস শ্যামা পায়।

অল্পবয়সী ছেলেদের অভাব নেই পাড়ায়—তারা দুপুর ও অন্ধকার সন্ধ্যায় পাঁচিলের পাশে পাশে শিস্ দিয়ে ঘোরে, গাছের ডালে উঠে দ্বিতলের বাতায়ন-বর্তিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে—এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন যারা, তারা নাপতিনীকে দিয়ে অলঙ্কারের প্রলোভন দেখায়। শুধু তাঁতিগিন্নীর পাঁচটি জোয়ান ছেলে আছে ঘরে এবং তিনি প্রায়ই বেশ চেঁচিয়ে বলে যান—'কেউ যদি একটু ওপর-নজরে চায় বৌমা, কি কিছু ইশেরা-ইঙ্গিত করে, তক্‌খুনি আমাকে বলে দেবে মা—দিনে-দুপুরে তার মুণ্ডুটা ধড় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে তোমার পায়ের কাছে ফেলে দেবে আমার ব্যাটারা। হ্যাঁ,—ওরা পাঁচ ভাইয়ে লাঠি ধরলে কোম্পানীর ফৌজে কিছু করতে পারবে না!'—সেইজন্য বাড়াবাড়ি করতে কেউ সাহস করে না।

মাসখানেক ধরে চিন্তা ক'রে শ্যামা ওর মাকেই একখানা চিঠি লিখলে। সব খুলেই লিখতে হ'ল। মিছিমিছি আর গোপন ক'রে লাভ নেই।

কিন্তু সেই চিঠির যা জবাব এল তা শ্যামাকে আবারও পাথর ক'রে দিলে। স্বামীর কোন ব্যবহারেই আর ও বিস্মিত বোধ করবে না এমন একটা ধারণা ওর হয়েছিল কিন্তু মার চিঠি পেয়ে বুঝলে যে এখনও ওর সেই লোকটিকে চিনতে বহু বিলম্ব আছে।

মা যা লিখেছিলেন তার তারিখ মিলিয়ে শ্যামা দেখলে যে এখান থেকে ফিরে দিনকতক পরেই নরেন রাসমণির সঙ্গে দেখা করে এবং শ্যামা ও খোকার এক কল্পিত রোগের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে কিছু অর্থসাহায্য চায়। নরেনকে চিনলেও সে বিবরণ শুনে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি—ঋণ ক'রেও কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তারপর আরও বার-দুই কিছু কিছু দেবার পর তাঁর সন্দেহ হয়, তিনি সোজা বলেন যে মেয়ের নিজের হাতের লেখা চিঠি না পেলে তিনি আর এক পয়সাও দেবেন না। নরেন সেখান থেকে ফিরে বড় শালী কমলার কাছে যায়, সেখান থেকেও চোখের জল ফেলে দু-দফায় মোটা টাকা আদায় করে। দৈবাৎ কমলা বাপের বাড়ি আসায় কথায় কথায় কথাটা বেরিয়ে পড়ে—এবং কমলাও সতর্ক হয়। শেষ কমলার কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার পর নরেন আর আসে নি।

এ ছাড়াও চিঠিতে দুঃসংবাদ ছিল। উমার স্বামী রাত্রে কোনদিনই বাড়ি আসে না। বিবাহের আগে থেকেই সে বেশ্যাসক্ত—সে কথা নাকি ফুলশয্যার রাত্রে উমার কাছে অকপটে স্বীকার করেছে। তার ওপর তার শাশুড়ীর যে অমানুষিক নির্যাতনের সংবাদ লোকমুখে রাসমণির কাছে আসছে তা চিঠিতে লেখা যায় না।

উমা কিছুই বলে না কিন্তু বহু লোকের মুখে একই কথা শুনছেন তিনি, কাজেই অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। রাসমণির বহুদিন ধরেই ঘুম হ'ত না রাত্রে—এখন ফিটের অসুখ দেখা দিয়েছে। একা থাকতে হয়—কোন্ দিন মরে পড়ে থাকবেন এই ভয়ে বড়মাসিমাকে আনিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি দিনকতক থেকে ঝগড়া ক'রে চলে গেছেন। এ অবস্থায় যদি শ্যামা তার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে কোনমতে ওঁর কাছে নিয়ে যেতে পারে ত প্রকারান্তরে রাসমণির উপকার করাই হবে।

চিঠি পড়তে পড়তে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে থাকে শ্যামার। ক্ষমা তা লক্ষ্য ক'রে ব্যাকুল হয়ে বলেন, 'কী লিখেছেন বেয়ান, বৌমা? খারাপ খবর কি কিছু?—আমাকে পড়ে শোনাও না মা—'

চোখ মুছে চিঠি পড়বার চেষ্টা করে শ্যামা কিন্তু প্রথম প্রথম কিছুক্ষণ ঠোঁট দুটোই নড়ে শুধু—তা দিয়ে স্বর বেরোয় না। অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে সে একটু একটু ক'রে পড়ল। ক্ষমা প্রথম অংশটা শুনে আর্ত চিৎকার ক'রে উঠেছিলেন একবার, 'ঠাকুর, আর কত শোনাবে ছেলের কীর্তি? এবার নাও—দয়া করো।' কিন্তু শেষাংশ শুনে কে জানে কেন যেন কতকটা শান্ত হয়ে উঠলেন। উমার সুখ-সৌভাগ্যের সংবাদ এলে যেন তাঁর আরও লজ্জার কারণ হ'ত—সেজন্য অপরের দুর্ভাগ্যের বিবরণ তাঁর কাছে মনের অজ্ঞাতেই সান্ত্বনার কারণ হয়ে উঠল।

তিনি বললেন, 'তোমার মার উঁচু মন বৌমা, তাই অমন ক'রে লিখেছেন। ভিক্ষে কি ক'রে দিতে হয় তা তিনি জানেন। তোমার মা দেবী।'

শ্যামা নিমেষে আশ্বস্ত হয়ে উঠে বললে, 'তাহ'লে মাকে লিখে দিই যে আমরা যাচ্ছি?'

ক্ষমা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বৌমা, দীর্ঘ জীবনটা কেটে গেল আর কটা দিন বাঁচব, বেশ বুঝতে পারছি যে ভেতরে ভেতরে শেষ হয়ে এসেছে। আর কেন মা—পারো ত অন্তত এ অপমানটা থেকে বাঁচাও আমাকে।'

এরপর আর অনুরোধ করতে পারে না শ্যামা কিন্তু ভয়ে ওর ঘুম হয় না রাত্রে। দিন দিন ক্ষমা শয্যাগত হয়ে পড়ছেন, এর পর আর নিয়ে যাওয়াও যাবে না।

কিন্তু দিন-দুই পরে ক্ষমাই কথাটা পাড়লেন। শ্যামাকে ডেকে বললেন, 'বৌমা, এখানে আর থাকা উচিত নয়। বেশ বুঝতে পারছি—এই যে শয্যা পেতেছি এই শেষ। এঁরা অবশ্য আছেন, দেখাশুনোও করবেন জানি, তবু যতটা সম্ভব তোমার মার কাছেই থাকা উচিত এখন। এক কাজ করো মা, ঐ পাড়ায় আমার শ্বশুরের এক শিষ্য আছেন উকিল—তাঁকে চিঠি দাও, যেন কোনমতে একটা ঘর

দেখে দেন তাঁর বাড়ির কাছে। বাসন-কোসনগুলো ত আছে, তাঁতি-বৌয়ের ছেলে-দের দিয়ে কতক কতক যদি বিক্রি করাতে পারি—ওরা ত নবদ্বীপে যায়, সেখানেও বেচে দিতে পারে—তাহ'লে দুটো-একটা মাসের খরচ চলে যাবে। তারপর ওখানে তোমার মা রইলেন তিনি তোমাকে দেখতে পারবেন।'

শ্যামা এ ব্যবস্থার সহস্র অসুবিধার কথা ব'লে আর একবার বোঝাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু তিনি কেঁদে ওর হাত দুটো চেপে ধরলেন, 'মা, তার চেয়ে গঙ্গায় গা ঢালাও আমার কাছে ঢের সহজ।'

অগত্যা কলকাতার সেই শিষ্যবাড়ি চিঠি লেখা হ'ল। উকিলবাবুটি পত্রপাঠ উত্তর দিয়ে জানালেন যে তাঁরই একখানা ঘর খালি পড়ে আছে—একেবারে পৃথক মত, স্বচ্ছন্দে তাঁরা গিয়ে থাকতে পারেন। তারপর, যদি সেখানে ওঁদের সুবিধা না হয়, নিজেরা আশেপাশে ঘর দেখে নিতে পারবেন।

ক্ষমা চিঠিটা শুনে বললেন, 'যদিও ছেলেদের বিয়ের বহর দেখে ওরা গুরু-বংশ ত্যাগ করেছে, তাহ'লেও আমি জানতুম যে আমাকে একেবারে ত্যাগ করতে পারবে না। ওঁর ছেলেকে দীক্ষা দেওয়াবার আগে আমার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবে অন্য গুরু করেন উনি।...তাই চল মা, স্বামী-শ্বশুরের শিষ্য বংশ সেখানে তবু জোর আছে কিছু!'

তাঁতিগিন্নাকে বলতে ওঁর ছেলেরা নবদ্বীপ থেকে কাঁসারি ডেকে আনলে—তবু ব্রাহ্মণের বাসন কোন গৃহস্থ ওখানে কিনতে রাজী হ'ল না। যা টাকা পাওয়া গেল তাতে খুচরো দেনা শোধ ক'রে হাতে ত্রিশ-চল্লিশ টাকার বেশি রইল না। সেই ক'টি টাকা ভরসা ক'রেই দুটি স্ত্রীলোক বহুদিনের আশ্রয় গুপ্তিপাড়া একদিন ত্যাগ করলেন।

দুই

কলকাতায় এসেই ক্ষমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল। রাসমণি অনেক দেখেছেন—তিনি দিন সাতেক দেখেই মেয়েকে বললেন, 'ভাল বুঝছি না মা—তোর ভাশুর-কে লেখা দরকার!'

নরেনের ঠিকানা কারও জানা নেই। এ অবস্থায় দেবেনকে লেখা ছাড়া উপায় কি?

শ্যামা বড় জাকে বিস্তৃত চিঠি লিখে দিলে, তবু দেবেনের আসতে দিন চারেক দেরি হ'ল। শেষ পর্যন্ত যখন এসে পৌঁছল তখন ক্ষমার প্রায় কথা বন্ধ হয়ে এসেছে। দেবেন পাশে গিয়ে বসে কাঁদতে লাগল। ক্ষমা অতি কষ্টে কম্পিত হাত-

খানি তুলে ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

'মা, কিছু খেতে ইচ্ছে হয় তোমার ?'

দেবেন প্রশ্ন করে।

ক্ষমা হাসলেন একটু। তারপর অতিকষ্টে বললেন, 'নরেন—'

'তার কথা আবার মুখে আনছ মা তুমি ? তোমার লজ্জা করে না ? সে নাম আমার কাছে ব'লো না—সাফ ব'লে দিলুম !'

রাসমণি ঘোমটা দিয়ে একপাশে বসেছিলেন, বাধ্য হয়ে এবার মুখ খুললেন। বললেন, 'বাবা, যতই যা হোক—তাকে উনি পেটে ধরেছেন। নাড়ীর টান কোথায় যাবে বাবা ?…তুমিও ত কম অপরাধ করো নি, তবু তোমাকেও উনি আশীর্বাদ করছেন !'

দেবেন জ্বলে উঠে বললে, 'সে হারামজাদা শুয়োরের বাচ্ছা দেখুনগে যান খান্‌কী বাড়ি পড়ে আছে, আমি সেইখানে যাবো নাকি—তাকে ডাকতে ?'

রাসমণি আর কথা কইলেন না। কিন্তু দেবেন নিজেই খানিকটা ইতস্তত ক'রে সন্ধ্যার পর বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি গভীর হয়ে এল—ক্ষমার শ্বাসকষ্ট শুরু হ'ল—তবু কারও দেখা নেই। না দেবেনের না নরেনের। রাসমণি প্রমাদ গুনলেন। শেষে শেষরাত্রে বললেন, 'তোমরাই একটু একটু গঙ্গাজল দাও আর নাম শোনাও—পাষণ্ড ছেলেদের হাতে জল নেওয়ার অপমানটা বোধ হয় অদৃষ্টে নেই।' তিনি নিজেও বেয়ানের বুকে হাত বুলিয়ে নাম শোনাতে লাগলেন।

দেবেন এল একেবারে সকাল বেলা। তখন ক্ষমার শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেছে। খানিকটা থম্‌কে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'তা আমি কী করব ! মা মাগীর জন্যেই ত এইটি হ'ল—ও শালাকে খুঁজতে গিয়ে খুঁজে ত পেলুমই না—লাভে হ'তে পুরোনো জায়গায় গিয়েছি, সেই সব পাল্লায় পড়ে কি আর বেরিয়ে আসা যায় ! মাঝখান থেকে মার শেষ সময়টায় মুখে একটু জল পড়ল না ! ছো !'

তিন

নরেন যে সংবাদটা পায় নি তা নয়—কিন্তু শ্রাদ্ধের খরচের প্রশ্নটা উঠবে বলেই বোধ হয় এল ঘাটের আগের দিন। যেন সংবাদটা এইমাত্র পেলে—এই ভাবে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকে, 'য়্যাঁ—মা নেই ! মা, মাগো !' ব'লে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল।

দেবেন খানিকটা চুপ ক'রে ছিল কিন্তু তারপরই দিলে এক ধমক, 'মেলা য়্যাক্টো করিস্ নি নরো—চুপ ক'রে থাক্—তোকে চিনতে কারুর বাকী নেই। খবর কি তুই আজ পেলি ?'

'মাইরি দাদা, তোমার দিব্যি বলছি।'—এই বলে নরেন ওর দিক দু পা এগিয়ে এল—হয়ত বা গায়ে হাতে দিয়ে দিব্যি গালতেই।

'খবরদার ছুঁস নি। মিথ্যেবাদী কম্‌নেকার—জানিস না যদি ত মুখে এক-গাল দাড়িগোঁফ কেন? খালি পায়ে এলি কেন?'

নরেনের মাথায় অত কথা যায় নি। খানিকটা থতমত খেয়ে চুপ ক'রে থেকে নাকীস্বরে বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে শুরু করলে, 'ব'লে আমি ম'রতে বঁসেছিলুম, আজ এক মাস রোগে ভুগছি।'

'হ্যা—এক মাস ভোগারই চেহারা বটে। তোর মিছে কথা শুনলে ঘেন্না করে।'

'ত্যাখো দাদা, বেশি সতীপনা করো না। তুমি সে রাত্তিরে কোথায় কাটিয়েছিলে তা জানি নে?'

'দেখলে দেখলে—নচ্ছার হারামজাদার মিছে কথা ধরা পড়ে গেল। দেখলে!'

প্রায় চুলোচুলি বেধে ওঠে দেখে রাসমণি এগিয়ে এলেন। তিনি শ্রাদ্ধের যোগাড় ইত্যাদির ব্যাপারে কদিন এখানেই থাকছেন সারাদিন। খরচও তাঁরই—দেবেন খবর পেয়ে এক কাপড়ে চলে এসেছে এই অজুহাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। রাসমণি ডাকলেন, 'দেবেন!…এই কটা দিনও যদি ভাল থেকে মার কাজটা করতে না পারো বাবা, তাহ'লে আর এ সবে কাজ নেই—জিনিসগুলো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও!'

সে কণ্ঠস্বরে শুধু দেবেন নয়, নরেনও নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু কোনমতে শ্রাদ্ধটা কাটিয়েই নরেন আবার ডুব মারলে। নিয়মভঙ্গের দিনও রইল না। তিন চার দিন পরে মাথা চুলকে দেবেন বললে, 'সেখানে বিস্তর ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে—আমি ত আর অপেক্ষা করতে পারি না মা।'

'আর কেন অপেক্ষা করবে বাবা, তুমি যাও। আমি যখন ওকে পেটে জায়গা দিয়েছি—হাঁড়িতেও জায়গা দিতে পারব।'

রাধারাণী অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল শ্যামাকে জড়িয়ে ধরে। তার চেহারা হয়ে গেছে কঙ্কালসার। সর্বাঙ্গে ঘা—চোখ দিয়ে নাকি আজকাল পুঁজ পড়ে। বললে 'আমি আর বেশী দিন বাঁচব না ভাই, এই হয়ত শেষ দেখা—'

'ছি! কী যে বলো দিদি!'

'না ভাই, খারাপ ব্যামো ধরিয়েছিল বস্তিতে গিয়ে—সেই রোগ আমাতেও ছড়িয়ে গেছে। আর বাঁচবার সাধও নেই। ভয় শুধু ছেলেটার জন্যেই—দেখছিস ত ওরও কি অবস্থা। ছেলেটাও বেশী দিন বাঁচবে না—তাও বুঝছি। তবে আমি আগে যেতে পারি যাতে, সেই কথা বল্ তোরা।'

শ্যামা শোনে আর শিউরে ওঠে।

খারাপ ব্যামো সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই তার—কিন্তু ওর সন্দেহ হয় নরেনেরও তেমনি একটা কিছু আছে। এর আগের বারে সে তাকে সোজাসুজি প্রশ্নও করেছিল। নরেন সদম্ভে উত্তর দিয়েছিল, 'হবে না কেন, হয়েছে। ও সব ডাকসাইটে পাড়ায় গেলেই হবে—তাই ব'লে আমি কি দাদার মত? আমি দস্তুরমত চিকিচ্ছে করিয়েছি। কবিরাজী চিকিচ্ছে!'

কিন্তু সে কথায় শ্যামার আস্থা কম। অথচ তার দেহের মধ্যে আর একটি সন্তানের আগমন-সম্ভাবনা প্রায় আসন্ন হয়ে এসেছে। কী হবে তাই ভেবে এখন থেকেই ওর ঘুম হয় না।

মা বললেন, 'তাহ'লে তুই নে তৈরী হয়ে।'

শ্যামা ঘাড় নেড়ে বললে, 'আমি যাবো না মা।'

'সে কি রে, এখানে কে তোকে দেখবে? আমিই বা রোজ আসি কি ক'রে?'

'কিন্তু মা—ওখানে গেলে ও আর কোন দিনই আমাকে নিয়ে যাবে না, দিব্যি তোমার ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তি হবে, নিজেও দিব্যি হয়ত চেপে বসবে।'

'সে ওষুধ আমার জানা আছে মা। তুমি ভেবো না। তোমাকে রাখব ব'লে ওকে বাড়ি ঢুকতে দেব তা ভেব না।'

শ্যামা কী করবে ভেবে পায় না। অথচ এখানে একা থাকা, আসন্ন সন্তান-সম্ভাবনা—সে যে অসম্ভব। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখের জল মুছতে মুছতে উঠে পড়ে। বহুদিন পরে বাপের বাড়ি যাবে, মার কাছে যাবে কিন্তু কিছুমাত্র আনন্দ হচ্ছে না তার। এমন নিরানন্দে বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা কোন মেয়ে কখনও বোধ হয় কল্পনা করতে পারবে না।

স্বামীকে মা বাড়ি ঢুকতে দেবেন না। সে যদি কোনদিন বাড়িতে না-ই ঢোকে? চিরকাল বাপের বাড়ি থাকা? মার কাছে? মা-ই বা কদিন? দুশ্চিন্তায় হাত-পা যেন পাথরের মত হয়ে ওঠে—তাড়াতাড়ি নাড়তেও পারে না।

চার

শ্যামাকে বেশীদিন একা থাকতে হ'ল না। উমা এসে জুটল মাস-খানেকের মধ্যেই। একদিন সন্ধ্যায় বসে শ্যামা মাকে মহাভারত পড়ে শোনাচ্ছে—দরজার কড়া নড়ে উঠল কট্ কট্ কট্ কট্ ক'রে।

'এমন ভাবে কে কড়া নাড়ে রে!' রাসমণি বিস্মিত হয়ে ঝিয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে এলেন।

দরজা খুলে দেখা গেল একটি মোটাসোটা বর্ষীয়সী মহিলা—একগা গহনা, চওড়া-পেড়ে দামী শাড়ী পরনে—তার পিছনে উমা। উমা মাথা হেঁট ক'রে দাড়িয়ে কাঁদছে ও কাঁপছে—থরথর ক'রে।

'এ—এ কী ব্যাপার!' রাসমণি অতি কষ্টে বলেন।

'বলি বাছা, তুমি এর মা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মাগী, পেটে ঠাঁই দিয়েছিস্—হাঁড়িতে দিতে পারিস্ নি? মেয়েকে কি করতে রেখে দিয়েছিস্ সেখানে? এর চেয়ে দাসীবৃত্তি করলে যে খোরপোশ ছাড়া মাইনে পেত কিছু। সে তাড়কা রাক্কুসীর কাছে ফেলে না রেখে একগাছা দড়ি আর একটা কলসী কিনে দিলেও ত হ'ত—'

রাসমণি ততক্ষণে একটু সামলে নিয়েছেন। বললেন, 'আপনি কে জানি না—একথা কেন বলছেন তাও জানি না, কিন্তু মা—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এনে রাখাটা কি খুব সম্মানের কথা? শ্বশুরবাড়িতে দাসীবৃত্তি করাও ভাল—এই শিক্ষাই পেয়েছি আমরা!'

'তা কি আমরা জানি নে বাছা' একটু নরম হয়ে তখন তিনি বললেন, 'আমরাও হিঁদুর ঘরের মেয়ে। শ'বাজার রাজবাড়ির মেয়ে আমি—উচিত-অনুচিত সবই বুঝি। কিন্তু মা…সম্ভব-অসম্ভব আছে ত।…আমার বাড়ি বাছা ঐ পাড়াতেই, তোমার বেয়ানবাড়ির উঠোন আমার জানালা থেকে দেখা যায়—সবই দেখি। আজ তিন দিন এই মেয়েটাকে খেতে দেয় নি তার ওপর সমানে খাটাচ্ছে। আজ ঘড়া ক'রে রাস্তার কল থেকে জল আনতে গিয়ে উঠোনে আছাড় খেলে, শাশুড়ী মাগী ছুটে এসে আগে ঘড়া দেখছে, আমি আর অসৈরণ সইতে না পেরে বলনু যে আগে ঐ কচি মেয়েটাকে ছাখো বাছা। তা বললে কি বউ গেলে আবার বউ হবে—ঘড়া গেলে কিনতে হবে নগদ টাকা দিয়ে। তাও গেল—আজও সারাদিন ঐ ছুতো ক'রে খেতে দেয় নি। কি ভাগ্যি সন্ধ্যেবেলা মাগী বেরিয়েছে ছেলের অফিসে না কোথায়—সেই ফাঁকে আমি ওকে বার ক'রে নিয়ে এসেছি। এখন পুষতে পারো পোষো—নয়ত একটা কলসী কিনে গঙ্গায় দিয়ে এসো নিজে হাতে—'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে তিনি যেন হাঁপাতে লাগলেন। রাসমণি হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গেলে, 'এতখানি জিভ্ কেটে বললেন, 'হাঁ হাঁ বাছা করো কি! তোমরা ব্রাহ্মণ। পাপে ডুবিও না।'

'মা, পৈতে থাকলেই ব্রাহ্মণ হয় না—আপনি অনেক ব্রাহ্মণের চেয়ে উঁচু।'

'তা হোক বাছা। বাপ্‌রে—হাজার হোক তোমরা বামুনের মেয়ে—গোখরো সাপ!'

তিনি আর বসলেন না—ওখান থেকেই বিদায় নিলেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সেই গাড়িতেই ফিরে যাবেন—এই অজুহাতে থাকতে রাজী হলেন না।

সে রাত এই তিনটি প্রাণীর যে ভাবে কাটল তা অবর্ণনীয়। দুই বোনের চোখের জল একবারও শুকোল না—শুধু রাসমণি স্তম্ভিত স্থির ভাবে বসে রইলেন। ভোরের দিকে বার-দুই পর পর ফিট্ হবার পর প্রথম তাঁর চোখে জল এল।...

পরের দিন সকালেই দয়াময়ী এসে হাজির হলেন। ভেতরে ঢুকে উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, 'কৈ, কে কোথায় সব! আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই!'

উমা সে কণ্ঠস্বর শুনেই সভয়ে জড়িয়ে ধরল শ্যামাকে। রাসমণি বেরিয়ে এলেন।

'শোন বাপু। যে শিক্ষা দিয়েছ তোমার মেয়েকে, তার উপযুক্ত কাজই সে করেছে—কাল কুলত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেছে সে। কর্তব্য বুঝে জানালুম, এর পর আমার কোন দায়-দোষ নেই।'

'শ্বশুরবাড়ির শিক্ষা বেশী দিন পেলে হয়ত তাই করত বেয়ান', রাসমণি কঠিন কণ্ঠে বলেন, 'কিন্তু আমার শিক্ষা এখনও ভোলে নি বলেই তা করে নি। তাকে আমি এখানে এনে রেখেছি।'

'অ! তাই ত বলি—মা-মাগীর যোগসাজস! দ্যাখো, ভাল চাও ত আমার বৌ এখনি বার করো, নইলে আমি থানা-পুলিস করব!'

'ক্ষমতা থাকে তাই করো। আমার মেয়ে ও বাড়ির চৌকাঠ আর মাড়াবে না!' কণ্ঠস্বর শান্ত কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে ওঠে ওঁর।

'তাই বা কেন! আমি থানা-পুলিসের তোয়াক্কা রাখি না, আমি নিজেই নিয়ে যাবো। দেখি কে আটকায়!' দয়াময়ী দু পা এগিয়ে এলেন।

দয়াময়ী ছিলেন উঠোনে, রাসমণি রকের ওপরে। অকস্মাৎ তাঁর শরীরের সমস্ত রক্ত যেন ফুটে টগবগ ক'রে উঠল—তিনি পাশ থেকে বড় বঁটিখানা তুলে নিলেন।

'নরহত্যা মহাপাপ কিন্তু জানি মা জগজ্জননী এতে অপরাধ নেবেন না। তুমি যা করেছ তারপর তোমার সামনে দাঁড়িয়ে পাগল না হওয়া অসম্ভব। আর যদি এক মিনিট এখানে থাকো ত বঁটি দিয়ে দুখানা ক'রে কেটে ফেলব। এই গুরুর দিব্যি বলছি।'

সে সময় রাসমণির যে রুদ্র মূর্তি ফুটে উঠেছিল তা দেখে দয়াময়ীও ভয় পেয়ে গেলেন—কোনোমতে পা পা ক'রে পিছিয়ে এসে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। আর একটি কথাও বলতে সাহসে কুলোলো না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক

একটা গোটা দোতলা বাড়ির মধ্যে মাত্র তিনটি প্রাণী ওরা—মা আর দুই মেয়ে। শ্যামার খোকা ত শিশু। আর অবশ্য একটি ঝি আছে। পাড়ার বেকার ছোক্‌রাদের ভয় থাকা সত্ত্বেও চাকর রাখতে আর ভরসা হয় না রাসমণির—প্রথমত রূপসী ও তরুণী মেয়েরা রয়েছে বাড়িতে, দ্বিতীয়ত অসহায় তিনটি মেয়েছেলে, চাকর যে কেমন হবে তা কে জানে? খুন ক'রে সর্বস্ব নিয়ে যাওয়ার ইতিহাসও ত বিরল নয়!

কিন্তু সে যাই হোক্—এদের যেন দিন আর কাটে না। কাজ সামান্য, রাসমণিই সেটুকু করেন। তাছাড়া তাঁর নিত্য গঙ্গাস্নান আছে, পূজা-আহ্নিক আছে। ভগবানের কাছে দুঃখ জানিয়ে কেঁদেও অনেকটা সান্ত্বনা পান। কিশোরী দুটি মেয়েকে সে পরামর্শও কেউ কেউ দেন বৈকি—পাড়া-পড়শী যাঁরা আসেন, কিন্তু রাসমণি সে চেষ্টা করেন না। তিনি জানেন যে তা নিরর্থক। দেহ যে বয়সে পৌছলে মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়, সে বয়সের এখনও বহু বিলম্ব ওদের। তিনি বলেন, 'ওটা ভগবানকে নিয়ে ছেলেখেলা করা। ওতে পাপ আরও বাড়ে। ইষ্টের ছবি সামনে রেখে যদি মানুষকে ভাবে, তার মত পাপ আর কি আছে! তার চেয়ে কাঁদুক ওরা। ভগবান ওদের কাঁদতেই পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে, নইলে এমন হবে কেন?'

উমার এই সময় একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। কারুর মর্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী যে ঈর্ষার বিষয় হ'তে পারে, এ নিজে না অনুভব করলে হয়ত বিশ্বাসই করত না। শ্যামা যখন একের পর এক তার দুর্বিষহ বেদনার কাহিনী বিবৃত করতে থাকে তখন সহানুভূতিতে উমার চোখ ছলছল করতে থাকলেও মনে মনে কেমন যেন একটা অকারণ ঈর্ষাই অনুভব করে ও। মনে হয়, তবু শ্যামা এত দুঃখের মধ্যেও জীবনের স্বাদ কিছু পেয়েছে। আঘাত পেয়েছে—কিন্তু তাইতেই কি এটা প্রমাণ হয় না যে কিছু পেয়েছে সে স্বামীর কাছ থেকে? আঘাত পাওয়াও পাওয়া। তার স্বামীর মত ত উদাসীন নয় শ্যামার বর! জোর ক'রে দখল প্রমাণ করে, সম্ভোগ করে সে পশুর মত বলপ্রয়োগ ক'রে—তবু, তবু তা থেকে আসক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। আর ওর স্বামী? রূপবান, মিষ্টভাষী—যে কোন মেয়েরই কামনা করার মত—তার কাছে ওর পরিপূর্ণ কৈশোরের সমস্ত কামনা ও অনুরাগের

ডালি নিয়ে গিয়ে ফিরে এল, সে কঠোর ঔদাসীন্য ও অনাসক্তির কপাট এতটুকু টলাতে পারলে না।...এক এক সময় মনে হয় তার স্বামী অমনি নিষ্ঠুর, অমনি পশু হ'লেও সে নিজের জীবন সার্থক মনে করত। যে সুখের স্বাদ সে কোনদিনই পেলে না, শুধু তার ইঙ্গিত মাত্র পেলে—সে সুখের সঙ্গে মিশে যত আঘাতই আসুক না, সানন্দে সহ্য করত সে। আর হয়ত তাই স্বাভাবিক। নইলে শ্যামাও তার ঐ দানব স্বামীর জন্য প্রতিটি মুহূর্ত গুনত না!

উমা শোনে আর মধ্যে মধ্যে তার বুক চিরে এক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। শ্যামা মনে করে সেটা তার দুঃখের সমবেদনায়—কিন্তু উমা অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে তা নয়—যেটা পেয়ে শ্যামার দুঃখ, সেটা না পেয়েই উমার এই দীর্ঘশ্বাস!

এমনিই হয় জীবনে। আমার কাছে যা দৈন্য তা হয়ত তোমার কাছে ঐশ্বর্য। পৃথিবীর সব অভাবই তাই আপেক্ষিক। যে মানুষ বৃহত্তর বেদনার ছবি দেখে সামনে, সে নিজের বেদনায় সান্ত্বনা পায় সহজে।

সে কথা থাক্—

শ্যামার প্রসবের সময় এগিয়ে আসে। রাসমণি বিপন্ন বোধ করেন। বড় জামাই ধনী ব্যক্তি,—অর্থসাহায্য করা তার পক্ষে সামান্য কথা। কিন্তু এসব ব্যাপারে অর্থের চেয়ে লোকবলটা বেশী প্রয়োজন। প্রয়োজন একটি পুরুষমানুষের। রাসমণি এক এক সময় আর সহ্য করতে পারেন না—অনুপস্থিত জামাইকে লক্ষ্য ক'রে কটূক্তি করেন, 'ভাত দেবার ভাতার নয়—নাক কাটবার গোসাঁই!...এদিক নেই ওদিক আছে। আর তুইও তেমনি বেহায়া মেয়ে।'...ইত্যাদি।

কিন্তু তাতে শ্যামার অশ্রুর পরিমাণই শুধু বেড়ে যায়। এক-একদিন সে রাগ ক'রে খায় না। স্বামীর বিরহ যত দীর্ঘতর হয় ততই যেন এক অদ্ভুত নিয়মে তার দোষগুলো মুছে যায় ওর মানস-চিত্র থেকে। এমনও ওর মনে হয় এক এক সময়ে যে, সে এখন এসে পড়লে যেন সব সমস্যার সমাধান হ'ত। যদিও নিজের মনেই সে জানে এ-কথা কল্পনা করাও হাস্যকর।

রাসমণি অবশেষে অদ্ভুত ভাবে এক আশ্রয় পেয়ে যান।

সেটা এক বর্ষার রাত—ওঁরা তিনজনে শুয়েছেন একই ঘরে—বাকী গোটা বাড়িটা খালি। এমন সময় শোনা গেল গলির দিকের বারান্দায় কার পায়ের শব্দ!

ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠবারই কথা কিন্তু রাসমণি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি উঠে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে গেলেন। তবে যে ছেলেটিকে নজরে পড়ল তাকে

দেখে রাসমণিরও মুখ গেল শুকিয়ে। পাড়ার এক বিখ্যাত জমিদারবাড়ির বেকার ছেলে—নিজে গুণ্ডা এবং একটি দুর্ধর্ষ গুণ্ডার দলের প্রতিপালক। ইতিমধ্যেই তার কুকীর্তির ইতিহাসে আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। তবে এতদিন তার স্ত্রীলোক-ঘটিত কুকীর্তিগুলো শহরের দুটি কুখ্যাত বেশ্যাপল্লীতেই আবদ্ধ ছিল। কতকটা সেজন্যও বটে—কতকটা পয়সার জোরেও বটে, পুলিশ থাকত উদাসীন। সম্প্রতি কি একটা ব্যাপারে জেল বাঁচানো যায় নি, বছরখানেক জেল খেটে সবে ফিরেছে। এরই মধ্যে যে আবার সে এমন সাহস করবে তা রাসমণির স্বপ্নেরও অগোচর। গ্যাসপোস্ট বেয়ে বারান্দায় উঠেছে। লক্ষ্য সম্বন্ধেও কোন সংশয় থাকবার কারণ নেই!

রাসমণি পাথর হয়ে গেলেন। সে লোকটি—রজত তার নাম—সেও ওঁকে দেখেছে। সে বেশ সহজ কণ্ঠেই বললে, 'ভাল চাও ত দোরটি খুলে দিয়ে সরে পড়ো—কাকে-বকেও টের পাবে না। নইলে মিছিমিছি হাঙ্গামা হবে—পাড়ায় আর কাল মুখ দেখাতে পারবে না। আমাকে ত চেনো, যা ধরেছি তা করবই।'

রাসমণি এই প্রথম ভয় পেলেন। ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল তাঁর হাত-পা। কী জবাব দেবেন ভেবেই পেলেন না। অসহিষ্ণু রজতেরও তখন অপেক্ষা করার মত মনের অবস্থা নয়। সে সজোরে মারলে একটা লাথি দোরের ওপর। পুরোনো বাড়ির জরাজীর্ণ দোর ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠল সে পদাঘাতে।

মেয়েরাও উঠে প'ড়েছিল। তারা এবার ভয়ে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। সবাই মিলে দোরটা প্রাণপণে চেপে ধরে চেঁচাতে লাগল! ওদিকে রজতেরও মুখ থেকে কটূক্তি এবং পা থেকে লাথি যেন বন্যার মত বেরিয়ে আসছিল।

সে গোলমালে পাড়ার যে কারুর ঘুম ভাঙে নি তা নয়। জানলাও খুলে গিয়েছিল কয়েকটা আশেপাশে। রাসমণিকে পাড়ায় সবাই শ্রদ্ধা করে। কিন্তু রজতকে এই নাটকের নায়ক দেখে সবাই নিরস্ত রইল। সবাইকার জানলা আবার নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, সকলেই যেন ঘুমে অচেতন।

শুধু বেরিয়ে এলেন শেষ পর্যন্ত একটি মুসলমান পরিবার। সাদিক মিয়া নাম, রাধাবাজার অঞ্চলে কিসের কারবার আছে। সাতটি জোয়ান ছেলে তাঁর—তাঁরাই রজতকে ভয় করতেন কম। হৈ-হৈ ক'রে সাতটি ছেলে এবং চাকর-বাকর সুদ্ধ সবাই এসে পড়তে রজত ওপরের বারান্দা থেকেই একটা লাফ মেরে নিচে পড়ল এবং 'আচ্ছা, পরে দেখে নেব!' বলে শাসিয়ে গলির অপর দিকে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন অবশ্য অনেকেই বেরিয়ে এলেন। হুম্‌কি হাম্‌কিও বিস্তর বর্ষিত হ'তে

লাগল অদৃশ্য রজতের ওপর। কিন্তু বুদ্ধিমতী রাসমণির এঁদের অবস্থা বুঝে নিতে দেরি হয় নি। তিনি মাথায় কাপড়টা টেনে দোর খুলে বেরিয়ে এসে হাত জোড় ক'রে সাদিককে বললেন, 'বাবা, আপনার দয়াতেই আমার মেয়েদের ইজ্জৎ প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন—কী আর বলব! এ ঋণ শোধ দেবার ত আমার কোন ক্ষমতা নেই।'

সাদিকের চোখ ছলছলিয়ে এল, তিনি বললেন, 'খোদা সাক্ষী রইলেন মা, আমাকে বাবা বলেছ—আজ থেকে তুমিও আমার মেয়ে। আমার আর আমার সাত ছেলের গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না কোনদিন। তুমি নির্ভয়ে থাকো।'

সাদিক সত্যি-সত্যিই যেন ওঁকে মেয়ের মত দেখলেন। পরের দিনই সকালে বৃদ্ধ নিজে মিস্ত্রী সঙ্গে ক'রে এনে দরজায় ভারি লোহার ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দিয়ে গেলেন, কাঁটা-তার দিয়ে বারান্দা ঘিরে দিলেন। তারপর থেকে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় মেয়ে কি পুত্রবধূ একজনকে পাঠিয়ে দিতেন—এঁদের খবর নিয়ে যেতে। তারা সন্তর্পণে এসে ভেতরের রকে বসত—এবং যথেষ্ট সতর্ক থাকত, এঁদের শুচিতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে। রাসমণিই পরে জোর ক'রে তাদের আপন ক'রে নিলেন। এক সেট পেতলের বাসনও করলেন ওদের খাওয়ানোর জন্য। বাসন-গুলো একটু আগুন ঠেকিয়ে মেজে নেওয়া হ'ত এবং পৃথক থাকত কিন্তু অতিথিরা কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা টের পেতেন না। শ্যামা উমাকে সঙ্গে ক'রে রাসমণিও যেতেন মধ্যে মধ্যে—ফিরে এসে কাপড় ছাড়তেন। এইটুকু সংস্কারও যে থাকা উচিত নয় তা তিনি স্বীকার করতেন, তবে বলতেন, 'কী করব বল্, জন্মাবধি যা সংস্কার হয়ে গেছে সেটা ছাড়া কি সহজ? মানুষ মানুষই—তা জানি, তবু—'

ক্রমে এ দুটি পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল। শ্যামা উমা সাদিকের নাতনী রাবেয়া আর নসিবনের সঙ্গে সই পাতিয়ে ফেলল।

দুই

শ্যামার এবার মেয়ে হ'ল। ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। সাদিক মিয়াদের দৌলতে দাই ডাকা, বাজার-হাট করা—কোনটাই আটকায় নি। কিন্তু ওদিকটায় নিশ্চিন্ত হ'লেও, রাসমণির ব্যাপারটা ভাল লাগে না। এ কি দুর্দৈব তাঁর। দুটি বিবাহিতা মেয়ে গলায় পড়ল—একটি আবার ছেলেমেয়েসুদ্ধ। এদের কি হবে—কি ব্যবস্থা করবেন কিছুই যেন ভেবে পান না। তাঁর ইষ্ট এবং পরকাল—এ অভিশপ্ত জীবনের সর্বশেষ সান্ত্বনা, তাও যেন ক্রমে সুদূর হয়ে পড়ে।

মেয়ের নাম রাখা হয় মহাশ্বেতা। মাসী কমলা নাম রাখে। সে নভেল পড়েছে বিস্তর। ছেলের নামও সে-ই রেখেছিল, চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিল—হেমচন্দ্র। মহাশ্বেতা নাম শ্যামার খুব পছন্দ হয় নি কিন্তু রাসমণির ভাল লাগল।

কোথায় মনের কোণে শ্যামার যেন আশা ছিল যে অন্তত প্রসবের সময় নরেন এসে পড়বে। এমন ত হঠাৎই আসে সে—

এ আশার যে কি কারণ তা সে জানে না। তবু আশা ছিল ঠিকই।

কিন্তু দিন সপ্তাহ মাস—ক্রমে দু'তিন মাস হয়ে গেল, নরেনের কোন খবরই নেই। নির্জনে চোখের জল ফেলে শ্যামা। একদিন ব'লে ফেলেছিল, 'হয় ত ওখানে এসে ফিরে গেল মা—আর ক-টা দিন দেখে এলে হ'ত।' মা তাতে গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছিলেন, 'বেশ ত, ঘরভাড়া ক'রে দিচ্ছি, সেখানে গিয়েই থাকো। সে ত এ বাড়ি চেনে না, খবর নেয় ত ওখানেই নেবে।'

তারপর আর সাহস হয় নি কোন দিন শ্যামার সে প্রসঙ্গ তুলতে।

শেষ পর্যন্ত বুঝি ভগবান ওর ডাক শোনেন।

একদিন দুপুরবেলা কমলা এল পাল্কী ভাড়া ক'রে—প্রায় ছুটতে ছুটতে। নরেন এসেছে তার ওখানে, এদের দেখতে চায়। শ্বশুরবাড়ি সোজাসুজি আসতে সাহসে কুলোয় নি তাই বড় শালীর কাছে গেছে সুপারিশ ধরতে।

শ্যামা উৎসুক নেত্রে চায় মার দিকে। রাসমণি শুধু সংক্ষেপে ঘাড় নেড়ে বলেন, 'না।'

সকলে স্তম্ভিত। শ্যামার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে, সে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বসল। কমলা কিছুক্ষণ হতবাক্ হয়ে চেয়ে থেকে অতিকষ্টে যেন উচ্চারণ করে 'না?'

এবার কিছু কঠোর ও দৃঢ়কণ্ঠেই বলেন রাসমণি, 'না! থাকবার আশ্রয় ঠিক ক'রে, এদের ভরণ-পোষণের ভার নিয়ে যেদিন নিয়ে যেতে পারবে সেদিন যেন গাড়ি নিয়ে এসে বাইরে দাঁড়ায়, আমি মেয়েকে পাঠিয়ে দেব। জামাইয়ের আর স্থান নেই এ-বাড়িতে।'

কিছুক্ষণ সকলেই স্তব্ধ। শেষে কমলা বেশ একটু ক্ষুণ্ণভাবেই বলে, 'এ আপনার কিন্তু অন্যায় মা!'

রাসমণি শান্ত স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে উত্তর দেন, 'আমি তোমার পেটে হই নি মা, তুমি আমার পেটে হয়েছ। ন্যায়-অন্যায় বিচার যদি এতদিনে না জন্মে থাকে ত তোমার কথায় আর তা জন্মাবে না। আমি জানি দুই বিধবা মেয়ে পুষছি বাড়িতে।'

শ্যামা রাগ ক'রে উঠে চলে গেল। কমলারও চোখে জল ভরে এসেছিল কিন্তু

রাসমণির মুখের চেহারা দেখে আর কথা কইতে সাহস হ'ল না। শ্যামাকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন কথা খুঁজে না পেয়ে সেই পাল্কীতেই আবার কমলা ফিরে গেল।

নরেন অবশ্য তখন কমলার দোতলার ঘরে টানাপাখার নিচে আরামে ঘুমোচ্ছে। তার পরনে শত-ছিন্ন কাপড়, খালি পা। সর্বাঙ্গ রুক্ষ। কমলা ওকে দেখামাত্র আনন্দের আতিশয্যে কোনমতে বামুন ঠাকরুণকে ওর খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেই চলে গিয়েছিল। স্নানের কথা কেউ বলেও নি, সেও আবশ্যক মনে করে নি। মেঝেতে যে ঢালা বিছানার চাদরটা সদ্য পাল্টানো হয়েছে সেটা ইতিমধ্যেই মলিন ও ধূলি-ধূসর হয়ে উঠেছে।

এই পশুকে আত্মীয় বলে স্বীকার করতে লজ্জাই করে। কিন্তু কমলার মন বড় কোমল, তার ওপর শ্যামার কথা ভেবে সত্যিই ওর রাত্রে ঘুম হয় না। কঠিন কথা মুখে এলেও যত্নে দমন করলে। আস্তে আস্তে ওর ঘুম ভাঙিয়ে সরাসরি রাসমণির আদেশ বা নির্দেশ জানালে।

নরেন বললে, 'তাই ত! মাগীর জেদ ত কম নয়। মেয়েটাকে দেখি নি তাই —নইলে বোয়ের জন্যে ত ঘুম হচ্ছে না!...যাক্ গে—দিদি, এবেলা একটু পাঁটা লুচি খাওয়ান দিকি—অনেক দিন ভাল-মন্দ খাই নি।'

এই বলে সে বিরাট একটা শব্দ ক'রে হাই তুলে আলস্য ত্যাগ করলে—আরামে ও অতি নিশ্চিন্ত ভাবে।

অতিকষ্টে মনোভাব গোপন ক'রে কমলা বললে, 'আচ্ছা সে ব্যবস্থা হবে, তুমি ভাই চান করো দিকি ভাল ক'রে তেল মেখে—'

'চান? এই অবেলায়?'

'তা হোক।'

'মুশকিল। কাপড়-চোপড়—'

'আচ্ছা সে ব্যবস্থা হবে। তুমি উঠে কলঘরে যাও দিকি। বিছানাটার কি হাল করেছ?'

'ইস—তাই ত! ময়লা হয়ে গেছে, না? আচ্ছা চানই করছি—এক বাটি তেল দিতে বলুন তাহলে আপনার ঝিকে। আর অমনি এক ছিলিম তামাক—'

কমলা স্বামীর একখানা ধোয়া কাপড় বার ক'রে দিলে। একটা জামাও। নরেন অনেকদিন পরে ভাল ক'রে স্নান ক'রে টেরি কেটে গুন্‌গুন্ ক'রে আদি-রস-ঘেঁষা একটা গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে এল কলঘর থেকে। তারপর জামাকাপড় পরে আর একটি ঘুম। আহারাদি ক'রে কিন্তু আর রাত্রে থাকতে রাজী হ'ল না কিছুতেই, বললে, 'দিদি, অনেকদিন পরে আজ বড্ড আরাম হয়েছে। ওটা পুরো

ক'রে ফেলি। এখানে শুলে ঘুম হবে না কিছুতেই—একটা টাকা দিন দিকি। নিদেন আট আনা। আমি ফিরিয়ে দেব ঠিক। সেজন্যে ভাববেন না!'

কমলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টাকাটা বার ক'রে দিলে!

ভালই হ'ল, স্বামী সেদিন তখনও ফেরেন নি, বরানগরে বাগানবাড়ি দেখতে গেছেন কাজকর্ম সেরে। এই আত্মীয় তাঁর সামনে দেখাতে যেন লজ্জায় মাথা কাটা যায়!

এরও দিন-পনরো পরে, ঝিয়ের অসতর্কতার অবসরে দোর খোলা পেয়ে নরেন সটান্ এ-বাড়ির দোতলায় এসে হাজির।

রাসমণি তখন দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের পর উঠে সুপুরি কাটছেন। ওকে দেখে শুধু যে বিস্মিতই হলেন তাই নয়—এমন একটা অপরিসীম ঘৃণা ওঁর কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলে উঠল যে কিছুতেই কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন না, নীরবে শুধু তাকিয়েই রইলেন।

কথা কইলে নরেনই। নাটকীয় ভাবে হাত-পা নেড়ে বললে, 'ব্যবস্থা ক'রেই এসেছি। বার করুন দিকি চট্‌পট আমার ছেলেমেয়েদের আর পরিবার।' এই বলে রাসমণির উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বেশ গলা ছেড়ে হাঁক দিলে, 'কৈ গো কোথায়! তৈরী হয়ে নাও তাড়াতড়ি।'

রাসমণি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তার আগে কি ব্যবস্থা করেছ শুনি?'

'কেন? সে খবরে আপনার দরকার কি? আমার পরিবার আমি যেখানে খুশি নিয়ে গিয়ে তুলব।'

রাসমণি কী একটা কঠিন জবাব দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই শ্যামা বলে উঠল, 'কোথায় নিয়ে যাবে না জেনে আমি নড়ব না এক পা-ও। তোমাকে বিশ্বাস নেই, যদি খারাপ পাড়ায় নিয়ে গিয়ে তোলো!'

যদিও সে এতদিন একান্ত মনে স্বামীকেই কামনা করছিল তবু আজ এই মুহূর্তে তার আশঙ্কাই প্রবল হয়ে উঠল আবার। আর দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা উদ্ধত অভিমানও।

নরেন ধমক দিয়ে উঠল, 'থাম্ থাম্। মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে হবে না। ছোট মুখে বড় কথা!…হাজার হোক আমরা গুরুবংশ, কানে ফুঁ দিলে আমাদের পয়সা খায় কে?…পদ্মগ্রামের সরকারবাড়ি নিয়ম-সেবার কাজ নিয়েছি। একটা ঘর ছেড়ে দেবে, সেইখানেই নিয়ে গিয়ে তুলব। নাও নাও, চট্‌পট তৈরি হয়ে নাও। এখন হাঁটা দিতে শুরু করলে তবে যদি রাত্তিরে গিয়ে পৌঁছতে পারি।'

'হেঁটে যাবেন ? এতটা পথ ? সে কি ?' উমা প্রশ্ন করে।

'হুঁ। নইলে কি নবাব-নন্দিনীর জন্যে গাড়ি পাল্কী করতে হবে নাকি ? অত ক্ষ্যামতা আমার নেই !'

রাসমণি ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন কতকটা। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে উমাকে ডেকে বললেন, 'বেহায়াটাকে বল উমি, রাত্তিরে আমি নাতি-নাতনী পাঠাবো না। অত বাহাদুরিতে কাজ নেই, আজ থাক্। কাল সকালে যেন যায়। গাড়ি ক'রেই যায় যেন, গাড়িভাড়া আমি দেব।'

মুহূর্তে সব আস্ফালন থেমে গেল। একেবারে নিস্পৃহ নিরাসক্ত কণ্ঠে নরেন বললে, 'দেখুন আপনাদের যা সুবিধে। মোদ্দা, আমি সেধে থাকতে যাই নি, এর-পর যেন আমাকে দুষবেন না।'

তারপর বিনা নিমন্ত্রণেই জাঁকিয়ে বসে বললে, 'উমা আমার ভাই আবার তামাক খাবার অভ্যেস—ঝিটাকে বাজারে পাঠাও দিকি, একটা থেলো হুঁকো আর টিকে-তামাক কিনে আনুক।'

রাত্রে শ্যামা প্রশ্ন ক'রে সব জেনে নিল। ঠাকুরঘরের সঙ্গে লাগাও একখানি পাকা ঘর তারা ছেড়ে দেবে। আর মিলবে আধসের আতপ চালের একখানা ক'রে নৈবেদ্য, রাত্রে শেতলের একপো দুধ আর ক-খানা বাতাসা। এই ভরসাতে নরেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে সেই নিবান্দাপুরীতে নিয়ে যাচ্ছে। জায়গাটা কোথায় সে সম্বন্ধে শ্যামার কোন ধারণাই নেই, শুধু শুনলে যে শিবপুর কোম্পানীর বাগান থেকেও প্রায় দু ক্রোশ দূরে, অজ পাড়াগাঁ।

শ্যামা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত আড়ষ্ট হয়ে থেকে বললে, 'তারপর ? চলবে কিসে ?'

'শাঁকে ফু ! পুরুতগিরি করব। ঢের যজমান জুটে যাবে। বাপ-ঠাকুদ্দা ঐ ক'রে অত পয়সা ক'রে রেখে গেছে—আমি শুধু সংসারটা চালাতে পারব না ?

'তাদের পেটে বিদ্যে ছিল। তুমি তো পূজোর মন্তরও জানো না।' রাগ ক'রে বলে শ্যামা।

'আরে—শাঁখ ঘণ্টা ত নাড়তে পারব ! তাতেই হবে। তাতেই হবে। মন্তর আবার কি, আমি ঠাকুর হাব্‌লা গোব্‌লা, ভোগ খাও ঠাকুর খাবলা খাবলা। এই ত !'

নিজের রসিকতায় নিজেই হা-হা ক'রে হেসে ওঠে। পাশের ঘরেই মা শুয়ে আছেন মনে পড়ায় শ্যামা তাড়াতাড়ি ওর মুখের ওপর হাতটা চেপে ধরে।

হাসির ধমকটা সামলে নিয়ে হঠাৎ নরেন বলে, 'তোমার মা মোদ্দা রাঁধে ভাল। খাওয়াটা বড্ড চাপ হয়েছে।'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একসময়ে বলে, 'উমিটা ত দিব্যি দেখতে হয়েছে। ভায়রাভাইটা নিরেট বোকা, মাইরি!'

শ্যামা অন্ধকারেই শিউরে উঠল। ভয়ে না ঘৃণায়—তা নিজেই বুঝল না।

সকালে উঠে জলযোগাদি সেরে নরেন শাশুড়ীর উদ্দেশে বলে, 'তাহলে কিছু বাসন-কোসন বিছানা-টিছানা অমনি গুছিয়ে দেবেন মা। নতুন ক'রে সংসার পাতা, বুঝতেই ত পারছেন। গাড়ি ক'রেই যখন যাওয়া হবে তখন দিব্যি গাড়ির চালে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে'খন।'

উত্তর দেবেন না মনে ক'রেও কথা কয়ে ফেলেন রাসমণি, 'অত যে বাসন ছিল সিন্দুক ভরা—তার কিছু নেই?'

'যা পেয়েছি তা কি আর আছে। কবে বেচে মেরে দিয়েছি। আর বাকী সব লোকের বাড়ি জমা ছিল—দিলে না শালারা—মেরে দিলে!'

বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই জবাব দেয়।

রাসমণি নতুন ক'রে ঘর-বসতের জিনিস সাজিয়ে দেন চোখের জল মুছতে মুছতে। যাবার সময় গাড়িভাড়া ছাড়া পাঁচটা নগদ টাকাও চেয়ে নেয় নরেন, 'গিয়ে ত বাজার-হাট আছে, বুঝলেন না! আমি ত শূন্যিরেস্ত। আপনি আবার নাতি-নাতনীকে দুধ খাইয়ে খাইয়ে যা নবাব ক'রে তুলেছেন!'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এক

খালি বাড়িটা আরও ফাঁকা লাগে। হা-হা করে বিরাট শূন্যতা। শুধু ত শ্যামা যায় নি, তার সঙ্গে হেমও গেছে; দু'বছরের শিশু তার হাসির কলরবে বাড়িতে যে প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে রেখেছিল, তা নিঃশেষে মরে গিয়েছে যেন।

রাসমণি আরও বেশী সময় দেন পূজোতে। কিন্তু উমার কিছুই করবার নেই। এক এক সময় ভয়াবহ শূন্যতা ও নিষ্ক্রিয়তায় মনে হয় যেন সে পাগল হয়ে যাবে। নির্জন একান্তে ঢিব্ ঢিব্ ক'রে মাথা খোঁড়ে সে মধ্যে মধ্যে।

সাদিক মিয়া বা সাদিক মুসলমান (এই নামেই তিনি পাড়ায় বিখ্যাত ছিলেন) উপদেশ দেন, 'নিচের তলাটা ভাড়া দাও মেয়ে—তাতে বাড়িতে লোকজনও থাকবে, তোমার ভাড়ারও অনেকটা সুসার হবে।'

কিন্তু রাসমণি রাজি হন না। ভাড়াটের সঙ্গে একত্র থাকা যে কী, সে সম্বন্ধে তাঁর কিছু অভিজ্ঞতা আছে বৈকি। আশপাশের বাড়িতে নিত্য কলহ শুনে শুনে

তিনি ক্লান্ত। কে কার সিঁড়ি ধোয়ার পালায় ফাঁকি দিয়েছে, কোন্ ভাড়াটে পাইখানা পরিষ্কার করানোর শর্ত মানছে না, কে কতটা জল বেশী খরচ করছে—এমনি হাজারো ঝঞ্ঝাট। তাছাড়া গুচ্ছের ছেলেমেয়ে হয়ত থাকবে—চ্যাঁ-ভ্যাঁ—নোংরামি। না, সে তিনি পারবেন না।

'বরং বুড়ো গোছের একটা দারোয়ান যদি পাওয়া যায়—দোকানে কি অফিসে কাজ করে, এখানে রাত্রে থাকবে, সামান্য ফাই-ফরমাশ খাটবে—সেই চেষ্টা বরং দেখুন বাবা।'

মাস দুই পরে সাদিক তার চেয়ে ভাল প্রস্তাব আনেন, 'এক ভদ্রলোক ছোটখাটো একটা ছাপাখানা চালাবে—নিচের তলাটা ভাড়া দেবে? নটায় প্রেস খোলে, বড়জোর সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকবে। তারপর চাবি দিয়ে বাড়ি চলে যাবে। ভাড়াও দিতে চাইছে কুড়ি টাকা। এটা পেলে তোমার আর বিশেষ ভাড়াই লাগবে না। ত্রিশ টাকার মধ্যে কুড়ি টাকাই ত আদায় হয়ে যাচ্ছে।'

প্রস্তাবটা রাসমণির মন্দ লাগে না। মেয়েছেলে থাকলেই ছেলেমেয়ে থাকবে। গণ্ডগোল চেঁচামেচি—হাজার রকমের ঝঞ্ঝাট। অথচ বাসাড়ে বেটাছেলে থাকার যে অসুবিধা ও বিপদ, এক্ষেত্রে সে সব সম্ভাবনাও নেই। সারাদিন কাজ করবে—সন্ধ্যাবেলা চলে যাবে। সে সময়টা নিচে যাবার দরকার কি?

তবু একটু চিন্তিত মুখে বলেন, 'কিন্তু কল-পাইখানা? সে ত নিচের তলায়!'

সাদিক বললেন, 'সেটা একটা পার্টিশানের মত দিয়ে দিলেই হবে। ওদের ব'লে দেব যে—কল-পাইখানা সরতে পারবে না। বাইরে ত সরকারী কল আছে। এধারের সিঁড়ির সঙ্গে কলতলাসুদ্ধ ঘিরে আমি করগেটের বেড়া দিয়ে দিচ্ছি। ওদের সঙ্গে সম্পর্কই থাকবে না—কেমন?'

রাসমণি রাজী হলেন। টাকার কথাটাও একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে একেবারে তলায় এসে ঠেকেছে—আর কতদিন চলবে তা ভাবতে গেলেও ভয় হয় তাঁর।

সাদিক মিয়া লোক পাঠিয়ে করগেট দিয়ে বেশ ক'রে উঠোনের মধ্যে বেড়া টেনে দিলেন। তার একটা দোরও হ'ল। সেটা খুললে তবে বাইরের দিকে পড়ে বাড়ি থেকে বার হওয়া যায়। ভেতরের দিকের ছোট একটা ঘরও তাঁদের রইল, শুধু ওদিকের দুখানা ঘর ছেড়ে দেওয়া হ'ল ভাড়াটেদের। কথা হ'ল ভেতরের দিকের দোরও তারা বন্ধ রাখবে। রাস্তার দিকেই তাদের যখন কাজকারবার, অন্তঃপুরে আসবার দরকার কি?

মাসের পয়লা থেকে ভাড়াটে এল। দুদিন আগে থেকেই তাদের লটবহর আসতে শুরু হয়েছে। টাইপ রাখার খোপ-ওলা কাঠের কেস্, গ্যালি রাখার র্যাক্, টুল, চেয়ার, টেবিল। জন-দুই মিস্ত্রী এসে একটা ছোট ট্রিড্‌ল্ প্রেসও লাগিয়ে চালিয়ে দিয়ে গেল। এ ছাড়া আরও এল কিছু রবার স্ট্যাম্প করার সাজ-সরঞ্জাম।

উমার কাছে এসব জাদুঘরের সাজিয়ে রাখা জিনিসের মতই দ্রষ্টব্য। সে ইতিমধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখারও একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছে। সিঁড়ির একটা বাঁকে বসলে রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে ওদের বড় ঘরটার জানলার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি পাঠানো যায় বহুদূর। উমা সেইখানে বসে দেখে অবাক্ হয়ে। ওর ডাগর দুটি চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়েই থাকে, রেলিংএ চেপে রাখার ফলে শুভ্র গৌর ললাটে ছাপ ফুটে ওঠে—তবুও সেখান থেকে না পারে নড়তে আর না পারে চোখ ফেরাতে।

বিস্ময়!

ওর আগাগোড়াই বিস্ময় লাগে। টুলে বসে কেমন দ্রুত হস্তে কম্পোজিটাররা বিভিন্ন খোপ থেকে টাইপগুলো পর পর সাজায়। কী নিচ্ছে সেদিকে নজর নেই, নজর ওদের লেখা কাগজখানার দিকে শুধু। সকলেরই খাটো কাপড় পরনে—গায়ে ছেঁড়া জামা আর খালি পা। টুলে বসে বসে ওদের ঘাড় ব্যথা করে না? নটায় এসে বসে, ওঠে কেউ সন্ধ্যা ছটায়—কেউ আরও পরে। দুপুরে শুধু একবার উঠে মুড়ি খায়। আধ পয়সার মুড়ি আর আধ পয়সার বেগুনি কি ফুলুরি।

আবার কল চালিয়ে ছাপা—সেও কম বিস্ময় নয়! পা দিয়ে কি একটা ঠেলে আর চাকা ঘোরে। কেমন লুচি বেলা বেলুনের মত দুটো বেলুন একটা লোহার চাকি থেকে কালি নিয়ে সীসের অক্ষরের ওপর বুলিয়ে দিয়ে যায়—তারপর তাতে পিনে আটকানো কাগজখানা গিয়ে পড়ে আর আপনি ছাপা হয়ে যায়। কোন্‌টা দেখবে উমা যেন ভেবেই পায় না।

ওদের মনিবটিও দেখবার মত বৈকি। বেঁটে খাটো কালো-পানা মানুষটি, দোহারা বলিষ্ঠ গড়ন। ছোট ছোট দুটি চোখে কেমন এক প্রকারের ধূর্ত দৃষ্টি। ধুতির ওপর মেরজাই পরে ঘুরে বেড়ায়, একটা জামা আছে, সেটা পেরেকে টাঙানোই থাকে। প্রেসের চাবি থাকে তার ট্যাঁকে গোঁজা—ফলে খাটো কাপড়খানা হাঁটুর ওপরে উঠে পড়ে। লোকটি এক দণ্ড স্থির হয়ে থাকে না। যখন খদ্দের আসে তখন চেয়ারে এসে বসে, পাশে টুলের ওপর ক্যাশ-বাক্সটিতে একটা হাত দিয়ে—নইলে হয় কর্মচারীদের খিঁচোয়, নয়ত রবার স্ট্যাম্প তৈরী করতে বসে। কর্মচারী অবশ্য খুবই কম, দুটি কম্পোজিটার আর একটি মেসিন চালাবার লোক, সে-ই

অবসর সময়ে ফাই-ফরমাশ খাটে। মনিব নিজেই রবার স্ট্যাম্প তৈরি করেন—খদ্দেরের কাছে খালি বলেন, (কেউ কিছু পালটে দিতে বললে) 'এখন ত আবার আমার কর্মচারী নেই কিনা, ওটা থাক—কাল সে এসে সেরে রাখবে'খন।' অর্থাৎ জানতে দেন না কাউকে যে কাজটা তিনি নিজেই ক'রে থাকেন।

লোকটির ভাবভঙ্গী দেখলে উমা কিছুতেই হাসি চাপতে পারে না। বয়স কত সে সম্বন্ধে ওর কোন ধারণা নেই—ত্রিশও হতে পারে, চল্লিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু শুধুই হাসি পায় না, কেমন যেন ভয়-ভয়ও করে। কী একটা আছে লোকটার মধ্যে—আতঙ্ককর কিছু, যাতে তার দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে গায়ের মধ্যে একটা ভয় শিরশির্ ক'রে ওঠে—অথচ যত মনে করে সে ওদিকে চাইবে না, চোখ ফিরিয়ে নেয়, ততই দৃষ্টি যেন ঘুরেফিরে ওর উপর নিবদ্ধ হয়। চোখ ফেরাতে পারে না।

গোপনচারিণীর এই চুরি ক'রে দেখাটুকু বলা বাহুল্য প্রেসের মালিক ফটিকেরও চোখ এড়ায় নি। সে নিজে জানতে দেয় নি যে সে জানে—বাইরে এমনি নিস্পৃহ উদাসীন ভাব বজায় রেখেছিল—কিন্তু তার চোরা চাহনি সদাজাগ্রত দৃষ্টি মেলে থাকত এই রূপসী ও কিশোরী মেয়েটির দিকে। তার কাছে কিছুই চাপা ছিল না।

একদিন অপরাহ্নে অবসর-মত উমা এসে বসেছে তার খাঁজটিতে, হঠাৎ ফটিক মুখ তুলে তাকালে। সেদিন কী কারণে সকাল ক'রে কর্মচারীদের ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ফটিক একাই বসে বোধ হয় হিসেব-নিকেশ দেখছিল। পেছন ফিরে বসে থাকা সত্ত্বেও উমার নিঃশব্দ প্রবেশ কেমন ক'রে টের পেয়ে আকস্মিক ভাবে মুখ তুলে তাকিয়ে বলে উঠল, 'খুকী শোন—মা আছেন ওপরে ?'

উমা একেবারে অবাক্। এক্ষেত্রে কি করা উচিত—ছুটে পালানোই উচিত কি না—কিছুই ভেবে পেলে না সে। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলা নিশ্চয়ই ঠিক নয়—এ কথা সে জানে ভাল ক'রেই—কিন্তু ওর চুরি ক'রে দেখাটা ধরা পড়ে গেছে, এবং সামনাসামনি লোকটি যখন প্রশ্ন ক'রে বসেছে তখন উত্তর না দেওয়াটাও বোধ হয় অভদ্রতা হবে। এখন কি করলে সব দিক বজায় থাকে——প্রাণপণে ভাবে সে।

ঠিক কি করবে এখন—কিছুই ভেবে না পেয়ে উমা তাকিয়েই আছে ওর দিকে বিমূঢ় নির্বাক ভাবে, এমন সময়ে ফটিকই আবার কথা কইলে। সে এক নজরেই উমার লজ্জারক্ত মুখ ও বিব্রত দৃষ্টি দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল, 'মা ঠাকুরুণকে বলো ত, আমি একবার প্রণাম করতে যাব।'

এবার উমা অব্যাহতি পেল। সে ছুটে ওপরে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'মা ঐ ছাপাখানার লোকটা আপনার সঙ্গে কথা কইতে চায়। বলে প্রণাম করতে যাবো—'

রাসমণি মেয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'ও তোকে পেলে কোথায় যে তোকে ডেকে বললে?'

আবারও উমার সুগৌর মুখখানা রক্তরাঙা হয়ে উঠল। সে ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল অপরাধীর মত।

'সিঁড়ি দিয়ে ওদের ঘরের দিকে উঁকি মারছিলি বুঝি? আর কখনও অমন ক'রো না। বুঝলে? ওতে নিন্দে হয়। ভেতরে যাও এখন।'

তারপর তিনি নিজেই বাইরে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন 'কী বলছিলে বাবা, ওপরে এসো।'

সেই দিন মাসকাবার, সংক্রান্তি। তবু ফটিক ট্যাক্ থেকে ভাড়ার কুড়িটা টাকা বার ক'রে ওঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ও জিভে ঠেকালে।

রাসমণি যেন একটু অপ্রতিভ হলেন, 'এত তাড়া কি ছিল বাবা, এখনও তো মাস শেষই হয় নি বলতে গেলে!'

'তা হোক্ মা। যা দিতে হবে তা দিয়ে ফেলতে না পারলে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই আপনাকে ডাকি নি মা—একটা কথা বলব, ক'দিন থেকেই মনে করেছি, আজ সাহস ক'রে তাই—'

থেমে গেল সে মাঝপথেই, রাসমণি উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকেন, আশা করেন বাকী কথাটার।

'মা, আমি আপনার সন্তানের মত', বিনয়পূর্বক শুরু করে ফটিক, 'যদি অপরাধ না নেন ত বলি।'

'বল না বাবা। অপরাধ কিসের।'

'মা, আপনার এই মেয়েটির কথা সব শুনেছি। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথ ত বন্ধ, আপনিই বা কদিন থাকবেন। তারপর কি হবে ওর?'

ধৃষ্টতা সন্দেহ নেই। তবু লোকটার বলার ভঙ্গীতে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে রাসমণির দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠলেও কণ্ঠস্বর কঠিন হয় না, কতকটা কোমল কণ্ঠেই বলেন, 'সে ওর অদৃষ্টে যা আছে হবে বাবা। তবে এ সব কথা বাইরের লোকের সঙ্গে আলোচনা না করাই ভাল।'

'ঐ জন্যেই ত অভয় চেয়ে নিয়েছি মা আগে থাকতে। একটা প্রস্তাব আছে

বলেই কথাটা পেড়েছি। ওকে হাতের কাজ শেখাবেন কিছু? যাতে ও রোজগার ক'রে খেতে পারে?'

'কি কাজ?' সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন যেন রাসমণি।

'ধরুন—রবার স্ট্যাম্প করার কাজ। নতুন কাজটা উঠেছে, এখনও বেশী লোক জানে না তৈরী করতে। অর্ডার আসে খুব।...ও যদি ঘরে বসে তৈরী ক'রে দিতে পারে আমি দাম আর কাজ বুঝে নিতে পারি। ওতে বেশ আয় হবে।'

'সে এখন ওকে কে শেখাবে বাবা বলো!'

'যদি অনুমতি করেন ত আমি শেখাতে পারি—'

'সে কি হয় বাবা!' দৃঢ়কণ্ঠে বাধা দিয়ে ওঠেন রাসমণি, 'বাজে কথা ব'লে লাভ কি!'

'কেন হয় না মা। আপনি বসে থাকবেন, আপনার সামনে বসে আমি শিখিয়ে দেব। তারপর মাল-মশলা সব ওর ঘরেই থাকবে—আমি শুধু কাজটা আপনার হাতে এনে দেবো, আপনার কাছ থেকে বুঝে নেবো ...ও ভেতরে বসে কাজ করবে। বেশ আয় হবে আপনি দেখবেন।'

'সে ত আজ তুমি আছ বাবা—পরে কে ওকে কাজ দেবে, কেই বা বুঝে নেবে? এ হ'ল কারবারের কথা! মেয়েছেলে কি কারবার করতে পারে? তুমি আজ আছ কাল নেই।'

স্পষ্ট কথাই বলেন রাসমণি। ওর এই অপ্রাসঙ্গিক কথায় একটু বিরক্তও হন।

ফটিক কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলে, 'আমি না-ই বা রইলুম মা, সন্ধানসুলুক দিয়ে যাবো—এরপর ত চাকর দিয়েও করাতে পারবেন। তাতেও কিছু থাকবে! তাছাড়া কাজটা শিখে রাখতে দোষ কি?

তবু সংশয় কাটে কৈ? রাসমণি বলেন, 'এসব কাজ মেয়েছেলে শিখছে শুনলে লোকে কি বলবে?'

'লোকে শুনবে কেন মা? আপনি আর আপনার এই ছেলে—এ ছাড়া কারুর শোনবার দরকার কি?'

'আচ্ছা ভেবে দেখি।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হয় রাসমণিকে, কতকটা ওকে এড়াবার জন্যই।

কিন্তু উমা আড়াল থেকে সবই শুনেছিল। সে জেদ করতে লাগল, 'শিখতে দিন না মা, আপত্তি কি? আপনার সামনেই ত শিখব—লোকে কে জানতেই বা পারছে! এরপর যা হয় হোক্—এখনও ত দু'পয়সা আয় হতে পারে।' ইত্যাদি।

ক'দিন ধরে অনবরত একই কথা শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে রাসমণি বলেন, 'না। ভেবে দেখলুম ওসব ঝামেলায় কাজ নেই।'

দুই

উমার পিপাসার্তা অন্তরবাসিনী ফটিকের এই প্রস্তাবটিকে যেন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিল, এখন মার নিষেধাজ্ঞায় সে অবলম্বন একেবারে ভেঙে পড়ল। এটা ওর কাছে রীতিমত অবিচার ব'লেই বোধ হ'ল। কি করবে ও? এখন ত মা আছেন —তারপর? ভিক্ষা ক'রে খেতে হবে, নয়ত দিদির বাড়ি বিনা মাইনের দাসীবৃত্তি করতে হবে। কেন? কেন? কেন ও স্বাধীন একটা বৃত্তি অবলম্বন করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে?

প্রবল একটা ক্ষোভ আর বিদ্রোহ ওর মনের মধ্যে দুর্বার হয়ে ওঠে। কিন্তু রাসমণির মুখের চেহারা দেখে সে বিদ্রোহ প্রকাশ সম্ভব হয় না। মাকে ভয় করাটা ওদের অভ্যাস হ'তে হ'তে স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে—এখন আর তাকে বদলাতে পারে না।

দিন দুই ও ভাল করে খেলে না, মার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কথা বললে না। তাতে অবশ্য রাসমণির বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি নিশ্চিন্ত মনেই নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগলেন। তিনি যে ওর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেন নি তা নয়, প্রশ্রয় দিতে চান নি। তিনি জানতেন এ নিয়ে কচকচি করলে ব্যাপারটা তেতো হয়ে উঠবে। তিনি উমার অজ্ঞাতসারেই একটু কড়া নজর রাখলেন শুধু।

উমাও ভয়ে ভয়ে কিছুদিন সিঁড়ির ধার দিয়েই গেল না। কিন্তু কর্ম ও মানুষের সঙ্গের অভাব ওর কৌতূহলকে ক্রমশঃ অসহ ক'রে তুলতে লাগল। ফটিক আজকাল রাত অবধি একা অফিস ঘরে থাকে। কি কাজ করে তা ওপর থেকে বোঝা যায় না—শুধু দেখা যায় ঘরে ডবল ফিতের টেবিল ল্যাম্পটার জোর আলো জ্বলে এবং মধ্যে মধ্যে খুট্ খুট্ ক'রে কি আওয়াজ হয়। সেটা রাসমণিও লক্ষ্য করেন। একদিন সাদিক মিয়াকে ডেকে বললেন, 'বাবা, আপনি বলেছিলেন যে সন্ধ্যের আগেই ওরা চলে যাবে, এখন ত দেখি রাত নটা-দশটা পর্যন্ত কি করে ঘরের মধ্যে।'

সাদিক বিস্মিত হলেন। বললেন, 'তাই নাকি?…আচ্ছা দেখছি আমি।'

খবর নিয়ে এসে বললেন, 'সবাই চলে যায় শুধু ফটিকবাবু থাকেন। ওঁর ঐ রবার স্ট্যাম্পের কাজ খুব বেড়েছে তাই রাত অবধি নিজে বসে কাজ করেন। তাছাড়া প্রেসের অবস্থা খুব ভাল যাচ্ছে না ত—তাই নিজেই কিছু কিছু কম্পোজ ক'রে রাখেন, আর একটা লোক বাড়াতে চান না।'

'পেসের অবস্থা ভাল নয়? কিন্তু কাজ ত আসছে! যে লোক ছিল তাদের ও আর তাড়ায় নি, আবার নিজেও এত করছে—অবস্থা ত ভাল হবার কথা।'

তিনি চুপ ক'রে গেলেন। ভাড়াটে বসিয়ে আর এত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বাদানুবাদ করা যায় না। সাদিক মিয়ারই বা এমন কি গরজ—তিনি ভাড়াটে সন্ধান দিয়ে ত আর অপকার করেন নি—মিছিমিছি তাঁকে উত্ত্যক্ত করা ঠিক নয়।

কিন্তু ক্রমশঃ ফটিকের অবস্থানকাল দীর্ঘতর হয়। দশটাও বেজে যায় এক এক দিন।

রাসমণির সন্ধ্যাবেলাই জপ-আহ্নিক সেরে শুয়ে পড়া অভ্যাস। রাত নটার পর উঠে মেয়েকে খেতে দেন, নিজেও কোন কোন দিন একটু কিছু মুখে দেন, তারপর পাকাপাকি ভাবে বিছানা পেতে শুতে যান। এই সময় আর ঘুম হয় না তাঁর—তা উমা জানে, সারারাত ছট্‌ফট্‌ করেন আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, কখনও বিছানায় উঠে বসে জপ করতে থাকেন। কিন্তু—বোধ হয় সেই জন্যই—সন্ধ্যার ঘুমটা গাঢ় হয়। উমার পক্ষে এমন সুযোগ-সুবিধার লোভ সম্বরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। আজকাল সন্ধ্যার সময় ঝিও থাকে না। কাজ কম হয়ে গেছে বলে রাসমণি নূতন বন্দোবস্ত করেছেন, এখানে শুধু পেটভাতে থাকে সে, সকাল সন্ধ্যায় অন্য বাড়ি ঠিকে-কাজ করে। এখানকার কাজ সেরে চলে যায় পাঁচটায়, ফেরে কোনদিন রাত নটায়, কোনদিন সাড়ে নটায়। মার পুরোনো বইগুলো এক-একখানা পঞ্চাশ-ষাটবার ক'রে পড়া হয়ে গেছে। সেগুলোও আর ভাল লাগে না। নিজে মধ্যে মধ্যে কবিতা লেখার চেষ্টা করে—বাকী সময়টা শুধু ঘুরে বেড়ায়, খালি বাড়িতে একা একা।

সুতরাং—

প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে একদিন উমাকে সিঁড়ির খুপরিতে আবার এসে বসতে হ'ল।

জানলার সেই বিশেষ খাঁজ দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে যা দেখে তাতেও রীতিমত বিস্মিতই হয়। ফটিক তার টুলটির ওপর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ক্যাশবাক্সে হাত দিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে। এত রাত অবধি কাজ করা ছাড়া থাকার কোন কারণ নেই—কিন্তু কাজ ত কিছুই করছে না, চুপ ক'রে বসে আছে—যেন কার জন্য অপেক্ষা করছে। ওধারে দোরও বন্ধ, ঘরেও দ্বিতীয় প্রাণী নেই, তবে এ কিসের প্রতীক্ষা?

অনেকক্ষণ, বোধ হয় কুড়ি পঁচিশ মিনিট এই ভাবে কাটল। অবশেষে কৌতূহল

অপূর্ণ রেখেই উমা উঠবে মনে করছে এমন সময় সাপের মত হিসহিসিয়ে কে বলে উঠল, 'খুকী শোন!'

শিউরে চমকে উঠল উমা।

কে, কে বললে এ কথা? ফটিক ত তেমনি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে, একবারও ফেরে নি। তবে ও জানবে কি ক'রে উমার অস্তিত্ব? কিন্তু ওরই গলা যেন—

এ কি ভৌতিক ব্যাপার নাকি!

নিমেষে ঘেমে উঠল সে। জিভটা শুকনো ঠোঁটের ওপর একবার বুলিয়ে নিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলে কিন্তু পা যেন অসাড়, নাড়বারও শক্তি নেই; কি একটা আতঙ্কে ওর সব স্নায়ু যেন অবশ হয়ে গেছে—

এবার ফটিক মুখ ফেরাল, টুল থেকে উঠেও দাঁড়াল।

'ভয় কি, শোন না।'

উমার এতক্ষণে যেন হাত-পায়ে সাড় ফিরে এল। সে প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে দ্রুত ছুটে পালাল দোতলায়। একেবারে সর্বশেষ ধাপে পা দিয়ে প্রথম থামল সে দম ফেলবার জন্য, নিজেকে একটু নিরাপদ মনে ক'রে। কিন্তু দেখা গেল যে ফটিকের পূর্ণ পরিচয় সে পায় নি—সেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সরীসৃপের মত নিঃশব্দ দ্রুত গতিতে সে একেবারে উমার সামনে পৌঁছে গেল এবং সেই রকম হিসহিস ক'রে বললে, 'ভয় কি? আমি তোমার জন্যেই বসেছিলুম। শিখবে তুমি রবার স্ট্যাম্পের কাজ?'

'মা বারণ করেছেন যে!' থতিয়ে থতিয়ে অনেক কষ্টে উত্তর দেয় উমা। ওর গলা শুকিয়ে কাঠ, সর্বাঙ্গ কাঁপছে ভয়ে।

'ওঁরা সেকেলে লোক, সব তাতেই খারাপ দেখেন। তুমি ত আর সত্যিই কিছু অন্যায় করতে যাচ্ছ না, ভয় কিসের! উনি ত এই সময়টা রোজ ঘুমোন—এই সময় তুমি একটু ক'রে শিখে রাখলে পারো। এটা একটা বিদ্যে—বিদ্যে শিখে রাখতে দোষ কি?'

তবু উমা ইতস্তত করে।

'তোমার অবস্থা দেখে মনে দুঃখ হয়েছে তাই। নইলে আমার আর এত মাথা-ব্যথা কি? রোজ এই এত রাত অবধি বসে অপেক্ষা করি—জানি দু-চার দিন গেলেই আবার তুমি সিঁড়িতে এসে বসবে—'

'তু···আপনি টের পান কি ক'রে?'

কৌতূহলটাই বড় হয়ে ওঠে।

ফটিক হাসে একটু। অন্ধকারেও ওর দাঁতগুলো দেখা যায়। শক্ত, মজবুত দাঁত। 'এসো, এসো—আচ্ছা, ব্যাপারটা একটু দেখেই যাও না। ক-মিনিট বা— মা টের পাবেন না।'

নিজের অনিচ্ছাতেই নেমে আসে। কোন অন্যায় সে করে নি এটা ঠিক, অন্যায় বা পাপের ধারণাও ওর ছিল না, তবু পা-দুটো যেন কাঁপে থরথর ক'রে, সর্বাঙ্গ ঘেমে ওঠে।

ফটিক কিন্তু খুব সহজ। সে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা কয়। ওকে দেখায় রবার স্ট্যাম্প তৈরী করার কৌশল ও কলকব্জা। একটা লাইন তৈরী ক'রেও দেখায়।

ক্রমে ক্রমে উমার আতঙ্কও কমে। যদিচ কান পাতা থাকে ওপরের দিকে।

খানিকটা পরে ফটিকই বলে, 'এইবার ওপরে যাও খুকী—মা উঠে পড়বেন হয়ত, তোমাদের ঝি আসারও সময় হ'ল।' উমাও যেন পালিয়ে বাঁচে। তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ওপরে উঠে আসে।

পরের দিন উমা আর সিঁড়ির ধারে গেল না। যদিও ওপরের বারান্দা থেকে ফটিকের ঘরের আলো লক্ষ্য ক'রে সে বোঝে যে ফটিক সেদিনও ওর জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আর নয়—মনকে শাসন করে সে, মা যখন নিষেধ করেছেন তখন দরকার নেই ওসব ঝামেলায় গিয়ে।

কিন্তু তার পরের দিন আবার কে যেন ওকে আকর্ষণ করে—মা ঘুমোবার পরেই এসে বসে সিঁড়িতে, ফটিকও যেন প্রস্তুত—ডেকে ঘরে নিয়ে যায়। বলে, 'আজ একটা অর্ডার আছে। ছাখো যদি তৈরী করতে পারো ত এর লাভটা তোমাকেই দেবো।' আগের দিন কেন আসে নি উমা, সে প্রশ্ন ত দূরের কথা—তার ইঙ্গিত মাত্রও করে না।

ব্যাপারটা কঠিন নয়, অল্প আয়াসেই উমা আয়ত্ত ক'রে নেয়। অর্ডারী স্ট্যাম্পটাও তৈরী ক'রে ফেলে সে এক সময়, কাগজের ওপর ছাপ উঠিয়ে সগর্বে তাকিয়ে থাকে নিজের কীর্তির দিকে।

ফটিক বাহবা দেয়, 'তোমার খুব মাথা কিন্তু। আমিও এত তাড়াতাড়ি শিখতে পারি নি।'

পরের দিন তিন আনা পয়সা ওর হাতে গুঁজে দেয় ফটিক—একরকম জোর ক'রেই, 'বা রে! তোমার জিনিস বেচে এই লাভ হয়েছে, এটা না নিলে চলবে কেন?'

লজ্জায় সঙ্কোচে যেন মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে উমা বললে, 'আমি—আমি এ

পয়সা নিয়ে কি করব। মা বকবেন—'

'জমিয়ে রাখো। মাকে এখন বলবার দরকার কি? এরপর খানিকটা জমিয়ে গাতে দিও—একেবারে চমকে উঠবেন।'

সেদিনও একটা স্ট্যাম্প নিজে হাতে তৈরী করে উমা! টেবিল ল্যাম্পের আলোতে ঝুঁকে পড়ে সে তৈরী করে, ফটিক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে উপদেশ নির্দেশ দেয়। ওর নিঃশ্বাস উমার গালে এসে লাগে, উমার ললাটের স্বেদ-বিন্দুগুলি আলোতে চিকচিক করে, ফটিক তাকিয়ে দেখে।

সেদিন সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখে উমা 'তবে আসি' বলে উঠে দাঁড়িয়েছে ফটিক ওর একটা হাত চেপে ধরল হঠাৎ। উমা ভয় পেয়ে চমকে উঠল—কেমন একটা ভীত ত্রস্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিন্তু ফটিকের চোখের দিকে চোখ পড়ে যেন আর জোর করতে পারলে না। বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

সাপের মত স্থির দৃষ্টি ফটিকের, জাদুকরের মত অমোঘ আকর্ষণ।

উমার হাতে টান দিয়ে আরও কাছে আনে ফটিক, 'শোন! আর একটু থেকে যাও—' হিসহিস ক'রে ওঠে যেন কোন ক্লেদাক্ত সরীসৃপ।

তিন

অকস্মাৎ ওপর থেকে রাসমণির তীক্ষ্ণ আহ্বান কানে এসে বাজল, 'উমি!'

সাপের ফণা নেমে গেল নিমেষে, উমাও যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। প্রাণপণে বিহ্বলতা কাটিয়ে ছড়িয়ে-পড়া চেতনাকে কুড়িয়ে নিয়ে সে দৌড়ে ওপরে চলে গেল!

রাসমণি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'কী করছিলি নিচে?'

সর্বাঙ্গ কাঁপছে উমার, গলা দিয়েও স্বর বার হ'তে চায় না। সে শুধু নিরুপায়ের মত দীন ভঙ্গীতে চেয়ে রইল মার দিকে।

'তুই ঐ ওদের ছাপাখানায় গিয়েছিলি? একা, এত রাত্রে?' চাপা গলায় গর্জন ক'রে ওঠেন রাসমণি।

'ও—ও ডাকলে যে। কাজ শিখিয়ে দেবে ব'লে—' থতিয়ে থতিয়ে ঢোঁক গিলে গিলে বলে উমা।

'আর তুমি তাই যাবে! কচি খুকী! আমি না বলে দিয়েছি ওসব চলবে না! এত বড় সোমত্থ মেয়ে এই গভীর রাতে একটা ষণ্ডামার্ক পুরুষের সঙ্গে নির্জন ঘরে কথা কইছে—পাড়ার কেউ যদি জানতে পারে? আমি কাল সকালে মানুষের সামনে মুখ দেখাব কি ক'রে?'

তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, 'যার বরাত মন্দ হয় তার বুদ্ধিও কি তেমনি বিপরীত! তুমি এত খুকী নও যে কিসে কি হয় তা জানো না—। আমার চেয়ে ঐ একটা মুখ্খু ছাপাখানা-ওলা—ঐ হ'ল তোমার বেশী আপন, না? তাই আমি বারণ করবার পরও ওর কাছে যেতে হ'ল তোমায়! বিয়ের পর স্বামী নিলে না—লজ্জায় তার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে থাকবার কথা। তুই তাই লোকের কাছে মুখ দেখাস, অন্য মেয়ে হলে গলায় দড়ি দিত! নির্লজ্জ বেহায়া কমনেকার?'

রাগ যেন কমে না রাসমণির। উন্মাদের মত বলে যান, শুধু এই জ্ঞানটা আছে যে গলার স্বর বাড়ানো চলবে না, পাড়ার কারও কানে না যায়। কিন্তু সেই চাপা গলায় তর্জনের মধ্যে যে ভাষা বেরোতে থাকে তা যেন তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মত কেটে কেটে বসতে থাকে ওর গায়ে। কাটার ওপরও নুন ছিটিয়ে দেয় সেই সব কথা।

উমারও কিছু বলবার ছিল বৈকি। এই রকম ঘরে যে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে দোষ তার নয়—নিজে সে ইচ্ছে ক'রে বা জেনে এ বিয়ে করে নি কিংবা তার কোন দোষে সে বিতাড়িত হয় নি, তবে তাকে সে কথা নিয়ে গঞ্জনা দেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? কিন্তু মার সেই রুদ্র মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কোন কথাই বলতে পারে না, মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে ঘামে শুধু।

আরও খানিকক্ষণ ধরে ওকে তিরস্কার করার পর রাসমণি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন তর্‌তর্ ক'রে—উমার সেই বসে থাকবার খাঁজটিতে এসে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন 'ফটিক?'

ফটিক বহু পূর্বেই চলে যেতে পারত, কিন্তু ওপরের ব্যাপারটা কতদূর কি হয় তা জানবার কৌতূহল দমন করতে পারে নি ব'লে জানলার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল—শুধু তাই নয়, ঘরের আলোটাও নেভানো হয় নি, সুতরাং উপস্থিতিটা অস্বীকার করতে পারলে না, ওপাশের দরজা দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে এসে নিরীহ ভাল মানুষের মতই দাঁড়াল, 'মা, ডাকছেন!'

মুখে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভঙ্গী। অর্থাৎ তাকে তিরস্কার করতে গেলে সেও সহজে ছাড়বে না, সর্বপ্রকার যুদ্ধের জন্যই সে প্রস্তুত।

কিন্তু রাসমণি সে ধার দিয়েও গেলেন না। শুধু বললেন, 'আমি আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলুম, এর ভিতর তুমি ছাপাখানা উঠিয়ে নিয়ে যাবে। ভাড়াটে রাখার আর সুবিধে হবে না আমার।'

ফটিক হয়ত এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মিনিট খানেক সময় লাগল তার উত্তর দিতে, এবং যখন কথা কইলে তখন তার গলাতেও সে দৃঢ়তা যেন আর ফুটল না। বললে, 'আজ্ঞে, ভাড়াটে তোলার ত একটা আইন আছে—উভয় পক্ষেই

নরো দিনের নোটিশ দিতে হয়।'

রাসমণি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আইন আদালত আমি বুঝিও না, রবও না। আটচল্লিশ ঘণ্টা দেখব, তারপর আমি নিজে হাতে তোমার ছাপাখানার জিনিসপত্র তুলে রাস্তায় ফেলে দেব। ক্ষমতা থাকে তুমি আটকিও। আর থানা-পুলিস করতে হয়, আইন আদালত করতে হয় তুমি ক'রো বাবা!'

এই বলে বাদানুবাদের বিন্দুমাত্র অবসর না দিয়ে তিনি ওপরে উঠে গেলেন।

উমা সে রাত্রে কিছু খেলে না, ঘুমোতেও পারলে না। তার নিজের যে কোথায় কি অপরাধ ঘটল তা সে অনেক চেষ্টা ক'রেও বুঝতে পারলে না। ফটিকের কাছে কাজ শিখতে নিষেধ করাটাও যেমন সে অবিচার ভেবেছিল, আজকের এ ভর্ৎসনাও তার তেমনি অবিচার বলে বোধ হ'লো। অবশ্য হ্যাঁ—মনের অবচেতনে ফটিকের এই কিছু-পূর্বের আচরণটা মিলিয়ে কোথায় যেন সে মার নিষেধাজ্ঞার এবং আশঙ্কার একটা যাথার্থ্যও স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। তবু আঘাতের ব্যথাও ত কম নয়। কথা যে তীক্ষ্ণ তীরের মত বাজতে পারে, তা আজ প্রথম বুঝল উমা। শাশুড়ীর তিরস্কারের কারণগুলো সবই মিথ্যে বলে দুঃখিত হ'লেও সে আহত হয় নি বোধ হয় এতখানি। আজ অনুভব করল বাক্যবাণ শব্দটির অর্থ।

মর্মান্তিক দুঃখের প্রথম তীব্রতায় বিহ্বলা উমা বার বার সঙ্কল্প করলে যে সে মায়ের কথাই শুনবে—গলায় দড়ি দেবে। মা তাতে কত সুখী হন দেখে নেবে সে। অকারণে তাকে এতটা আঘাত করার শোধ তুলবে সে মার ওপর। কেন, কিসের জন্যে এত ক'রে বলবেন তিনি! তিনি কি এটা কখনও ভেবে দেখেন যে উমার মত মেয়ের এই একক নিঃসঙ্গ জীবন কি ক'রে কাটবে? সে যদি প্রলুব্ধ হয়েই থাকে ফটিকের ঐ অর্থ উপার্জনের প্রস্তাবে—ত এমন কিছু অন্যায় করে নি। অবশ্য ফটিক লোক ভাল নয় এটা উমাও বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তবু—তার দিকটাও কি ভেবে দেখা উচিত ছিল না ওঁর। উমা ত নিজেই অনুতপ্ত।

তাই বলে—

রাসমণির একটা কথা ওকে সব চেয়ে আঘাত করেছে, 'এখন বুঝতে পারছি তোকে শ্বশুরবাড়িতেই পাঠানো উচিত ছিল। ঐ দজ্জাল শাশুড়ীর হাতে মার খেয়ে গতর চূর্ণ হওয়াই দরকার ছিল তোর। তবে ঢিট্ থাকতিস। লাথির ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে!'...

সে কি এমনই মন্দ, এমনই অসৎ যে তার জন্য ঐ শাস্তি ঈশ্বর-নির্দিষ্ট! ঐ তার যথার্থ স্থান!...তার চেয়ে তার মরাই ভাল!

জ্বালা থেমে এক সময় চোখে বর্ষা নামে। ভাগ্যের এই উপায়হীন প্রতিকারহীন অবিচারের বিরুদ্ধে মনটা মাথা কুটে কুটে এক সময় যেন শ্রান্তিতেই ভেঙে পড়ে। মনের সব বেদনা অশ্রুর আকারে ধারায় ধারায় ঝ'রে প'ড়ে উপাধান সিক্ত করে। তবু উমার মরা হয় না। জীবনকে সে ত্যাগ করতে পারে না।

তার হেমের কথা মনে পড়ে যায়। শ্যামা যদি খোকাটাকেও রেখে যেত!

কি নিয়ে সে বাঁচবে? কি নিয়ে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক

বড় বাড়িটার একেবারে এক প্রান্তে ঠাকুরঘর, কতকটা বাইরেই—অর্থাৎ মূল বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন। তারই পিছনে একটি মাত্র কুঠুরী, সেইখানেই নরেন শ্যামাকে নিয়ে গিয়ে তুললে, 'দিব্যি ঘর, না? আগাগোড়া পাকা।'

ঘর পাকা বটে কিন্তু এ কী ঘর?

দক্ষিণে মন্দির বা ঠাকুরঘর—সুতরাং দক্ষিণটা চাপা। পূবেও কোন জানলা নেই—আছে পশ্চিমে একটি জানলা আর উত্তরে দরজা ও আর একটা জানলা। মোটা মোটা নিরেট ইঁটের গাঁথুনি, ভেতরটা দীর্ঘদিনের অবহেলায় আগাগোড়া নোনা-ধরা—অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে আর তেমনি গরম। কিছুকাল দাঁড়াবার পরই মনে হ'ল দম আটকে আসছে। শ্যামা কোনমতে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করলে। আর্তনাদের মত তার গলা দিয়ে স্বর বেরোলো, 'এখানে আমার ছেলেমেয়ে থাকবে কি ক'রে গো?'

'তা থাকবে কেন? নবাব-নন্দিনীর পুত্তুর-কন্যের জন্যে রাজপ্রাসাদ অট্টালিকে চাই। অতশত লম্বা লম্বা কথা যেন না শুনি আর—এই সাফ্ বলে দিলুম।'

হেমও ঘরের মধ্যে এসে কেমন একরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, নরেনের দৃষ্টি পড়ল তার ওপর, গালে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বললে, 'দেখছিস কি হারামজাদা! এইখানে এনেছি, এইখানেই থাকতে হবে। বাপের যেমন অবস্থা তেমনি থাকবি। অত নওয়াবি চলবে না।'

দু বছরের ছেলে এসব কথার একটিও বুঝলে না, ডুকরে কেঁদে উঠল শুধু যন্ত্রণায়। ওর গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গিয়েছিল। শ্যামা তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে কোলের মধ্যে টেনে নিলে।

'নাও—ঢের হয়েছে। পোঁটলাপুঁটলি খোল দেখি। দ্যাখো ঐ ওদিকে কোথায় রান্নাঘর—উনুন-ফুনুন আছে কি না দ্যাখো, না হয় কাঠ-কুটো দিয়ে চাটটি চালে-

ডালে চাপিয়ে দাও। সন্ধ্যের আর বেশি দেরি নেই—কোথায় আলো কি বিত্তেন্ত, আমি এখানে সে সব খুঁজে বেড়াতে পারব না।'

অর্থাৎ এই বিজন বনে রাত্রিবেলা অন্ধকারে থাকতে হবে।

প্রকাণ্ড বাগান এই মন্দিরের চারদিকে। ওদিকে কোথায় একটা পুকুর আছে—কিন্তু এখানটায় বড় বড় গাছপালার ঠাস্-বুনুনি। কাঁঠাল আম জামরুল চালতা সজনেয় সূর্যকে এই অপরাহ্নেই আড়াল ক'রে এনেছে,—সন্ধ্যাবেলা কি হবে?

শ্যামার মনে হ'ল ছুটে পালিয়ে যায় কোথাও ছেলেমেয়েদের হাত ধরে, এই রাক্ষসের হাত থেকে অন্য যে কোনও জায়গায় হোক্। কিন্তু কোথায় যাবে? অদৃষ্টের হাত থেকে ত পালাতে পারবে না!

সে কাঠ হয়েই দাঁড়িয়ে আছে দেখে নরেন বোধ করি আরও একটা প্রচণ্ড ধমক দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ওধারের বাগানের মধ্যে দিয়ে একটি মোটা গোছের মহিলা এসে পড়ায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর বাধা পেয়ে থেমে গেল।

'আমাদের নতুন বামুন মা কেমন এল দেখি একবার! ও মা, এ যে একেবারে ছেলেমানুষ, আমার পিঁটকীর চেয়েও ছোট। তবে বাছা আর পেন্নাম করব না—অকল্যেণ হবে। এই এইখানে থেকেই হাত তুলে অমনি—'

তিনি বেশ হেঁট হয়েই নমস্কার করলেন।

শ্যামা যেন আঁধারে কূল পেলে। সে বরাবরই একটু মুখচোরা কিন্তু হঠাৎ একেবারে এমন অকূলে পড়ে তারও মুখ খুলে গেল। সে-ও কাছে এসে হেঁট হয়ে নমস্কার ক'রে বললে, 'মা, আমিও আপনার এক মেয়ে।'

'বাঃ, বেশ বেশ। বেশ মিষ্টি কথা ত তোমার। হবে না কেন, হাজার হোক্ শহরের মেয়ে—আর এই পাড়াগাঁয়ের সব কথা, ঝ্যাঁটা মারো! আমিও কলকাতার মেয়ে বাছা—যদিও এই ছাব্বিশ বছর হ'তে চলল বে হয়েছে তবু এখনও এখানকার কথাবার্তা অব্যেস হ'ল না। যেন খটাশ ক'রে গায়ে বাজে।'

এইবার তিনি প্রায় শ্যামাকে ঠেলেই ভেতরে এসে দাঁড়ালেন, 'ও মা, এখনও যে পোঁটলাপুঁটলি কিছুই খোলা হয় নি। চলো বাছা, তুমিও একটু হাত দাও, আমি তোমার ঘরকন্না গুছিয়ে দিয়ে যাই—'

শ্যামাকে অবশ্য আর হাত দিতে হ'ল না—সরকার-গিন্নী নিজেই সব গুছিয়ে দিলেন। জিনিসপত্র তাকে-কুলুঙ্গিতে সাজাতে সাজাতে বললেন, 'তোমার মা ত সংসার গুছিয়েই দিয়েছে দেখছি। তা বেশ আক্কেল আছে বাপু—মানতেই হবে। ...তবে একটা কথা বলছি বাছা, কিছু মনে ক'রো না, আর মনে করলেই বা কি—আমার কাঁচা মাথাটা ত কচ্ ক'রে কেটে নিতে পারবে না—তোমার মা-মাগীর

এমন অবস্থা, তোমরা ত শুনেছি বিবিদের মত লেখাপড়াও শিখেছ—এত বুদ্ধি তার.ত জেনেশুনে এমন জানোয়ারের হাতে দিলে কেন ?'

এক কোণে হুঁকো-কলকের পুঁটুলি খুলে নরেন তামাক সাজছিল, তার হাত থেমে গেল, দাঁত কড়মড়ও করলে একবার কিন্তু মনিবপত্নীকে কিছু বলতে সাহসে কুলোল না। শুধু কানটা খাড়া ক'রে রইল শ্যামা কি উত্তর দেয় তা শোনবার জন্য।

শ্যামার পক্ষে সে কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, সে বরং কথাটা চাপা দিয়েই বললে, 'মা, আলোর ত কোন ব্যবস্থাই নেই সঙ্গে—কী হবে ?'

'তার আর কি হয়েছে বাছা, আজকের মত একটা পিদিম তেলসলতে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল বাজার থেকে খানিকটা রেড়ির তেল আনিয়ে নিও।...এখন চলো রান্নাঘরে—উনুন-টুনুন কাটিয়ে রেখেছি, কাঠকুটোও তৈরী। কাপড় কেচে এসে চাট্টি চাপিয়ে দাও। আমাদের এই বাগানের মধ্যেই পুকুর—খাসা জল, ঐ জলই আমরা সকলে খাই।'

ওদের ঘরের কাছেই বেশ একটা বড় চালাঘর, মাটির দেওয়াল মাটিরই মেঝে, তার দাওয়ায় একটা উনুন কাটা, ঘরেও আর একটা উনুন। সত্যিই ভদ্রমহিলা সব তৈরী ক'রে রেখেছেন। ঘরের মধ্যে একটা মাচাও তৈরী আছে, ভাঁড়ারের জিনিসপত্র রাখবার জন্য।

সরকার-গিন্নী নিজে সঙ্গে ক'রে পুকুরে নিয়ে গেলেন। বেশ বড় পুকুর কিন্তু চারপাশে বড় বড় গাছ থাকায় বড় নির্জন আর জলটা বড় কালো দেখায়। বাঁধা ঘাট আছে, তবে ইটের সিঁড়িতে শ্যাওলা জমে বড় বেশী, পিছলও।

'ভয় করছে নামতে ? এই নাও, আমার হাত ধরো। সাঁতার জানো না বুঝি ? ...আমার পি টকী আসুক, তোমাকে একদিনে সাঁতার শিখিয়ে দেবে।'

'তিনি কোথাও গেছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ—ছেলেমেয়েরা আমার কেউ ত নেই। সব মামার বাড়ি গেছে। আমার ভাইপোর বে। মায় আমার দেওরের ছেলেমেয়েরা সুদ্ধু।'

'তা আপনি যান নি ?'

'বেশ বলছ ত বাছা তুমি!' ওর নির্বুদ্ধিতায় যেন একটু বিরক্তই হন তিনি, 'আমার ঘরকন্না দেখবে কে! এই দিন-কাল, আমাদের এতবড় বনেদী সংসার, পাঁচটা জিনিস-পত্তর নিয়ে ঘর করি—যথাসবস্ব যাক্ আর কি! এই তাই কর্তা থাকেন তবু রাত্তিরে ঘুম হয় না, খুট্ ক'রে শব্দ হলেই জেগে উঠি।...দায়িত্ব কি কম ?'

তারপর নিজেই অন্য প্রসঙ্গে আসেন, 'ছেলেমেয়েগুলি তোমার দিব্যি বাপু,

বেশ ফুটফুটে। তা কোন্‌টার কি নাম রেখেছো বাছা ?'

শ্যামা ওঁর উষ্ণ স্বরে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এখন হাঁপ ছেড়ে বললে, 'খোকার নাম হেমচন্দ্র, আর মেয়ের নাম মহাশ্বেতা।'

'ও বাবা, ও যে বড্ড বড় বড় নাম ! ডাকো কি ব'লে ?'

'ওকে হেম বলে ডাকি আর একে ডাকি মহা ব'লে।'

'তবু ওসব পোশাকী নামই হয়ে রইল। আমার আবার ছেলেমেয়েদের একটা আটপৌরে নাম না হলে ডেকে সুখ হয় না। ত্যাখো না, ছেলের নাম রেখেছি গুয়ে, হেগো, বাব্‌লা--মেয়েদের নাম পুঁটি, বুঁচি। উনি আবার তারে বাড়া। আমি নাম রাখলুম পুঁটি, উনি তাকে করলেন পিঁট্‌কী ! আবার আদরের বাহার শুনবে ? রোজ আপিস থেকে এসে জামাকাপড় না ছেড়েই ত বাবুর সব আগে মেয়েকে আদর করা চাই, তা আদরের বুলি কি, না—পিঁট্‌কিরাণী ঘট্‌ঘটানি, মরবে তুমি দেখব আমি ! আমি আগে আগে গালমন্দ করতুম, আমাকে একদিন বুঝিয়ে দিলে যে বাপ-মা মর বললে পরমায়ু বাড়ে, সেই থেকে আর কিছু বলি না—'

পানদোক্তা-খাওয়া কালো এবং বড় বড় দাঁতগুলি মেলে সরকার-গিন্নী নিজেই হা হা ক'রে হেসে উঠলেন।

ততক্ষণে শ্যামার কাপড়চোপড় কাচা হয়ে গেছে। ঘরের দিকে রওনা হয়ে যেতে যেতে গিন্নী প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নামটা ত শোনা হ'ল না বামুন মেয়ে।'

'আমার নাম শ্যামা।'

'ও ত আবার ঐ পোশাকী নামই হ'ল। আটপৌরে কিছু নেই ?'

'সে মা ত রাখেন নি। এ মার যা খুশি রেখে নেবেন।'

'বা, বা ! বেশ ! বেশ কথাবার্তা তোমার বাপু, তা মানতেই হবে। হবে না কেন, নেকাপড়া-জানা মেয়ে যে। আমিও দত্তদের বাড়ির মেয়ে—তবে তখন একেবারেই মেয়েদের লেখাপড়ার চল ছিল না ত। এখন শুনছি ভূদেব মাস্টারের দল খুব উঠেপড়ে লেগেছে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে বলে—। কালে কালে কতই হ'ল।...আমার নাম মঙ্গলা তা বলে রাখি। আমাদের সব সেকেলে নাম, ঐ রকমই রাখা হ'ত তখন।—ত্যাখো না, দত্তদের বাড়ির মেয়ে পড়লুম সরকারদের ঘরে।...এরা হ'ল গে আমাদের চাকর বংশ, তা কী হবে বলো, পয়সারই জয়-জয়কার। এদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা—যেখানে পয়সা সেখানেই ইজ্জত। এর এক ঠাকুদ্দা আমাদের বাপের বাড়ি পাঁচ টাকা মাইনের চাকরি করত। আমাদের দৌলতেই পয়সার মুখ দেখলে। তা কি হবে বলো !'

হত-শ্রী বংশগৌরবের কথা স্মরণ ক'রেই বোধ হয় সরকার-গিন্নী একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললেন।

দুই

রাসমণি যা চালডাল সঙ্গে দিয়েছিলেন তাতে দিনকতক চলল। কিন্তু তবু শ্যামা ওর স্বামীর নিশ্চিন্ত ভাবভঙ্গী দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। আধ সের মাত্র চাল পাওয়া যায় নিত্য-সেবার নৈবেদ্য থেকে—বাঁধা মাপ-করা ব্যবস্থা। তাতে ওদের দুবেলা কোনমতেই চলে না। নরেন বরাবরই ভাত খায় বেশী, ঠিক মেপে দেখে নি যদিও কোনদিন, তবু শ্যামার বিশ্বাস এক-একবারে সে-ই এক পোয়ার ঢের বেশী চাল খায়। এক্ষেত্রে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার পরিণাম যে নিশ্চিত উপবাস।

শ্যামা ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়েই বুকে সাহস আনে, স্বামীকে বলে, 'হ্যাঁগা, এদিকের কী করছ? মা যা দিগেছিলেন তা ত ফুরিয়ে এল—তারপর?'

খিঁচিয়ে ওঠে নরেন, 'আরে রেখে দে তোর মার দেওয়া! সে মাগীর ভিক্ষের ভরসাতে আমি এখানে পরিবার নিয়ে এসেছি?'

'তা ত আনো নি—কিন্তু চলবে কিসে?'

'কেন, এই কদিনে নৈবিদ্যির চাল জমছে না?'

'তা জমলেও, সে আর কদিন! আর তা-ই বা জমছে কৈ? ভিজে আতপ চাল বলে রোজই ত রাত্তিরে সেই চাল রান্না হয়, খেয়ে টের পাও না?'

'কেন, কেন তা রান্না হয় শুনি? শুকিয়ে রেখে দিতে পারো না?'

'সে ত একই কথা হ'ল। ওগুলো শুকিয়ে তুলে রাখলে এগুলো ফুরিয়ে যেত তাড়াতাড়ি। তাছাড়া অব্যেস নেই, দুবেলা আলোচাল খেলে আমাশা ধরত যে!'

'হুঁ।' খানিকটা গুম খেয়ে থেকে বলে নরেন, 'তা নৈবিদ্যির সব চালই শোর পেটে গিলে বসে থাকছ!'

শ্যামার চোখে জল এসে যায় এই দুর্নামে। তবু এই লোকটার সামনে চোখের জল ফেলতে লজ্জা করে বলেই প্রাণপণে চেপে থেকে বলে, 'আমিই খাই, না? যা ভাত রান্না হয় তার চার ভাগের তিন ভাগেরও বেশি ত তুমি খাও। ছেলের আর আমার জন্যে কত কটা পড়ে থাকে! আমি না খেয়েও থাকতে পারি কিন্তু দুধ কমে যাবে তাহ'লে একেবারে, মেয়েটা খাবে কি! দুধ কিনে খাওয়াতে পারবে?'

'হ্যাঁ,—দুধ কিনে খাওয়াবে! হারামজাদী আমার স্বগ্'গে বাতি দেবে কিনা!'

তারপর খানিকটা নিঃশব্দে বসে তামাক টানবার পর গলাটা একটু নামিয়ে বলে, 'এই ব্যাটারা কি কম! আমিও নরেন ভট্‌চাজ, আমার কাছে যে কথা

লুকুবে সে এখনও মায়ের গব্‌ভে। সব আমি টেনে বার ক'রে নিয়েছি—এই যে সম্পত্তিটা দেখছ এর সবটাই দেবোত্তর। ঠাকুরের ঐ আধ সের চাল আর আটখানা বাতাসা ঠেকিয়ে দিয়ে নিজেরা দিব্যি নবাবী মারছেন! সম্পত্তিটার আয় একটুখানি? কেন, পারে না আর আধ সের চাল বাড়িয়ে দিতে? দেবো একদিন হাটে হাঁড়ি ভেঙে—সব ওস্তাদি বেরিয়ে যাবে।'

তার এই নির্বুদ্ধিতা শ্যামার সহ্য হয় না। সে বলে ফেলে, 'তাতে তোমার কি সুবিধে হবে? পারবে মামলা-মকদ্দমা করতে? না, করতে পারলেও তোমার চাকরি থাকবে? তুমি কি খাবে তাই ভাবো।'

'তুই থাম্ মাগী। মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস নে। আমার মাগ ছেলে কি খাবে না খাবে সে আমি বুঝব। খেতে দিই খাবি, না হয় শুকিয়ে থাকবি। যা করব —চুপ ক'রে থাকবি। একটা কথা কইবি নি, তোর কথার ধার ধারি না আমি।'

অগত্যা চুপ ক'রেই থাকতে হয়। যদিচ ওদের ঘর এক প্রান্তে তবু বাবুদের ছেলেমেয়েরা সর্বদা আসছে যাচ্ছে, তাদের সামনে মারধোর—সে বড় অপমান।

তবু রাসমণির দেওয়া চাল যেদিন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল, সেদিন কথাটা আর একবার পাড়তেই হ'ল। সব শুনে মুখটা বিকৃত ক'রে নরেন আর একবার তামাক সাজতে বসল। এটাও আগে আগে শ্যামাকে ফরমাশ করত কিন্তু পছন্দ হয় না বলে আজকাল নিজেই সেজে নেয়। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তামাক খেয়ে উঠে আলনা থেকে গামছা আর উড়ুনিটা কাঁধে ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এখানে আসার পর এই প্রথম নড়ল নরেন। শ্যামা ভাবলে নিশ্চিত উপবাসের সামনে দাঁড়িয়ে বোধ হয় খানিকটা চৈতন্য হয়েছে ওর—সে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল!

কিন্তু প্রভাত ক্রমশঃ দ্বিপ্রহরে, দ্বিপ্রহর অপরাহ্নে,—অপরাহ্ণ সন্ধ্যায় শেষ হ'ল তবু নরেনের দেখা নেই। রাত্রিতে শীতল দেওয়ার সময় হয়ে এল। শীতলের দুধ জ্বাল দিয়ে দিতে হয় ব'লে ওর কাছেই আসে—শ্যামা বহু রাত্রি পর্যন্ত দেখে নিজেই দুধ বাতাসা নিয়ে গিয়ে ঠাকুরঘরে নিবেদন ক'রে দিয়ে এল। মন্ত্র জানে না—চোখের জলে সে ত্রুটি পূরণ ক'রে নিয়ে মনে মনে জানালে, 'অপরাধ নিও না ঠাকুর, সবই ত বুঝছ—নিজগুণে এই গ্রহণ করো।'

তখন আর উপায়ও ছিল না। মনিবদের কথাটা জানাতে ভরসা হ'ল না— এত রাত্রে কোথায় কাকে পাবেন তাঁরা—শেষ পর্যন্ত ঠাকুর হয়ত উপবাসী থাকবেন, আর সেই অপরাধে এই আশ্রয়টুকুও হয়ত যাবে। বাধ্য হয়েই ঠাকুর দেবতাকে

নিয়ে এই মিথ্যাচরণ করতে হ'ল—সেজন্য বার বার শিউরে উঠতে লাগল ওর অন্তরাত্মা।

কিন্তু রাত যখন আরও গভীর হয়ে এল—(কত রাত তা জানবার পায় নেই, ঘড়ি এখানে নেই, কারুর ঘড়ির শব্দ কানেও যায় না। দূরে কোন্ একটা কলে ভোঁ বাজে একবার রাত চারটেয়, একবার সকাল আটটায় আর একবার বেলা চারটেয়। এই ওর একমাত্র সময় জানবার উপায়) তখন আর থাকতে পারলে না। সমস্ত বাগানটা অন্ধকারে ভয়াবহ হয়ে ওঠে প্রতি রাত্রেই, সেই নীরন্ধ্র নিঃসীম অন্ধকারে যখন জোনাকি জ্বলে আর ঝিঁঝি পোকা ডাকে তখন প্রত্যহই ওর বুকের মধ্যে ভয়ে গুর্‌গুর্ করে। গুপ্তিপাড়ায় থাকতে জোনাকি আর ঝিঁঝি পোকা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখানের ঝিঁঝি পোকা যেন বড় বেশি ডাকে, তেমনি ব্যাঙ্‌গুলো ঘ্যাঙর ঘোঁ করে সারারাত। তবু অন্য দিন নরেন থাকে—আজ একা এই ঘরে, বিজন বনের মধ্যে শুধু এই দুটি শিশু পুত্রকন্যা নিয়ে থাকতে যেন কিছুতেই সাহসে কুলোল না। সে মরীয়া হয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে ভেতরে গিয়ে মঙ্গলার শরণাপন্ন হ'ল। মিছে কথাই বললে, 'মা, উনি শেতল দিয়েই যে কোথায় বেরোলেন——এখনও ত ফিরলেন না, একা কি ক'রে থাকব ?'

'তাই ত! বেরোল আবার কোথায়, এত রাত্রে! ছোঁড়ার আক্কেল ব'লে যদি কিছু আছে! ভর-যুবতী বৌ ঘরে—এই এত রাত্রে, বাগানের একটেরে—তাই ত! দেখি যদি হরির মা তোমার ঘরে শুতে রাজী হয়। তোমাদের যা বিছানা বাপু, আমার ছেলে-মেয়েরা শুতে রাজী হবে না।'

চকিতে ওদের কলকাতার বাড়ির শিমুলতুলোর পুরু গদি আর ধপ্‌ধপে চাদরের কথাটা মনে পড়ে যায়। রাসমণি দরিদ্র হ'লেও জমিদারীর অভ্যাস কতকগুলি ছাড়তে পারেন নি এখনও, তার মধ্যে বিছানার বিলাস একটি।...ওর শ্বশুর-বাড়িতেও খাট-পালঙ্কের ছড়াছড়ি ছিল—নিজের চোখেই দেখেছে শ্যামা।

সে একটা উদ্গত নিঃশ্বাস দমন ক'রে বললে, 'না মা, শুতে কাউকে হবে না। একটু কান রাখবেন। একা রইলুম যদি ভয়-টয় পাই—একটু সাড়া দেবেন।'

'অ!' অপ্রসন্ন কণ্ঠে মঙ্গলা বলেন, 'হরির মা ঝি বলে বুঝি তাকে বিছানায় নিয়ে শুতে মানে বাধল। তা ঝি হোক—ওর গায়ে জল আছে বাপু তা মানতেই হবে। আর কৈবত্তর মেয়ে, সৎ জাত, এমন কিছু ময়লা কাপড়ও পরে থাকে না... সে ত্যাখো, যা তোমার খুশি। তা ব'লে আমি ছেলেমেয়ে ও ঘরে পাঠাতে পারব না।'

অপরাধিনীর মত মাথা হেঁট ক'রে বেরিয়ে এল শ্যামা। ফল কিছুই হ'ল না—

মাঝখান থেকে কথাটাই জানাজানি হয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে খাওয়া হ'ল না কিছু। সকালেও ভাত খায় নি, নরেনের জন্য অপেক্ষা ক'রে বসে ছিল—সেই জল দেওয়া ভাতই হেমকে এক গাল খাইয়ে, মেয়েকে দুধ খাইয়ে নিজে শুধু বাতাসা মুখে দিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালেও নরেনের দেখা নেই। বেলা আটটা নাগাদ পুঁটুরাণী দেখা দিলেন, 'কি গো বামুন-দি, ভট্‌চাজ মশাই ফিরেছে?'

পুঁটু বা পিঁটকী সত্যিই শ্যামার চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু তার বিশ্বাস অন্য রকম। তাই সে দিদি বলেই ডাকে, শ্যামাও প্রতিবাদ করে না। ওর বিয়ে হয়েছে, ছেলেমেয়েও হয়েছে। কিন্তু—কথাবার্তায় মঙ্গলার মুখেই শুনেছে শ্যামা—তাদের অবস্থা খুব ভাল নয় ব'লে বছরের দশ মাসই সে এখানে থাকে; মঙ্গলা আদরের মেয়েকে পাঠান না।

'মাগো, শুনলে অবাক্ হয়ে যাবে, বাসনমাজার একটা ঝি পর্যন্ত নেই। কায়েত-বাড়ির এমন দন্যিদশা হয় শুনি নি কখনও।...সে বাড়িতে মেয়ে পাঠাই কি ক'রে বলো? আমার আদরের বড় মেয়ে, সে কি বাসন মাজতে যাবে সে বাড়ি! ঘট্‌কী মাগীই সব্বনাশ করলে—মিথ্যে ভুচুং দিয়ে বিয়ে দেওয়ালে। কী বলব এদিক আর মাড়ায় না ভয়ে, নইলে আমি সন্য আঁশবঁটি দিয়ে নাকটা কেটে নিতুম, তবে অন্য কথা! না হয় জেল হ'ত আমার—এর বেশি ত নয়? তবে তাও বলি, দত্তবাড়ির মেয়েকে জেল দেয়, এমন জজ ম্যাজেস্টার এখনও জন্মায় নি।'

আপন মনেই এমনি বকে যান উনি—হয়ত বাসন মাজতে মাজতেই শোনে শ্যামা। আদরের মেয়ে সেও ছিল, এখনও তার বাপের বাড়িতে দিনরাতের ঝি আছে। কিন্তু সে কথা তোলা এখানে নিরর্থক...

পুঁটির প্রশ্নের উত্তরে ভয়ে ভয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে শ্যামা জানায় যে নরেন ফেরে নি এখনও।

'তবেই ত চিত্তির! পুজোর কি হবে?' পুঁটি যেন একটা উল্লাসই বোধ করে শ্যামার এই বিপদে। কোথায় যে একটা কি কারণ ঘটেছে তা শ্যামা জানে না—পুঁটির একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ সে অনুভব করতে পেরেছে এই ক-দিনেই।

'দাঁড়িয়ে আতান্তর বলো!' পুঁটি আরও খানিকটা অপেক্ষা ক'রে (বোধ হয় শ্যামার কাছ থেকে উত্তর পাবার আশা ক'রে) মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল, 'তখনই বলেছিলুম মাকে যে ঐ নেশাখোর মিনসেকে ঢুকিও না—ঠাকুরের সাত হাল হবে।'

আরও খানিক পরে এলেন মঙ্গলা নিজেই, 'হ্যাগা তা হ'লে কি হবে বলো,

ঠাকুর ত চচ্চড়ি হচ্ছেন এত বেলা অব্দি—সারাদিন ত আর টাঙিয়ে রাখতে পারি না।'

শ্যামা নিঃশব্দে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে পায়ের নখ দিয়ে উঠোনের মাটি খোঁড়ে। কি জবাব দেবে সে? কি জবাব দেবার আছে? পৃথিবী যেন টলতে থাকে ওর পায়ের নিচে।

মঙ্গলা মুহূর্ত-কয়েক চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'আছে এখানে আর একজন পুরুত বামুন, সে-ই পুজো করত, গাঁজাখোর ব'লে তাড়িয়ে দিয়েছি। বলো ত তাকেই ডাকি, যে-ক'দিন নরেন না আসে ঐ করুক। তবে তাকে নৈবিদ্যির চালটা পুরো ধরে দিতে হবে বাপু, তা আগেই ব'লে রাখছি। নইলে সে ব্যাগার দিতে আসবে কেন?···আমার বরাতই এমনি। ছোঁড়াকে কত ক'রে ঝুঝিয়ে বললুম যে, এখানে ত আরও ক-ঘর বামুন কায়েত আছে, ষষ্ঠী মাকাল পুজোও লেগে আছে সব ঘরেই —বলে বারো মাসে তেরো পাব্বন। ঘুরে ঘুরে যদি সব ক-ঘর না হোক্, আদ্দেকও ধরতে পারিস্ ত ভাবনা কি!···ঐ গাঁজা-খোর ভরসা, ওকে কেউই রাখতে চায় না। তা শুনলে আমার কথা?'

কাল থেকে খাওয়া হয় নি। আজকের চালগুলোও যাবে। শ্যামা একবার ব্যাকুল হয়ে ওঁর মুখের দিয়ে চেয়ে যেন কী বলতে গেল—শেষ পর্যন্ত বলতে পারলে না। কীই বা বলবে, যে পুজো করবে সে কেন চাল ছেড়ে দেবে? ওঁরা যে এই বন্দো-বস্তেই রাজী হয়েছেন এই ঢের। এখনই যে তাড়িয়ে দেন নি, এই জন্যেই মনে মনে কৃতজ্ঞতা বোধ করল সে।

সেই ব্যবস্থাই হ'ল। পুরাতন ব্রাহ্মণ এসে বার বার সবাইকে শুনিয়ে গেলেন, 'নেশাই করি আর যাই করি, বামুন ত বটে। জাত সাপ। তাড়িয়ে দিলেই হ'ল! আবার ত শেষে সেই ডাকতে হ'ল। তা বাবু আমার এমন একটিনি করা পোষাবে না। ও যদি না করে ত পুজোটা আমাকেই দেওয়া হোক।'

হেম কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে কতকগুলো কালোজাম তাকে খেতে দিয়েছিল শ্যামা। দুপুরে সকলে ঘুমোলে বাগান থেকে কতকগুলো ডুমুর পেড়ে এনে সেদ্ধ ক'রে নুন দিয়ে খাওয়ালে। নিজেও খানিকটা খেলে তাই। উপবাস করতে তার আপত্তি নেই কিন্তু মেয়েটার মুখ চেয়ে প্রাণপণে চোখের জল চেপেও সেই ডুমুরসেদ্ধ খেতে হ'ল!

পরের দিন আর সহ্য করতে না পেরে মঙ্গলাকে গিয়ে বললে, 'ছেলেটার মত একগাল চাল যদি দেন মা—নেতিয়ে পড়েছে একবারে।'

'ওমা, ঘরের বুঝি এমনি অবস্থা! একেবারে ভাঁড়ে মা ভবানী? তোমারও মুখ-

চোখ বসে গেছে যে, মুখে আগুন অমন সোয়ামীর। আমি হ'লে অমন সোয়ামীর মুখে জ্যান্ত নুড়ো জ্বেলে দিয়ে চলে যেতুম। খান্‌কী-খাতায় নাম লেখাতে হ'ত তাও ভাল। হাত্তোর বামুনের ঘর রে!'

এক রেক চাল বার ক'রে দিয়ে বললেন, 'এইতেই টিপে টিপে চালাও গে, সে ছোঁড়া কতদিনে আসে তার ঠিক কি!'

টিপে টিপে চালালেও এক রেক চাল এক রেকই। আরও দিন কতক উপবাসের পর একদিন নরেন্দ্রনাথ দেখা দিলে। কাঁধে একটা বস্তা, খালি পা—উড়ুনিখানাও নেই; পরনের কাপড়খানা যেমন ময়লা তেমনি শতছিন্ন, গামছাটা গায়ে জড়ানো।

ধপাস্ ক'রে বস্তাটা নামিয়ে রেখে প্রশান্ত কণ্ঠেই বললে, 'কৈ গো কোথায় গেলে,—একটু তামাক সাজো দিকি!'

তিন

ঘৃণা যখন আকণ্ঠ পূর্ণ হয়ে উপ্‌চে পড়ে তখন তিরস্কারের ভাষাও মুখ দিয়ে বেরোয় না। শ্যামারও উপবাস-শীর্ণ ঠোঁট দুটি বারকতক থর্‌থর্ ক'রে কাঁপল বটে কিন্তু একটি কথাও সে কইতে পারলে না, কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা ক'রে ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে, অবসাদে, দুঃখে ওর চৈতন্যও যেন এলিয়ে পড়েছিল।...

হাঁক-ডাকে মঙ্গলা নিজেই এলেন ছুটে। তাঁর সমস্ত লাঞ্ছনা চুপ ক'রে সহ্য ক'রে নরেন একটু হাসবারও চেষ্টা করলে। বললে, 'ও যে এত বোকা, সব ভাঁড়ার খালি ক'রে আমাকে বলেছিল তা কি ক'রে জানব! আমি ভাবলুম যে ঘরে মার দরুণ চাট্টি চাল রেখেই বলেছে হাঁড়ি খালি।...আর রোজগার করা কি মা এতই সোজা! কত ত ঘুরলুম, নিজেই কি সব দিন খেতে পেয়েছি ভাবছেন? তাহ'লে এমন ছিরি হয়?...জুয়া খেলে কিছু রোজগার করেছিলুম, আবার জুয়া খেলেই তা দিয়ে আসতে হ'ল। শেষে এই পনেরোদিন এক গোলদারী দোকানে খাতা লিখে নানান্ ভাঁওতা দিয়ে এই আধমণ ময়দা নিয়ে সরে পড়েছি। তা গেল কোথায়, রুটিই গড়ুক না খানকতক!'

'তোমার লজ্জা নেই, বেহায়ার একশেষ তা জানি বাছা, তোমাকে কোন কথা বলাই মিথ্যে। কিন্তু এমন ক'রে ত আমার চলবে না—তা ব'লে দিলুম। এরকম যদি করতে হয় ত পথ দ্যাখো। আমার ঘর খালি ক'রে দাও, আমি দোসরা লোক দেখি। বলে মরেও না, ছাড়েও না—আড়া আগলে পড়ে থাকে, এমন ধারা আমার চলবে না।'

'মাইরি মা, এই আপনার দিব্যি বলছি—আর হয়ত দু-একবার এমনি হবে তারপর আমি একেবারে ভাল ছেলে হয়ে বসব এখানে এসে। আপনি দেখে নেবেন।'

বকতে বকতে মঙ্গলা চলে গেলেন। নরেন উঠে এসে শ্যামার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলে, 'নে নে, ওঠ্, আর অত ন্যাকামোর কাজ নেই! খানকতক রুটি গড়্ দেখি ভালমানুষের মত!'

শ্যামা আঘাত পেলে কিনা বোঝা গেল না। খানিকটা কেঁদে সে বোধ হয় প্রকৃতিস্থ হয়েছিল, আঁচলে চোখ মুছে শান্ত কণ্ঠেই বললে, 'রুটি খাবে কি দিয়ে? ঘরে ডাল মশলা ত চুলোয় যাক—নুন তেল পর্যন্ত নেই!'

রাগে দাঁত কিড়মিড় ক'রে উঠল নরেন, 'উঃ! সব ঐ শোর পেটে গিলে আর গিলিয়ে বসে আছ! আ-স্তোর নিকুচি করেছে!...'

তারপর ওর মুখের কাছে হাত-পা নেড়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'বেশ করেছ এখন শুধু খাও! আমি তার কি করব!'

শ্যামা মার কাছে থেকে যা নিয়ে এসেছিল তার পর যে নরেন আর এক ছটাকও ডাল মশলা নুন তেল কেনে নি—অনাবশ্যক বোধেই সে কথাটা আর স্মরণ করালে না সে। স্বামীর মুখের দিকে চাইলেও না—একটা গামলাতে খানিকটা ময়দা বার ক'রে নিয়ে মাখতে বসল।

কে জানে কেন—ওর এই নীরব উপেক্ষা আজ নরেনের চোখে পড়ল, সে খানিকটা চুপ ক'রে ওর গতিপথের দিকে চেয়ে থেকে নিজেই তামাক সাজতে বসল, তারপর বেশ একটু উচ্চকণ্ঠেই মন্তব্য করলে, 'হুঁ—তেজ হয়েছে, তেজ! তেজ ভাঙব যেদিন, বুঝবি!'

দিন দুই-তিন ঘরে বিশ্রাম করলে নরেন। আগেকার পুরোহিতকে নিজেই ডেকে বললে, 'মাইরি দাদা, যে কটা দিন না আসি তুমি চালিয়ে নিও। দেখছ ত, আমি কাজের তালেই ঘুরছি। কোথাও একটা আট-দশ টাকার কাজও যদি পাই ত চলে যাবো—এখানে কি থাকব ভেবেছ? তাহ'লেই ত ষোল আনা তোমার হয়ে গেল, বুঝলে না?...কাজেই গোল ক'রো না কিছু—আমি কাজটা তোমাকেই দেওয়াতে চাই।'

এর ভেতরে সে কোথা থেকে কিছু ডাল নুন তেলও যোগাড় ক'রে এনেছিল। চারদিনের দিন বৌকে ডেকে বললে, 'ভাঁড়ার সব গুছিয়ে দিয়ে গেলুম—নাকে কাঁদবি না, খবরদার! আমি আবার এখন দিনকতক ঘুরব। দেখি যদি কাজ-টাজ পাই।'

এখনই যে সে যেতে চাইবে শ্যামা তা ভাবেনি। সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অতিকষ্টে যখন কণ্ঠস্বর ফিরে এল তখন বললে, 'তুমি আবার চলে যাবে?...আমাদের কে দেখবে?'

'দেখবে আবার কে? তুই কচি খুকী নাকি? দোরে খিল দিয়ে শুবি—আমি, আমি এই দিন চার-পাঁচের মধ্যেই ফিরব।'

এরপর ফিরল নরেন একেবারে দেড় মাস কাটিয়ে। অলঙ্কার বিশেষ কিছুই ছিল না। এবার মা আসবার আগে নতুন ক'রে কানের দুটো মাকড়ী, নাকের নথ এবং দুগাছা বালা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। উপবাস সহ্য করতে না পেরে শ্যামা মাকড়ী দুটো মঙ্গলা ঠাকরুনের কাছে বাঁধা রাখতে বাধ্য হয়েছিল। তবুও তার ছেলের এবং নিজের দেহের যে অবস্থা হয়েছে তাতে চিনতে পারবার কথা নয়। নরেনও কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থেকে একটু যেন অনুতাপের সুরেই বললে, 'ইস্, কি চেহারা হয়েছে রে তোর ছোট বৌ, খেতে-টেতে পাস্ নি বুঝি!...এত বড় লোকের আশ্রয়ে রেখে গেছি—বামুনের মেয়ে, তোরা ত হলি গিয়ে শুদ্দুর, কায়েত। তোদের বাড়ি আমার ঠাকুর্দা থাকলে পা ধুতেও আসতুম না।...তোরা চাট্টি চাল দিতে পারিস নি? চামার! চামার! চোখের পর্দা নেই এতটুকুও।'

খানিকটা গজগজ ক'রে বাঁ হাতের পুঁটুলিটা নামিয়ে রাখলে। ডান হাতে ছিল গালা-মাখানো একটা মাটির ভাঁড়—তাতে খানিকটা ঘি। সেটা শ্যামার হাতে দিয়ে বললে, 'পরশু একটা ছেরাদ্দর কাজ জুটেছিল—তারই ঘি। খাসা গাওয়া ঘি, আধসেরের কম নয়। আর ঐ নে, ওতে ভুজ্যির চাল ডাল আনাজপাতি মশলা দুখানা কাপড়—সব আছে। মায় আজ নেমভঙ্গের একটা মাছ পর্যন্ত।...ভাল ক'রে রান্নাবান্না কর্।'

এবারেও শ্যামা কোন কথা কইলে না। শুধু যে ঘৃণা করে ওর তাই নয়—এতদিনে সে সম্পূর্ণ বুঝেছে যে এ পশুর সঙ্গে চেঁচামেচি করা সম্পূর্ণ অনর্থক। জীবনের স্বাদ তার ঘুচে গেছে—আনন্দ দুঃখ এই বয়সেই যেন আর দাগ কাটে না। শুধু হেম আর মহাশ্বেতার মুখ চেয়ে কোনমতে প্রাণধারণের উপায় খুঁজে বেড়ায় সে এখন দিনরাত।

মঙ্গলা কিন্তু শ্যামার সহজ নিস্তব্ধতা সুদসুদ্ধ পুষিয়ে নিলেন। বললেন, 'এবার এসেছ—মাগ ছেলের হাত ধরে যে পথ দিয়ে ঢুকেছিলে সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে যাও। এমন ক'রে আমি পারব না—সাফ কথা। আর সহজে না যাও ত পুলিস ডাকব বলে দিলুম।'

প্রথম সমস্ত বকুনিটা নরেন শুনেছিল চুপ ক'রেই, কিন্তু এই কথায় সে যেন ছিটকে তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠল, 'ডাকুন না পুলিস। ঠাকুরের সম্পত্তি নিজেরা সব দুধে-মাছে খাচ্ছেন আর ঠাকুরের জন্যে ঠেকিয়ে রেখেছেন আধ সের চাল !...লজ্জা করে না আপনার ! আপনার কি, আমি ত একটিনি দিয়ে গেছি। কাজ পেলেই হ'ল ।...পুলিস ডাকবেন ! এখনও চন্দর-স্যিয্যি উঠছে—বুঝলেন, হাজার হোক আপনারা শুদ্দুর আর আমরা বামুন ! যদি বেরোতে হয় পৈতে ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে যাবো। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন, সবাই মুখে রক্ত উঠে মরে যাবে এই বলে দিলুম !'

মঙ্গলা অভিযোগে ততটা ভয় পান নি যতটা পেলেন এই অভিশাপের সম্ভাবনায়। মুখ শুকিয়ে উঠল তাঁর। গলাটাও অনেকটা নামিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন নিজের বাড়ির দিকে। তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেই নরেন যেন মনের খুশিতে একপাক নেচে নিয়ে হি হি ক'রে হেসে বললে, 'দেখলি কেমন জোঁকের মুখে নুন পড়ল ! তুই ত ভেবেই খুন। যখন যাবো নিজের খুশিতে যাবো। তা ব'লে ওরা তাড়াবার কথা বলবে ! ইস, বলুক দিকি ! এক তুড়িতে উড়িয়ে দেবো না !'

সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা খানিকটা ঘুম দিয়ে উঠে বসে প্রথমেই নরেন ফরমাশ করলে, 'অনেকদিন ভালমন্দ খাই নি। আজ খানকতক লুচি ভাজ্ দিকি আমার মত। লুচি আর আলুর দম। তোরাও না হয় দুখানা ক'রে খাস।'

শ্যামা একটু অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থেকে বললে, 'কিন্তু ময়দা পাবো কোথায় ? তোমার ও পুঁটুলিতে ত ময়দা ছিল না !'

'সে কি ! কেন, সেই যে ময়দা ছিল আধ বস্তা !'

শ্যামার বাক্‌রোধ হয়ে এল বিস্ময়ে, 'সেই ময়দা আজও থাকবে ? তুমি কদিন বাড়িছাড়া হিসেব করেছ ? আর কী রেখে গিয়েছিলে ? ছেলেমেয়েদের বাঁচাই কী দিয়ে ? মাকড়ী-জোড়া রেখে সরকার-গিন্নী চার টাকা দিয়েছিলেন, তাও ত সব চলে গেছে। এই তিনদিন কুমড়ো আর ডুমুরসেদ্ধ খেয়ে আছি আমরা। ওদের বাগান থেকে চুরি ক'রে আনতে হয়েছে কুমড়ো।...আমাদের দিন কী ক'রে চলে তার কোনদিন হিসেব রেখেছ ? আমি মরি তাতে দুঃখ নেই একটুও—ছেলেমেয়েগুলোকে ত তুমি এনেছ সংসারে ! তাদের কথাও ভাবো কোনদিন ?'

বলতে বলতে এতদিনের জমাট-বাঁধা দুঃখ যেন অন্তরের শাসন ভেঙে দুই চোখের কূল ছাপিয়ে বেরিয়ে এল। কান্নায় গলা বুজে এল শ্যামার।

কিন্তু সে অশ্রুর প্রতিক্রিয়া হ'ল নরেনের ওপর ঠিক বিপরীত। সে যেন জ্বলে উঠল, 'তাই ব'লে তুমি সেই আধ বস্তা ময়দা মুন-তেল দিয়ে সবাইকে গিলিয়ে বসে আছ! ছেলেমেয়ে, ছেলেমেয়ে আমার স্বগ্‌গে বাতি দেবে!...হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্ছা সব!'

শ্যামারও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল এবার। সেও কণ্ঠস্বর বেশ একটু চড়িয়েই বললে, 'তুমি ত চারদিন খেয়ে তবে এ বাড়ি থেকে গেছ। ত্ব'বেলা তিনটে লোক ময়দা খেলে আধ মণ ময়দার কত বাকী থাকে?'

'দেখাচ্ছি কত বাকী থাকে! ঐ গোরাবেটার জাতকে আগে এক এক কোপে সাবাড় করি, তারপর তোকে কেটে যদি ফাঁসি না যাই ত আমি বামুনের ছেলে নই!'

এই বলে মুহূর্ত-খানেক এদিকে ওদিকে চেয়েই ঘরের কোণ থেকে কাটারিখানা তুলে নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এল, 'কৈ, কোথায় গেল সে বেটা-বেটিরা? আজ তাদের শেষ ক'রে তবে অন্য কাজ।'

চরম বিপদের সময় একরকম মরীয়া হয়ে ওঠে মানুষ, সাহস ও বুদ্ধি দেখা দেয় অপ্রত্যাশিত ভাবে। রান্নার জন্য বাগান থেকে কুড়িয়ে আনা কয়েকটা গাছের ডাল ছিল ঘরের কোণে, অকস্মাৎ তাই একটা তুলে নিয়ে শ্যামাও বাইরে বেরিয়ে এল প্রায় ছুটে, তারপর অপ্রত্যাশিত দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'নামাও বলছি কাটারি, নইলে আমি ঠিক মাথা ফাটিয়ে দেব।...নামাও!'

কী ছিল সে কণ্ঠে তা নরেন না বুঝলেও এটুকু কেমন ক'রে অনুভব করলে যে, আজ এই মুহূর্তে শ্যামার পক্ষে সবই সম্ভব। হয়ত সে নিজের মনে মনেই বুঝেছিল যে স্ত্রীর ধৈর্যের ওপর চরম আঘাত সে হেনেছে। আস্তে আস্তে উদ্যত হাত নামিয়ে কাটারিখানা উঠোনেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'আচ্ছা আজ থাক। কিন্তু তোদের মৃত্যুর আর বেশি দেরি নেই তা বলে দিলুম।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এক

উমাদের খালি বাড়িটা যেন উমাকে ভ্যাংচায়। এক এক সময় সে ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে হা-হা ক'রে হাসছে নোনাধরা দেওয়ালগুলো। সত্যি সত্যিই যেন হাসির আওয়াজ পায় সে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে উমা। আজকাল এই চিন্তাটা তার বড় বেশি হয়েছে—সে পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি!

মাঝে মাঝে নাকি সে আপন মনে বকেও। অন্তত মা তাকে একাধিক দিন তাই বলেছে। তিনিই চমক ভেঙে দিয়েছেন। কিন্তু তার ত মনে পড়ে না—কখন মনের কথাগুলো ঠোঁটের ওপর নাচে অমন ক'রে!

মাঝে মাঝে তার মনে হয় স্বামীর কথা। অমন সুপুরুষ স্বামী তার! কার্তিকের মতই রূপবান···একবার তার মনে হয়, না-ই বা স্বামী তাকে নিয়ে ঘর করলেন—শ্বশুরবাড়ি না-ই বা যেতে পেলে সে—এক-আধবারও যদি তিনি আসতেন সে ধন্য হয়ে যেত। দুটি একটি রাত্রির সঙ্গলাভও যদি সে করতে পারত। আত্মসম্মান নয়—অভিমান নয়, কোনপ্রকার অনুযোগেও সে বিব্রত করত না স্বামীকে, কোন কৈফিয়ত চাইত না। কোন দায় চাপাত না—বোঝার মত ঘাড়ে চাপত না।

সন্তান?

সন্তান হ'লে সে পরের বাড়ি রাঁধুনীগিরি ক'রে কিংবা দাসীবৃত্তি ক'রে মানুষ করত। স্বামীকে কিছু বলত না। একবার আসুক না শরৎ, এসেই দেখুক না। এই ত ঝি বলছিল, 'কত পুরুষ ত বাইরের মেয়েমানুষ রেখেছে, তাই বলে কি ঘরের বৌ নিয়ে ঘর করে না তারা? এ আবার কেমনতারা অনাছিষ্টি কাণ্ড বাপু!···কোন্ পুরুষের আজকাল বার-দোষ নেই? এ ত শহর-বাজার জায়গা—আমাদের পাড়া-গাঁয়েও দেখ গে যাও ঘর-ঘর এই সব কীর্ত্তি? কিন্তু মেয়েমানুষের বাড়ি পড়ে থাকা—এমন সোন্দর বৌ—তা দেখা নেই ছোঁওয়া নেই—এমন কখনও শুনি নি!'

তারই অদৃষ্টে এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড।

একবার কাছে পেলে সে স্বামীর পায়ে ধরেও রাজী করাত।

কিন্তু কোথায় সে? কোন খবর পর্যন্ত পায় না। শুনেছে যে আজকাল নাকি সে বাড়িতেও আসে না—মাকে একটা পয়সা পর্যন্ত দেয় না। তার সেই মেয়ে-মানুষের বাড়ি খোঁজ করতে যাওয়া কিংবা ছাপাখানায় যাওয়া? ছিঃ, সে তা পারবে না!

তাছাড়া সে সম্ভব নয়। প্রথমত সে তার ঠিকানাও জানে না। দ্বিতীয়ত মার কাছে এ কথা পাড়লে—? দুখানা ক'রে কেটে ফেলবেন তিনি।

মনে মনে এই সব কথা আলোচনা করে যখন, তখন বোধ হয় মুখ কখনও কখনও নড়ে ওঠে—সে টের পায় না। লজ্জিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করে—আর কখনও এমন অন্যমনস্ক হবে না।

মাস কতক পরে উমার তবু একটা কাজ জুটল। মানে, সময় কাটাবার কাজ। পাড়ায় একটা বস্তি ছিল, হঠাৎ সেটা ভেঙে ফেলতে শুরু করলে। শোনা গেল ওখানে

নাকি একটা নতুন থিয়েটার-বাড়ি তৈরী হবে।

থিয়েটার? সেটা আবার কি?

'ঐ যে,'—ঝি হাত-পা নেড়ে বললে, 'লাটক হয় গো, লাটক! পেলে হয়! সব রং-চং মেখে বেরোয়, নাচগান কথা-বাত্তারা হয়, তারপর আবার যে যার বাড়ি চলে যায়। যেমনকে নিঝ্‌ঝুম তেমনি। জানো না!'

উমা দেখে নি কখনও থিয়েটার—তবে নাটক সে পড়েছে দু-একখানা। ব্যাপারটা ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা আন্দাজ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে অন্য দিক দিয়ে কৌতূহল কমবার কোন কারণ ঘটে না। বাড়িটা হচ্ছে ওদের গলিটা যেখানে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে তারই কাছাকাছি—উল্‌টো দিকটায়। ওদের ছাদ থেকে খানিকটা স্পষ্ট দেখা যায়। উমা আজকাল অবসর পেলেই ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়। হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে। কী দেখে তা সে জানে না। মিস্ত্রী খাটে, মজুররা যোগাড় দেয়। একটি বাবু দিনরাত দেখাশোনা করেন আর মিস্ত্রীদের গাল দেন, তার ভাষা এখানে এসে পৌঁছয় না—অঙ্গভঙ্গীটা লক্ষ্য করা যায়। আর আসে সবটা মিলিয়ে একটা কোলাহল। অদ্ভুত, অপূর্ব লাগে উমার। তবু একটা বৈচিত্র্য, তবু একটা প্রাণচঞ্চলতা। ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা যেন নেশায় দাঁড়িয়ে যায় ওর।

রাসমণি বকেন, কিন্তু খুব জোরে নয়। বড়জোর বলেন, 'আ মরণ! একটা বাড়ি উঠছে, মিস্ত্রী খাটছে, তার মধ্যে এমন কি মজা আছে তা ত বুঝি নে। দিন-রাত রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসুখ করবে যে। রং ত পুড়ে যাচ্ছে একেবারে।'

বেশী কিছু বলেন না। ও যে কত দুঃখে এইটে নিয়ে ভুলে থাকতে চায় তা তিনি মায়ের প্রাণে ভালই বোঝেন।

কিন্তু এরা বাড়িই তৈরী করাচ্ছে। থিয়েটারের লোক এরা নয়, তা উমা বোঝে।

মধ্যে মধ্যে একটা গাড়ি চেপে একটি বাবু আসেন তদ্বির করতে, হয়ত তিনিই মালিক।...থিয়েটারের লোক কেমন? এমন কি সাধারণ মানুষের মতই? কে জানে? ওর কৌতূহলী মন কল্পনায় তাদের বিচিত্র মূর্তি আঁকে।

অবশেষে—থিয়েটারের বাড়ি শেষ হয়ে আসার মুখে অপ্রত্যাশিত ভাবে সত্যিকার থিয়েটারের লোক এসে হাজির হয় ওদের বাড়ি।

একদিন ঝি এসে রাসমণিকে বললে, 'একটি বুড়ো গোছের বাবু এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' রাসমণি বিস্মিত হয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে নেমে এলেন, উমাকে বার বার সতর্ক ক'রে দিলেন—নিচে না উঁকি মারে সে।

কিন্তু উমার কৌতূহল অদম্য। সে সিঁড়ির ওপরদিককার একটা ধাপে প্রায়

শুয়ে পড়ে একটা খাঁজ দিয়ে চেয়ে থাকে। সে দেখতে পায় ঠিকই কিন্তু তাকে দেখা যায় না। যে লোকটি এসেছিলেন তিনি ভেতরে এসে দাঁড়ালেন। বুড়ো নয় মোটেই—বেশ শক্তসমর্থ জোয়ান লোক। হয়ত বড়জোর চল্লিশ বয়স। কিন্তু মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে অল্প বয়সেই। লম্বা দোহারা গঠন, সাদা থান-ধুতির কোঁচা সামনে পাট-করা গোঁজা—সাদা চীনে কোট গায়ে, তাতে বোতামের ঘরের দুদিকে চমৎকার সুতোর কাজ করা, পায়ে শুঁড়-তোলা চটি। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক ভেতরে এসে নমস্কার ক'রে দাঁড়ালেন হাত জোড় ক'রে, 'মা, আমি আপনার কাছে একটি ভিক্ষা নিয়ে এসেছি।'

রাসমণি বললেন, 'বলুন!'

'জানেন বোধ হয় যে এইখানে, এই মোড়ে একটা থিয়েটার-বাড়ি হচ্ছে। ওটা এখনও শেষ হয় নি অথচ এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে আমরা রিহার্স্যাল—মানে মহড়া শুরু করেছি। কিন্তু এখানে এখনও পাইখানা-কল কিছুই তৈরী হয় নি। এতগুলো লোক আসবে—একটু খাবার জলও দরকার—আমাদের চাকরকে রোজ দু-তিন ঘড়া খাবার জল নেবার অনুমতি দেন ত এতগুলি প্রাণীর জীবনটা বাঁচে।'

রাসমণি বিপন্ন মুখে খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'জল চাইলে না বলতে নেই—কিন্তু বাবা, একা মেয়েছেলে একটা সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ঘর করি—থিয়েটারের লোক বাড়ি এলে কে কী বলবে—বড় ভয় পাই।'

সে ভদ্রলোক বললেন, 'মা, পাড়ার এখানে আর কারো বাড়ি কল নেই আমি খবর নিয়ে জেনেছি। তা থাকলে কিছুতেই আপনাকে বিরক্ত করতুম না। তাছাড়া, থিয়েটারের লোক সবাই ত খারাপ নয় মা—আমি বামুনের ছেলে, ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়াও করেছি। পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ির দৌউত্তুর আমি।—চাকর এসে জল নিয়ে যাবে এক-আধ কলসী বৈ ত নয়। হিন্দুস্থানী বেয়ারা, তারাও সৎ জাত।'

রাসমণি একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। এতে যদি পাড়ায় কোন কথা ওঠে কি আর কোন উপদ্রব হয় ত শেষ পর্যন্ত আমায় এ ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে, তা আপনাকে জানিয়ে রাখছি।'

ভদ্রলোক হেঁট হয়ে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেলেন। মা এদিকে ফেরবার আগেই উমা নিঃশব্দে তার খাঁজ থেকে উঠে পালিয়ে গেল। তার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে—ধরা পড়বার ভয়ে নয়, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে—বিশেষত নিতান্ত যা কল্পলোকের বস্তু সেই থিয়েটারের সঙ্গে—যোগাযোগ স্থাপিত হবার সম্ভাবনায়।

দুই

রাসমণির একটা সুবিধা ছিল এই যে পাড়ার লোক কি বলছে না বলছে সেটা তাঁর জানবার বিশেষ সম্ভাবনাই ছিল না। তিনি কারও বাড়ি যেতেন না, তাঁর বাড়িতেও লোকে আসত কদাচিৎ। সাদিকরা আসতেন, তা তাঁরাও কারও কথায় থাকতেন না। ঝি তাঁর প্রায় দিনরাতের—পাড়ার কেচ্ছা বহন ক'রে বেড়াবে এ আশঙ্কাও কম।

সুতরাং থিয়েটারের জল নেওয়ার ব্যবস্থাটা অব্যাহতই রইল। শুধু তাই নয়—রাসমণির অনিচ্ছাতেও ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটা একটু বাড়ল। হঠাৎ একদিন একটি স্ত্রীলোক একেবারে হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে এসে বললে, 'মা জননী, রাগ ক'রো না মা—বড় বিপদে পড়েছি, আপনার ঐ দিকটা একটু ব্যবহার করব।' এই বলে সে কল-পাইখানার দিকটা দেখিয়ে দিলে।

ইচ্ছা থাকলেও বাধা দেবার উপায় ছিল না। চক্ষুলজ্জায় বাধে। তাছাড়া সে অনুমতি চাইলেও তার জন্যে অপেক্ষা করে নি। দামী শান্তিপুরী শাড়ির ওপরই কাঁধে একখানি গামছা ফেলে সেদিকে চলে গিয়েছিল।

তারপর সেখান থেকে ফিরে 'আঃ বাঁচলুম' বলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাসমণির রান্নাঘরের সামনের রকে বসে পড়ে বলেছিল, 'একটা পান দেবে মা জননী? পান ফেলে এসেছি বাড়িতে।'

অগত্যা তাঁকে বলতে হ'ল,—'মেঝেতে বসলে মা! একটা আসন এনে দিক ঝি!'

জিভ কেটে মেয়েছেলেটি উত্তর দিলে, 'বাপ রে, আপনাদের আসনে বসতে পারি! আমরা নরকের কীট। অনেক জন্মের পাপ ছিল মা, এ জন্মে তাই এই সব ঘরে জন্মেছি, আবার কি বামুনের আসনে বসে পাপ বাড়াবো!'

নরম হয়ে আসে রাসমণির মন।

'তোমার নাম কি বাছা?'

'আমার নাম এককড়ি, মা। ছেলেবেলায় মা একটা কড়ি দিয়ে বেচেছিল। আমি ওদের থিয়েটারে য়্যাক্টো করি। বড় বড় পার্ট সব আমার মা—তোমাদের আশীর্ব্বাদে।'

হাত জোড় ক'রে নমস্কার করে সে।

বেশ দেখতেও। শ্যামবর্ণের মধ্যে দিব্যি ছিরি, মনে মনে ভাবে উমা।

'এইটি বুঝি তোমার মেয়ে, মা? কী নাম ভাই তোমার? উমা? আহা, উমাই বটে! কী রূপ!'

অমনি দু একটা কথার পর সেদিনের মত সে উঠল। কিন্তু অতঃপর আর ওদের দলকে বাধা দেওয়া গেল না। আরও দু-একজন অমনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে আসতে শুরু করল। রাসমণি যদিও সেই প্রথম দিনের পর উমাকে বারণ ক'রে দিয়েছেন—'খবদ্দার, ওদের সামনে থাকিস্ নি। ওরা নাকি সব বেশ্যে, বেশ্যে ছাড়া এ কাজ করতে আসেই বা কে! আমি বুড়োমানুষ—সে একরকম, তুই ওদের সঙ্গে কথা কইলে ভারি নিন্দে হবে পাড়ায়। উমা তবু ভেবে পায় না যে সাধারণ মেয়েদের থেকে ওদের তফাত কোথায়। ভারি মিষ্টি কথাবার্তা, যেমন ভদ্র তেমনি বিনয়ী। সবাই ওর মাকে মা ব'লে দূর থেকে প্রণাম করে, ছোঁয়া যাবার ভয়ে পায়ে হাত দেয় না। অনেকখানি ব্যবধান রেখে বসে সবাই, মেঝেতেই বসে, জল খেয়ে আসে কল থেকে, ওদের ঘটি পর্যন্ত চায় না। এদের সঙ্গে মেশায় দোষ কি তা কিছুতেই বুঝতে পারে না সে। বেশ্যা বলতে কি বোঝায় তা সে ভাল জানত না, কিন্তু ইতিমধ্যে ঝি পুঁটির মার কৃপায় মোটামুটি বুঝে নিয়েছে। শুনে তারও ঘৃণা হয় বটে তবে মানুষগুলোকে দেখে সে-ঘৃণা আর সে রাখতে পারে না।

এককড়ি আজকাল ঘন ঘন আসে। প্রথম দিন যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁর পরিচয় ওর মুখেই পেয়েছে উমারা। চন্দ্রশেখর মুস্তফী নাম, খুব নাকি ভাল অভিনেতা—শিক্ষকও ভাল। এককড়ি বলে, 'ভারি কড়া ম্যাস্টার। বেত হাতে ক'রে বসে থাকে রিয়েশ্যালে। পান থেকে চুন খসলেই অমনি বেত পড়ে ছুঁড়িদের পিঠে। আমাকে অবিশ্যি কিছু বলতে সাহস করে না—আমি আবার ওর যে গুরু তাঁর কাছে শিখি কিনা।—তিনি হ'ল আবার এখন আমার শখের পতি। তবে আমিও মুস্তফীমশাইকে খুব ভয় করি।'

আবার কোনদিন হয়ত বলে, 'ঠিয়েটার খুলুক—আমি মা তোমাকে একদিন দেখাতে নিয়ে যাবো। এই ত দু মাস পরেই খুলবে।'

রাসমণি প্রবল বেগে ঘাড় নাড়েন, 'ওমা ছি, থিয়েটার দেখতে যাবো কি!'

'তাতে কি হয়েছে মা, ঠাকুর-দেবতার পালাই ত বেশির ভাগ। এই ধরো না—সীতের বনবাস। আমি সীতে সাজব। আমার যে গুরু তিনি সাজবে রাম। দেখবে কেমন হয়!'

এমনি আরও বহু কথা অনর্গল বকে যায় সে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথাও অনেক বলে। সে যেন এক নতুন রাজ্য—মানুষগুলোও আর এক রকমের প্রাণী। সে সব কথা বলবার সময় এককড়ির গলা নেমে এলেও উমা তা শুনতে পায়। শোনে আর শিউরে ওঠে। অথচ একটা যেন অদ্ভুত আকর্ষণও অনুভব করে

—না শুনেও পারে না।

একদিন এককড়ি একটু অসময়েই এসে গেল।

তখন বেলা দেড়টা হবে, রাসমণি ওপরে বিশ্রাম করছেন আর পুঁটির মা ঝিয়ের একান্ত অনুরোধে উমা তার মেয়ে পুঁটিকে প্রথম ভাগ পড়াবার চেষ্টা করছে। নিচের দোর কি কারণে খোলাই ছিল, ঝি হয়ত সামনের বাড়ির ঝির সঙ্গে গল্প করতে গেছে দোর খুলে রেখে, তাই এককড়ি কখন নিঃশব্দে একেবারে সামনে এসে পড়েছে তা কেউ টের পায় নি।

উমা চমকে উঠল, কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময় এককড়ির।

সে গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে, 'ওমা, তুমি লেখাপড়া জানো বুঝি! ঐটুকু মেয়ে দিব্যি গড়গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে গা! ওমা কি হবে, কোথায় যাবো!'

ঈষৎ একটু গর্ব বোধ হয় বৈকি। আর তার সঙ্গে করুণাও।

'তু—আপনি বুঝি জানেন না?' উমা সসঙ্কোচে প্রশ্ন করে।

'মোটেই না। আমাদের কে-ই বা জানে! একজন দুজন। বাকী সবাই গো-মুখ্যু। মেয়েছেলে কে বা লেখাপড়া শিখছে—তা আবার আমাদের ঘরের কথা—!'

আড়াল থেকে শুনে শুনে এদের অনেক কথাই উমার জানা হয়ে গেছে, তাই সে প্রশ্ন ক'রে বসল, 'তা পার্ট মুখস্থ করেন কি ক'রে?'

'আমাকে আপনি-আজ্ঞে কেন করছ? তুমি বামুনের মেয়ে তায় সধবা, আমাদের মাথায় পা রাখলেও আমাদের জন্ম সাত্থক্ হবে।…হ্যাঁ, তা যা বলছিলুম, পাট? পাট মুখস্ত করি শুনে। ঐ একজন পড়ে যায়, আমরা শুনে শুনে মুখস্ত করি। মুখস্ত কি হতে চায়? হয় না।'

তারপর একটু দম নিয়ে খানিকটা পানদোক্তা মুখে পুরে বলে, 'মা কোথায়?'

'ওপরে শুয়ে আছেন।'

'ঘুমোচ্ছেন?'

'না—ভাল ঘুম কখনও হয় না ওঁর। বই-টই পড়েন। নয়ত এমনি শুয়ে থাকেন। আজ এমন অসময়ে যে?'

তুমি বা আপনি বলার দায়টা কৌশলে এড়িয়ে যায় উমা।

'ওমা—মাও লেখাপড়া জানেন বুঝি? ও, তাই তোমরা লেখাপড়া শিখেছ?'

'না—তা কেন? আমরা যে পাঠশালায় পড়েছি।'

এককড়ি ওপর উঠে গিয়ে চৌকাঠে বসে পড়ে।

'মা জননী কৈ গো?'

বই পড়তে পড়তে বোধ করি রাসমণির একটু তন্দ্রা এসেছিল, ওর ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলেন, 'ওমা, এসো এসো। ভেতরে এসে বসো না। ছি, চৌকাঠে বসতে নেই! তা এমন দুপুরে যে মেয়ে?'

'আজ একটা বাগানে যাবার বায়না আছে মা সন্ধ্যেবেলা, তাই দুপুরে রিয়েশ্যাল বসেছিল। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে কিনা—এখন গান গটানো হচ্ছে, আবার একটু পরে আমার ডাক পড়বে, তাই মা তোমার কাছে পালিয়ে এনু। বড্ড তেষ্টাটাও পেয়েছে।'

'আহা তা পাবে না, এই দুপুরবেলা ছোটাছুটি!'

রাসমণি উঠে দুটো নারকেল নাড়ু আর এক ঘটি জল দেন।

'জলটা আমার হাতে ঢেলে দিন মা।'

অপ্রতিভ হয়ে রাসমণি বলেন, 'না না—তুমি অমনি খাও। তাতে দোষ কি? তুমিও ত মানুষ!'

তবু সন্তর্পণে আলগোছে জল খেয়ে ঘটিটা এক পাশে নামিয়ে রাখে। তারপর একথা-সেকথার পর বলে, 'মা, একটা কথা বলব, বলো, রাগ করবে না?'

'না না—রাগ করব কেন? বলো না—'

'না মা। অপরাধ নিও না কিন্তু, সব দিক ভেবেই বলছি। তোমার মেয়ে উমা ত খুব লেখাপড়া শিখেছে—'

'খুব আর কৈ বাছা, ছাত্রবৃত্তি পাস করেছে।'

'ওমা—পাসও করেছে! তবে ত দিব্যি লেখাপড়া জানে!'

'ইংরিজি ত জানে না। আজকালকার মেয়েরা নাকি ইংরিজিও শিখছে কেউ কেউ।'

'তা ইঞ্জিরি চুলোয় যাক্। বলছিলুম কি, তোমার মেয়ে আমাদের লেখাপড়া শেখাবে? আমরা আট-দশটা মেয়ে শিখতে পারি। এক টাকা দু টাকা ক'রে যার যা ক্ষ্যামতা দেব, মাস গেলে পনরোটা টাকা আসবে হেসে খেলে। এক-সঙ্গেই শিখব, তাতে বেশি মেহনত হবে না। বড়জোর এক ঘণ্টা।'

দৃঢ়তরে সঙ্গে ঘাড় নাড়েন রাসমণি, 'না, সে হয় না। তাতে বড় নিন্দে হবে!'

'নিন্দে কিসের মা? লেখাপড়া শেখানোয় নিন্দে কিসের? তাছাড়া—' গলাটা একটু কেশে সাফ্ ক'রে নিয়ে এককড়ি বলে, 'তুমি ত দয়া ক'রে সবই বলেছ মা, আমার ত জানতে কিছুই বাকী নেই—এখন ত সারাজীবন পড়ে রইল মেয়েটার, তুমি চোখ বুজলে ও কি করবে তা ভেবে দেখেছ? হয় রাঁধুনীগিরি নয় ঝি-গিরি —নইলে বড়জোর বড় বোনের বাড়ি বিনে-মাইনের দাসীবিত্তি!'

রাসমণি বোধ করি একটু বিরক্তই হন এতটা অন্তরঙ্গতায়। ভ্রূ কুঁচকে বলেন, 'সে যা হয় হবে মা, কিন্তু এখন এই সোমত্ত মেয়েকে দিয়ে আমি টাকা রোজগার করাতে পারব না। তা ছাড়া তোমরা দশ-বারোজন দল বেঁধে রোজ সন্ধ্যেবেলা এখানে এলে—কিছু মনে ক'রো না—পাড়ার লোকে কি ভাববে?'

'বেশ ত, সন্ধ্যের পর না হয় গাড়ি পাঠিয়ে ওকে নিয়েই যাবো?'

এবার আর রাসমণির বিরক্তি চাপা থাকে না, তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে যাবে থিয়েটারে—তোমার আস্পদ্দাও ত কম নয় মা! এসব কথা আর কোন দিন যেন না শুনি।'

অপ্রতিভ ভাবে এককড়ি বলে, 'সে-ভাবে ঠিয়েটারে যাবার কথা ত বলি নি মা, তুমি মিথ্যে রাগ করছ। তাছাড়া—আগেই ত বলিয়ে নিয়েছি যে রাগ করতে পারবে না!'

রাসমণি শান্ত হন কিন্তু কথার উত্তর দেন না। অপমানবোধের চাপা ক্রোধ নিঃশব্দ-দহনে জ্বলতে থাকে তাঁর ভেতরে ভেতরে।

এককড়ি আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একসময় উঠে পড়ে।

কথাটা উমার কানেও গিয়েছিল, কারণ সে তখন সিঁড়ির মুখটায় দাঁড়িয়ে। এর তিন-চার দিন পরে সে সমস্ত সংকোচ এবং শঙ্কা বিসর্জন দিয়ে প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, 'আপনি ত সব কথাতেই না বলেন, কিন্তু সত্যিই আমার কি ব্যবস্থা করবেন তাই শুনি? আপনার যা পুঁজি, বড়জোর আর পাঁচ-সাত বছর এমন ক'রে বসে খেতে পারবেন। তারপর আপনি বা খাবেন কি আর আমিই বা দাঁড়াবো কোথায়?'

রাসমণি স্থির-দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'বেশ, তোমাকে তোমার শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসছি। তারপর তুমি যা খুশি তাই ক'রো।'

'কেন সেখানে যাব আমি? খুন হ'তে? আপনারাই ত দেখে-শুনে বিয়ে দিয়েছেন। তার দায় বুঝি আমার?'

'সে তোমার অদৃষ্ট!—আমরা ত চেষ্টার ত্রুটি করি নি।'

'তার বেলায় অদৃষ্ট!…এর বেলা অদৃষ্ট মানছেন না কেন? আমি না হয় খেটে খাবারই চেষ্টা দেখি।'

'তাই ব'লে তুমি ঐ থিয়েটারের বেশ্যে মাগীদের যাবে লেখাপড়া শেখাতে? তোমার দশ-পনের টাকায় আমার কী-ই বা স্বসার হবে?'

'দশ-পনেরো টাকা বিশ-পঁচিশ হ'তে কতক্ষণ! কাজটার অভ্যেস হ'ত। আর

দশ-পনেরো টাকায় একটা পেট বেশ চলে যায় মা।’

উমা যেন নিজের সাহসে নিজেই অবাক হয়ে যায়।

‘কিন্তু সে বয়েস এখনও আসে নি মা। রূপ-যৌবন বড় শত্রু। এত বড় শত্রু সঙ্গে ক’রে কি কাজই বা করতে যাবে? আর, কে বলতে পারে যে পাঁচ-সাত বছরে জামাইয়েরই মতিগতি ফিরবে না?’

সে আশা কি উমার মন থেকেই একেবারে গেছে!

সে চুপ ক’রে যায়। তার রূপবান তরুণ স্বামী—কন্দর্পকান্তি! সেই রূপের স্মৃতি যেন কামনার বাতাসে হতাশার ভস্মস্তূপের মধ্যে থেকে আশাকে সঞ্জীবিত ক’রে তোলে অনেক দিনের পর। মনের জমাট-বাঁধা স্তব্ধতা কোন্ এক অজানা দক্ষিণা-বাতাসে দূর হয়ে গিয়ে ওর দেহলতা কাঁপতে থাকে থর্‌থর্ ক’রে।

তিন

দিন-দুই পরে অকস্মাৎ একদিন চন্দ্রশেখর মুস্তফী স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। হাত জোড় ক’রে বললেন, ‘মা, আমার একটি নিবেদন আছে।’

কারণটা ঠিক অনুমান করতে না পারলেও কেমন একটা আক্রমণ আশঙ্কায় কঠিন হয়ে ওঠেন রাসমণি, ‘বলুন!’

‘আমি ব্রাহ্মণ, আপনার সন্তান। একটা কথা যদি বলি ত অপরাধ নেবেন না। এককড়ির কাছে সব শুনলুম। যদি আপনার কন্যা—আমার ভগ্নী এ কাজটি করতে পারে ত মহৎ দায় উদ্ধার করা হয়। আমি একটি আলাদা ঘর দেব। সে ঘরে পুরুষ কখনও ঢুকবে না—এ কথা দিচ্ছি। আমার ঝি এসে প্রতিদিন রাত সাতটা নাগাদ নিয়ে যাবে, ঘোমটা দিয়ে টুপ ক’রে চলে যাবে, কেউ অত লক্ষ্যও করবে না। আমি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকব—কেউ ওর দিকে মুখ তুলে চাইতে পর্যন্ত সাহস করবে না।…ওরা ন’জন পড়বে—দু টাকা ক’রে দেবে, এ থিয়েটার থেকে বারো টাকা ক’রে দিয়ে ঐ পুরো ত্রিশ টাকাই ক’রে দেব …আর মা, লোকে যদি জানতে পারে নিন্দে করবে? আমি ত সবই শুনেছি, কি ক্ষতি হবে তাতে মা, আপনার ত আর মেয়ে নেই যে বিয়ে দিতে হবে! সমাজের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?’

রাসমণি কিছুক্ষণ চুপ ক’রে থেকে বললেন, ‘কিন্তু আমার অন্য মেয়ে-জামাইরা আছেন—তাঁদের ত সমাজ আছে!’

‘এটা কলকাতা শহর মা। এখানে সমাজের শাসনই বা কি আর কে-ই বা এখানে কার কথা জানতে পারছে!’

'না বাবা—এসব কথা আর তুলবেন না। সে আমি পারব না।'

রাসমণি যেন অসহ্য একটা ক্রোধে জলে ওঠেন। এ উষ্মা ওঁর ভাগ্যের ওপর—এত ক'রেও কি অদৃষ্ট-দেবতার সাধ মেটে নি? আরও নিচে তাঁকে নামাবার জন্য এমন চক্রান্ত তাঁর?—প্রলোভনের জাল ক্রমেই রমণীয় ক'রে তুলছেন, ঘিরে ধরছেন চারিদিক দিয়ে।...রাসমণি পিছন ফিরে ওপরে চলে গেলেন, ইচ্ছা ক'রে মুস্তফীকে অপমানিত করার জন্যই।

কিন্তু আক্রমণ এখানেই থামল না।

আবার এককড়ি এল। নানা রকম যুক্তি, নানা প্রলোভন।

অবশেষে কমলা একদিন এসে সব শুনে বললে, 'পাঠিয়ে দিন মা, আর দু-মত করবেন না।'

'তুইও বলছিস্? জামাই কি ভাববেন যদি শোনেন?'

'সে আমি তাঁকে নিজে বলতে পারব, সে সাহস আছে আমার। এতে দোষ কি? অকারণ সমাজকে এত ভয় করেন কেন মা—সমাজ আপনাকে খেতে পরতে দেবে? পরের দয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে যে-কোন রকমে খেটে খাওয়া ভাল।'

'কিন্তু ঐ রূপের খাপ্‌রা মেয়েকে কোথায় পাঠাই বল্ ত?'

'ওখানে ত মুস্তফী মশাই ভাল প্রস্তাব করেছেন মা—রূপের খাপ্‌রা মেয়ে যদি খারাপ হয় ত আপনি পাহারা দিয়েই সামলাতে পারবেন? কত চোখে চোখে রাখবেন! তাছাড়া আমার বোনেরা তেমন নয় মা।'

আরও দু-চারদিন ভেবে—আরও অনুরোধ-উপরোধের পর রাসমণি দুর্বল হয়ে আসেন। একসময় সম্মতি দেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কিন্তু তারপর পুজোয় বসে তাঁর দু'চোখ জলে ভেসে যায়। ঠাকুর, এ কী করলে তুমি!

উমার বুক কাঁপে সারাদিন। অজ্ঞাত কি একটা আশঙ্কা, নাম-না-জানা কি একটা আশা। কিছুতেই স্থির হয়ে কোথাও বসতে পারে না, কিছু একটা ভাবতে পারে না মাথা ঠিক রেখে।

সন্ধ্যার কিছু আগে মনে হ'ল মাকে গিয়ে বলে, 'ও আমি পারব না মা—আপনি বারণ ক'রে দিন।'

কিন্তু নূতন আশা—কাজে ব্যস্ত থাকার আশা, অর্থ উপার্জনের আশা—এমনি নানা আশা এসে বাধা দেয়। সেই আশাই একসময় তাকে থিয়েটারের পদ্ম-ঝির পিছু পিছু অমোঘ, অপ্রতিহতবলে টেনে নিয়ে যায়। মাথায় ঘোমটা টেনে গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে অন্ধকারে কোনমতে যেন ছুটে পার হয়ে যায় রাস্তাটুকু—তবু মনে

হয় পাড়ার হাজার জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে লক্ষ্য করছে ও বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

থিয়েটারে পৌঁছে অবস্থা আরও খারাপ হয়। দু-চারজন চেনা কিন্তু বাকী সবাই এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে উমার মনে হয় তাদের সে দৃষ্টির আড়ালে একটা কৌতুকের হাসি আছে। যেন ওদের মনের ভাব নিঃশব্দে বলছে—আর কত দিন, শীগগিরই ত আমাদের দলে এসে দাঁড়াবে—দেরি নেই! ও ভদ্রতার ঔদ্ধত্য আর বেশী দিন রাখতে হবে না—ঢের দেখেছি আমরা!

তাছাড়া, মুস্তফী মশায়ের কড়া শাসন সত্ত্বেও দু-একটি পুরুষ উঁকি মারে এদিক ওদিক থেকে। তাদের দিকে না তাকিয়েও উমা বুঝতে পারে সেটা।

ঘেমে নেয়ে ওঠে উমা, বুকের মধ্যে কেমন করে ওর, হাত পা ঝিমিয়ে আসে।

মিনিট-কতক কোনমতে কাটিয়েই হঠাৎ কেঁদে ফেলে এককড়িকে বলে, 'আজ, আজ আমার বড্ড ভয় করছে দিদি, আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

এককড়ির চোখ করুণার্দ্র হয়ে ওঠে, 'বুঝেছি ভাই—অমন হয় প্রথম দিন। এতগুলো অচেনা লোক ত। তা আজ আর পড়াতে হবে না। একটু বসে গল্প করো বরং—।'

'না না—আমার বড্ড গা গুলোচ্ছে। আমাকে এখনি বাড়ি পাঠিয়ে দিন।'

এই বলে সে নিজেই বেরিয়ে পড়ে। উল্টো দিকে বেরোতে গিয়ে স্টেজে ঢুকে দড়াদড়ির গহন অরণ্যে দিশাহারা হয়ে ওঠে।

'অ পদ্ম, ছাখ কাণ্ডখানা! যা যা তুই শীগ্‌গিরি। এই যে বোন, এই দিকে এসো। আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি না হয়।' এককড়ি চেঁচাতে থাকে।

পদ্ম-ঝি ছুটে এসে একরকম উমার হাত ধরেই বাইরে নিয়ে আসে।

একটি মেয়ে এককড়িকে বললে, 'তোমার যেমন কাণ্ড দিদি, ও যে একেবারে খুকী—ওকে এখানে আনে কখনও?'

আর একজন চিমটি কেটে বললে, 'ওলো থাম্! অমন অনেক খুকী দেখেছি আমরা। এরপর এস্টেজে নেমে ধিতিং ধিতিং ক'রে নাচতেও ভয় পাবে না।'

এককড়ি তাকে ধমক দিয়ে ওঠে।

থিয়েটারের বাইরে এসেও উমা প্রথমটা যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর পদ্ম-ঝি যখন তার হাত ধরে আকর্ষণ ক'রে বললে, 'এই যে ইদিকে, অমন বোকার মত চারিদিকে চাইছ কি?' তখন যেন ওর সম্বিৎ ফিরে এল। নিজেদের গলিটা চিনতে পেরে সে হাতটা মুঠো থেকে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে একরকম ছুটেই বড় রাস্তা

পার হয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু ঠিক নিজেদের বাড়িতে ঢুকতে যাবে এমন সময় কে যেন পরিচিত কণ্ঠে পেছন থেকে বললে, 'শুনছ উমা, একটু শুনে যাও!'

চমকে কেঁপে উঠল উমা, হয়ত পড়েই যেত দেয়ালটা না ধরে ফেললে। খুবই সামান্য পরিচয় এ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে, তবু সমস্ত অন্তরে যেন এর প্রত্যেকটি সুর সদাজাগ্রত—হৃদয়ের তন্ত্রী এই সুরেই যেন বাঁধা হয়ে গেছে চিরকালের মত।

এ যে তার স্বামী—শরৎ!

উমা চোখ খুলে না তাকিয়েও তাকে চিনতে পারলে, উপস্থিতিটা অনুভব করতে পারলে—সারা দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে।

'তোমাকে এইমাত্র ঐ থিয়েটারটা থেকে বেরোতে দেখলুম যেন, এ কি সত্যি?'

এই সহজ প্রশ্নের অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন একটু অনুযোগ ছিল তাতেই উমার মন কঠিন হয়ে উঠল, এতক্ষণ তার গলা যেন বুজে আসছিল, এবারে পরিষ্কার কণ্ঠে জবাব দিলে, 'হ্যাঁ, কি হয়েছে তাতে?'

'শেষে তোমার এই দুর্গতি, ছিঃ!'

জ্বলে ওঠে উমা, 'তুমি ত আমাকে ত্যাগ করেছ, আমার চলবে কিসে তা কোনদিন ভেবে দেখেছ কি? বিধবা মা কোথা থেকে পুষবে আমাকে চিরকাল? তারপর মা গেলেই বা দাঁড়াব কোথায়?'

'তোমার কাছে আমার অপরাধ ঢের—তা সত্যি, বলবারও কোন হক হয়ত আমার নেই, তবু—তুমি থিয়েটারে নামছ—না, না, উমা এ আমি ভাবতেই পারি না। এ কাজ ক'রো না। ছিঃ!'

এই বলে শরৎ যেন একরকম ছুটেই অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ও যে এখানেই আসে নি, এটা যে আকস্মিক পথের দেখা তা উমা কল্পনা করে নি। তাই ভেতরে যাবার কোন আমন্ত্রণও জানায় নি। 'ভেতরে চলো—আজকের রাতটা থেকে যাও'—এ যে ওর সারা অন্তরের আর্ত কাকুতি, এ কি উনি জানেন না? অনাবশ্যক-বোধেই মুখে তা বলে নি উমা, বলবার অবকাশও পায় নি। তাই ব'লে উনি চলে গেলেন!

কত কথা যে ওঁকে বলবার আছে, কত ভিক্ষা আছে ওঁর কাছে চাইবার! বাঞ্ছিত আরাধিত দেবতা, হাতের কাছে এসে আবার কোন্ অনির্দিষ্ট কাল ও সীমাহীন স্থানের মধ্যে হারিয়ে গেল!

আর কি কখনও বলা হবে সে-সব কথা!

ওঁর অনুযোগটাও যে কত মিথ্যা, তাও ত জানানো হ'ল না!

এ কী হ'ল ওর, এ কী হ'ল!

আড়ষ্ট পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে উমা দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই, তেমনি একটা পা চৌকাঠে দিয়ে, এক হাতে দরজার কাঠটা ধরে, বহু—বহুক্ষণ ধ'রে। একটুখানি নড়বারও আর শক্তি নেই ওর।

নবম পরিচ্ছেদ

এক

সেদিন সমস্ত রাত ধরে জেগে অনুপস্থিত স্বামীকে উমা এই কথাটাই বার বার বলতে লাগল, 'বেশ করব যাবো। আমার যা খুশি করব। না—বরং তুমি বারণ করেছ বলেই করব। কেন, কেন তুমি আমাকে বারণ করবে? কি অধিকারে? আমাকে তুমি কোন্ অধিকার দিয়েছ? একদিনের জন্যও ত গ্রহণ করো নি—তবে কেন তোমার মান-মর্যাদা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব?'

এটা সে বোঝে নি যে তার অন্তরের মধ্যে স্বামীর অনুরোধ নিষেধাজ্ঞা রূপে মেঘমন্দ্র স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু অন্তরের অবচেতনে এটা বুঝেছে যে সে অনুরোধ অমান্য করার শক্তি তার নেই—সেই জন্যই বার বার সে নিজের মনেই এত আস্ফালন করছে। এ যে একেবারেই দুর্বলের স্পর্ধা—এটা বোঝবার মত আত্মবিশ্লেষণ-শক্তি তার ছিল না। কিন্তু সকালে উঠে নিজের কাছেই এটা স্বীকার করতে সে বাধ্য হ'ল শেষ পর্যন্ত। নিশীথ অন্ধকারে অনেক সময় মানসিক বৃত্তি-গুলোও বাহ্য প্রকৃতির মত অস্পষ্টতা বা জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—সূর্যোদয়ে তা আবার স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। উমাও নিজের মনের মধ্যেকার সত্যটাকে পরিষ্কার দেখতে পেলে। যে স্বামী একদিনের জন্যেও ওকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয় নি, যে স্বামী অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে ওর জীবনটাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে—যার কাছ থেকে নির্মম উপেক্ষা এবং যার আত্মীয়দের কাছ থেকে অবহেলাই মাত্র ও পেয়ে এসেছে—তারই অন্যায় ও অসঙ্গত অনুরোধও ওর কাছে অনুপেক্ষণীয়। শুধু নিজের অসহায় অবস্থার কথা মনে ক'রেই সকালবেলা ও কেঁদে ফেললে। সে অশ্রু ক্ষোভ ও অভিমানের—অদৃষ্টের ওপর অভিমান, অভিমান নিজের ওপরও বোধ হয়।

বিকেলবেলা পদ্ম-ঝি এল ডাকতে।

তার আগেই উমা মাকে বলে রেখেছিল—মা স্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'মা, তুমি মুস্তফী মশাইকে ওর নমস্কার জানিয়ে ব'লো যে ওর দ্বারা ও-কাজ হবে না, ওকে যেন তিনি মাপ করেন।'

ঝি আরও কি বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে রাসমণি বললেন, 'না না—রাজী হওয়াটাই ওর মস্ত ভুল হয়েছিল—অল্পেই সে ভুল ভেঙেছে, এই ভাল! গুরু রক্ষা করেছেন। আমি আর এ সম্বন্ধে কোন কথাও কইতে রাজী নই, তাঁকে বলে দিও।'

তাঁর মুখের রেখার দিকে চেয়ে পদ্ম-ঝির আর কোন কথা বলতে সাহস হ'ল না।

দুই

শ্রাবণের মাঝামাঝি রাসমণির বড়দি এসে হাজির হলেন। সঙ্গে তাঁর সেই অদ্বিতীয় ঘটিটি, আর বগলে খান তিনেক থান কাপড় গামছায় জড়ানো। এসেই বললেন, 'মরতে এলুম রে রাসু! তোর কাছে মরব—এ কথাটা বরাবরই মনে ছিল। মরার সময়ই মানুষের শেষ বাহাদুরি।...বলে—জপো তপো করো কি, মরতে জানলে হয়!... ভগবানকে ত তাই অষ্টপ্রহর বলি, জন্ম এস্তক ত আমার পেছনে লেগেছ— মরণটাতে আর জালিও না।...রাসুর কাছে যেন মরতে পারি—আর যার কাছে যাবো সে-ই আপদ-বালাই করবে।'

উমা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে। এই ত দিব্যি শক্ত-সমর্থ চেহারা। বয়স অবশ্য ষাট হয়েছে কি আরও বেশী, কিন্তু না পড়েছে একটি দাঁত—না পেকেছে বেশী চুল। বার্ধক্যের ছোপের মধ্যে—একটু যেন কোমরটা বেঁকেছে, কিন্তু সে সামান্যই। আর ত কোথাও একটা রোগের চিহ্নও নেই। এই লোক মরবে!

'অমন ক'রে চেয়ে আছিস কেন্ লা?' হেসেই জিজ্ঞাসা করেন বড় মাসিমা।

'আপনার কি অসুখ বড় মাসিমা?'

'অসুখ। এখন কিচ্ছু না। অসুখ হ'লে চলবে কেন? এতটা পথ কি তা'হলে আসতে পারতুম? ছিলুম ত মেজ ভাইপোর কাছে সেই মালদয়। এই রেল ইস্টিমার ক'রে দুদিন খাড়া উপোস দিয়ে আসছি।'

'তবে?' আরও অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করে উমা।

'কি তবে? মরবার কথা বলছি, তাই?...ও আমি টের পেয়েছি। ধানের চালের ভাত তেতো লেগেছে—আর আমি বেশী দিন বাঁচব না এটা ঠিক। বড় জোর ছ মাস।...হ্যাঁ, অসুখ একটা করবে বৈকি। যাহোক একটা হবে—হয় জ্বর হবে, নয় পেট ছাড়বে। নইলে দুটোই। তারপর ব্যস—ফেঁসে যাবো—অক্কা!'

রাসমণি মেয়েকে ধমক দিয়ে ওঠেন, 'আগে একটু পায়ে জল দে, নাইবার যোগাড় ক'রে দে, তা নয়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজে কথা!'

অপ্রতিভ উমা তাড়াতাড়ি একঘটি জল এনে আলগোছে পা ধুইয়ে দেয়। মাথায়

দেবার তেল এনে বাটি ক'রে রাখে চৌবাচ্চার পাড়ে। তারপর রাসমণির একটা ফরসা কাপড় এনে হাতে ক'রে দাঁড়ায়। বড় মাসিমা সঙ্গে যে কাপড় এনেছেন তা ফেলে এসেছে—সবই কেচে দিতে হবে।

চান ক'রে উঠে কাপড় ছাড়ছেন তিনি, উমা আবারও প্রশ্ন করে ফিস্‌ফিস্ ক'রে—'আচ্ছা, মা ছাড়া যদি আর কেউ যত্ন করবেন না জানেন ত মা'র কাছেই থাকেন না কেন ? এই বয়সে এখান ওখান ঘোরেন কেন ?'

'আমি কি এত বোকা রে !' চতুরের হাসি ফুটে ওঠে ওঁর মুখে, 'আমার স্বভাব জানি, যেখানেই কিছুদিন থাকব তারাই ত জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে যাবে। এইটে হ'ল আমার মরণকালের আস্তানা, একে কি চটিয়ে রাখতে পারি, তাহলে মরবার সময় দাঁড়াবো কোথা, দেখবে কে ? শেষ আশ্রয় কি নষ্ট করতে আছে রে ? চিরদিন থাকলে যত রাগ জমা হয়ে থাকে—মরণকালে তার সব শোধ নেবে। উঁহু, সে বান্দা আমি নই !'

বলেন আর হাসেন আপন মনে।

উমা বড় মাসিমাকে পেয়ে যেন বেঁচে গেল। তবু যাহোক একটা কাজ পেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, দফায় দফায় সেবা যোগায় এবং কারণে অকারণে বকুনি খায়। তাও যেন ভাল লাগে উমার। একান্ত নিষ্ক্রিয়তার চেয়ে এ-ও ভাল। তা ছাড়া সে যেন নিজেকে দিয়ে বুঝেছে বড় মাসিমার কষ্টটা—তাঁর অন্তরের জ্বালাটা। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে যেন পাগল হয়ে উঠেছে, আর বড় মাসিমা দীর্ঘ এত কাল সহ্য করছেন। অন্তরে যে অনির্বাণ আগুন জ্বলছে তার তাপ কিছু উদ্‌গারিত হবে বৈ কি।

রাসমণিও তা বোঝেন। তবু এক এক সময় অসহ্য হয়ে ওঠে। রান্নাঘরের চৌকাঠ চেপে বসে যে বিষ বড়দি ঢালতে থাকেন, একেবারে নীলকণ্ঠ না হ'লে তা সহ্য করা শক্ত। সুতরাং সেই সব অসহ অসতর্ক মুহূর্তে দুজনায় ঝগড়া বেধে ওঠে। রাসমণি কথা বলেন কম—যা বলেন তা কিন্তু মর্মান্তিক। বড় মাসিমা একেবারে জ্বলে ওঠেন—চেঁচিয়ে গালাগালি দিয়ে লাফিয়ে কেঁদে-কেটে পাগলের মত হয়ে ওঠেন। খানিকটা চেঁচাবার পর ও-পক্ষ থেকে সাড়া না এলে তর্‌তর্ ক'রে হয়ত ঘটিটা নিয়ে নেমে আসেন। সে সময় উমার মনে হয় রাগ ক'রে বুঝি চলেই যাবেন। কিন্তু তা তিনি যান না, সদরের কাছে গিয়ে ধপাস্ ক'রে বসে পড়েন, আপন মনে খানিকটা কাঁদেন বিনিয়ে বিনিয়ে—তারপর আবার উঠে আসেন। বলেন বোনকে উদ্দেশ ক'রে, 'ভেবেছিস্ এমনি জ্বালাবি আর আমি চলে যাবো ! কোথাও যাবো

না, গেলে আমার চলবে কেন ? মরবার কালে সেবা খাব, মরব, তবে বেরোব এ বাড়ি থেকে !'

ভাদ্রের শেষে সত্যি-সত্যিই বড়মাসিমা শয্যা নিলেন। প্রথমে জ্বর, তারপর পেট ছাড়ল। দুটোই চলল সমানে। রাসমণি দিন তিনেক দেখে ডাক্তার ডাকতে পাঠালেন। বড় মাসিমা জানতেন না, ডাক্তার আসতে সেই জ্বরের ঘোরেই উঠে বসলেন তড়বড় ক'রে, 'হ্যালা রাস্থ, তোর মতলব কি ? আমাকে বিনা চিকিচ্ছেয় মেরে ফেলবি ?'

রাসমণি অবাক্।

'তাই ত ডাক্তার ডেকেছি বড়দি !'

'বেশ করেছ, কেদাত্ত করেছ একেবারে। চারকাল পেরায় গিয়ে সিকিকালে ঠেকেছে, কখনও যা করলুম না—তাই করব, ঐ মড়াকাটা ডাক্তারের ওষুধ খাব ! ডাক কবরেজ্‌কে ?'

কবিরাজ এসে নাড়ী টিপে বললেন, 'জ্বরাতিসার।'

তাঁকেও ধমক দিলেন বড় মাসিমা, 'সে ত ঐ দুধের বাচ্ছা মেয়েটাও জানে। জ্বর আর অতিসার হ'লে জ্বরাতিসারই হয়।...'

কবিরাজ সান্ত্বনা দিয়ে বলতে গেলেন, 'ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবেন।'

'ছাই হবো ! তুমি যা পণ্ডিত তা বুঝে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ না যে, মরণ-রোগ ধরেছে। তার জন্যে নয়, ভালো আমি হবো না—তবে তুমি ওষুধ দাও। ওষুধ খাবো না কেন ! মরব বলে কি আর বিনা চিকিচ্ছেয় মরব ?'

দিন দশেক পরে খুবই বাড়াবাড়ি হ'ল। ক্রমশঃ হাত-পা ফুলতে শুরু হ'ল।

পুজোয় ষষ্ঠীর দিন ভোরবেলা বোনকে ডেকে বললেন, 'বেশীদিন আর ভোগাতে পারলুম না রে ! অল্পে অল্পে বেঁচে গেলি !'

রাসমণি না বুঝে চেয়ে থাকেন ওঁর দিকে।

'বুঝতে পারলি না ? ডাক এসেছে। লোকজন ডাক্—গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা কর্।'

উমা কিছুই বুঝতে পারে না। মৃত্যু কি মানুষ এমনি ক'রে আগে থাকতে বুঝতে পারে ? এমনি নিঃসংশয়ে এত নির্ভয়ে তার সম্মুখীন হয় ?...তার চোখে জল ভরে আসে, এই দুর্মুখ কলহপরায়ণা বৃদ্ধার জন্যও—সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে মন শিউরে ওঠে, তারও কি তাহলে এই পরিণাম ?

কমলাকে খবর দিতে বড় জামাই এলেন, আরও লোকজন জড়ো হ'ল। খাটে তোলবার সময়ও বড় মাসিমা—যারা তুলছিল তাদের অনবধানতার জন্য তিরস্কার

করলেন। ঘটিটা দিয়ে গেলেন বোনকে, বললেন, 'সব বন্ধন মুক্ত হয়ে যেতে হয়—নইলে আবার কি ফিরে আসব? তা বন্ধনের মধ্যে ত ঐ ঘটিটা—তুইই নিস রাসু। ব্যস্—এইবার আমার ছুটি। গঙ্গা, গঙ্গা—হরিবোল হরিবোল!'

সমস্ত পথটা ইষ্টনাম জপ করতে করতে গেলেন। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে একবার খাটসুদ্ধ জলের ধারে নামানো হ'ল, রাসমণি জল দিলেন মুখে—সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে। গঙ্গামৃত্তিকা নিয়ে কপালে বুকে লেপে দিলেন। বড় মাসিমা চোখ বুজেই পড়ে ছিলেন, এই সময় শুধু একবার বললেন, 'পেটটা—পেটটাও লেপে দে। আহা—ঠাণ্ডা হোক্। বড় জ্বলছে।'

তারপর ওঁকে এনে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে রাখা হ'ল। তখন নিমতলার ঘাটে এই ঘরটির অবস্থা ছিল শোচনীয়। ভাঙা ঘর, কোন দিকে দোর নেই—বৃষ্টির জল বাইরের চেয়ে ভেতরেই বেশি পড়ে। সে নির্জন শ্মশানের মধ্যে ভাঙা ঘরের আবহাওয়া দিনের বেলাই থমথমে, ভয়াবহ। তবু সেখানে রাখা ছাড়া উপায় কি? যারা এনেছিল তারা স্নান ক'রে চলে গেল। রাসমণি একা রইলেন ওঁকে নিয়ে। কথা হ'ল বড় জামাইয়ের চাকর মধ্যে মধ্যে এসে খবর নিয়ে যাবে। তিনি নিজে সকাল বিকেল আসবেন।

বড় মাসিমা ঘরে আসার পর মাত্র একটা কথাই বলেছিলেন, 'গঙ্গাতীরে আর কোন নোংরা কাজ করব না রাসু—তুই নিশ্চিন্তি থাক্। তবে প্রাণটা বেরোতে যা দেরি!' তারপরই অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সেই ভাবেই সারাদিন কাটল। বিকেলে আরও দু-একজন এলেন খোঁজ করতে। একজন মহিলা বললেন, 'পাট করো, পাট করো—নইলে কড়ে রাঁড়ী সহজে মরবে না!' পাট করার অর্থ—ডাব পান্তাভাত ঘোল এই সব খাওয়ানো। গঙ্গাযাত্রার এই বিধি—যেমন ক'রে হোক মেরে ফেলা। এ রুগী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নেই।

কিন্তু রাসমণি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'বোল হ'রে গেছে, দাঁতি লেগেছে। খাওয়াবো কাকে? ডাব কিনে দিয়ে যাও, পারি ত ঐ একটু মুখে দেবো।'

সন্ধ্যার পর থেকে যেন প্রলয়ের বর্ষা নামল। সারারাত চলল অবিশ্রাম বর্ষা। জল প'ড়ে রাসমণি নিজেও ভিজলেন, মুমূর্ষুও ভিজতে লাগল। কোথাও এমন একটু শুকনো জায়গা নেই যেখানে সরে যান। আলোর মধ্যে একটা ছোট প্রদীপ—সেটাও বাইরের হাওয়ায় বার বার নিভে যাচ্ছে। দেশলাই জ্বলে না। তখন রাসমণি প্রাণপণে প্রার্থনা করছেন যে অন্তত কেউ মড়া পোড়াতেও আসুক। কিন্তু সে দুর্যোগে কেউ মড়া নিয়েও বেরোতে সাহস করলে না। একা সেই অন্ধকারে অচৈতন্য মৃত্যুযাত্রিণীকে নিয়ে সেই ভাবেই কাটালেন সারারাত।

উমাকে আগলাবার জন্য কমলা এসে এ বাড়িতে ছিল। সে আর উমা দুজনেই ঘুমোতে পারল না। এই অন্ধকার দুর্যোগের রাতে মা একা শ্মশানে বসে আছেন মনে ক'রে উমা নিজেই ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল।

সপ্তমীর দিন সকালেও জল থামল না। তেমনি হু-হু বাতাস, মেঘের গুরু গুরু শব্দ আর অবিশ্রাম মুষলধারে বর্ষণ। এরই মধ্যে উমা এবং কমলা গাড়ি ডেকে গিয়ে হাজির হ'ল শ্মশানে। বুড়ী তখনও আছে। নাভিশ্বাস উঠেছে, হয়ত শীগগিরই মরবে। রাসমণি ওদের তিরস্কার করলেন, 'তোরা কি করতে এলি! যা, গিয়ে চান করে ফেলগে যা!'

বড় জামাই এলেন। তিনিও চলে যেতে বাধ্য হলেন খানিক পরে। আবার সেই একা। গঙ্গার জল কূলে কূলে ভরে উঠেছে, হয়ত বা কূল ছাপিয়েই উঠবে। দুশ্চিন্তায় সকলের মুখেই ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল। কিন্তু উপায় কি? তীরস্থ যাত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে নেই।

সারাদিন পরে সন্ধ্যায় বর্ষণের বেগ কমল কিন্তু বন্ধ হ'ল না। বরং ঝড়ের বেগ বাড়ল আরও। ফাঁকা ভাঙা ঘরে আলো জ্বালার চেষ্টাও করলেন না রাসমণি। আগের রাতের মতই অন্ধকারে বসে একমনে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। সারাদিন কিছুই খাওয়া হয় নি; স্নান ক'রে উঠে—জলে দাঁড়িয়েই একটা ডাব খেয়েছিলেন মাত্র। বড়দিকেও কিছু খাওয়ানো যায় নি, ডাবের জল দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল।

অষ্টমীর দিন শেষরাত্রে সেই নাভিশ্বাস কণ্ঠে এসে পৌঁছল, নবমীর দিন প্রত্যূষে শেষ। তিনদিন তিনরাত্রি একভাবে একা সেই ভাঙা ঘরে নাভিশ্বাস-ওঠা রোগিণীর সঙ্গে কাটালেন রাসমণি। তখন তাঁর মুখ দেখে কোন চিত্ত-বৈলক্ষণ্য বোঝা যায় নি কিন্তু পুড়িয়ে স্নান ক'রে বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সে মূর্ছা ভাঙল দু-তিন ঘণ্টা পরে।

তিন

বড় মাসিমার মৃত্যু উমাকে নতুন ক'রে ভাবিয়ে তুললে। বড় মাসিমার স্বভাবটাও সে লক্ষ্য করেছিল। যে জ্বালা ছড়ায় সে আগে জ্বলে। আগুনে তাঁর সমস্ত অন্তর পূর্ণ ছিল। ঐ আগুন কি তার অন্তরেও জ্বলছে না? এখনও ইন্ধন কাঁচা, তাই সে অগ্নি আছে সঙ্গোপনে, কিন্তু এই ব্যর্থতার বাতাস যদি তাতে অবিরত লাগে তবে একদিন কি দশা হবে! বড় মাসিমার তবু আত্মীয়স্বজন ছিল—দাঁড়াবার জায়গাও ছিল—তার যে দুটি অন্নের জন্য ভিক্ষা করতে হবে।

আর ঐ অবস্থা !

সকলে ধিক্কার দেবে, বিদ্রূপ করবে—সকলে চাইবে এড়িয়ে চলতে।

না—তার আগেই উমা খুঁজে নেবে তার সার্থকতার পথ।

আজকাল উমা প্রায় সারাদিন এবং সন্ধ্যায়ও অনেকখানি কাটায় তাদের ছাদের এক কোণে—যেখানটা থেকে ওদের গলিটার মোড়ে বড় রাস্তার একফালি দেখা যায়, নতুন থিয়েটার-বাড়ির সামনেটা।

ওর বিশ্বাস সেদিন সন্ধ্যায় যে শরৎকে দেখা গিয়েছিল, সেটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়—নিশ্চয় এ রাস্তা দিয়ে সে যাতায়াত করে। আর এক দিনও যদি দেখতে পায় ত ঝিকে পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনাবে। একবারও কি তিনি আসবেন না—পাঁচ মিনিটের জন্যেও ? অন্তত তাঁর ভুলটা ত সে ভাঙিয়ে দিতে পারবে। তাঁর সেদিনের ভুল বোঝাটা কাঁটার মত বিঁধছে উমার অন্তরে—দিনরাত্রিকে বিষাক্ত ক'রে দিয়েছে সেই একটিমাত্র ধিক্কারের স্মৃতি।

কিন্তু চেয়ে থেকে থেকে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, রোদে আর ঝাঁজে মাথা ধরে ওঠে প্রত্যহই—তার প্রতীক্ষার শেষ হয় না। একদিন রাসমণি বকলেন খুব, 'অমন ক'রে ছাদে দাঁড়িয়ে থাকিস্ সোমত্ত মেয়ে, পাড়ায় ডবগা ছেলের অভাব আছে কিছু ? শেষে একটা দুর্নাম উঠবে যে!'

উমা ম্লান হেসে জবাব দিলে, 'আমার আর সুনাম দুর্নাম কি মা ! আপনাদের যদি কিছু অসুবিধে হয় সে আলাদা কথা। সে রকম দুর্নাম যেদিন উঠবে সেদিন একগাছা দড়ি কিনে দেবেন, তাহ'লেই বুঝব। শেষ ক'রে দিয়ে যাব সব জ্বালা আপনাদের।'

এ কথার পর রাসমণি আর কিছু বলতে পারেন নি। এর মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে যে প্রচ্ছন্ন অভিযোগ ছিল তা তিনি অস্বীকার করেন কি ক'রে ?

দুর্নাম কিছু রটেছিল—কেন না অমন ক'রে বড় রাস্তার দিকে চেয়ে অতবড় মেয়ের সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকাটা আদৌ শোভন নয়। বিশেষ ক'রে যে মেয়েকে স্বামী নেয় না—তার। কিন্তু রাসমণির একটা সুবিধা ছিল যে পাড়ার কারও সঙ্গে তিনি মিশতেন না। সে দুর্নাম কানে আসার সম্ভাবনা ছিল কম।

দিন সপ্তাহ মাস কেটে যায়—প্রতীক্ষার একাগ্রতা ক্ষুণ্ণ হয়, অন্তরের অগ্নি ওঠে দীপ্ততর হয়ে।...

উমা একদিন মাকে এসে বললে, 'মা, আমি যদি থিয়েটারই করি, ক্ষতি কি ?'

রাসমণি তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তার মানে ?'

আগে হ'লে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উমা ভয় পেত কিন্তু আজ আর পেল না, বললে,

'আমাকে ত একটা কিছু করতে হবে। মানুষের জীবন-মৃত্যুর কথা কে বলতে পারে —আপনার হঠাৎ কিছু হ'লে কোথায় দাঁড়াব আমি?'

রাসমণি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আজকাল তুমি বড় বেশি নিজের ভবিষ্যৎ ভাবছ উমা! সেই সঙ্গে আমার মৃত্যু!'

'ভাবাই ত উচিত মা। অপর কেউ ভাববার থাকলে আমি ভাবতুম না। আর মৃত্যু ত অবধারিত, তার জন্যে সঙ্কোচে চুপ ক'রে থাকার কোন মানে হয় না।'

সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত সঙ্কোচ যেন কোথায় ভেসে চলে যায় উমার। কোথা থেকে এতখানি মনের বল সে পায় তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

খানিক পরে রাসমণি চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তেমন যদি হয় কমলা কি তোমাকে ভাসিয়ে দেবে?'

'না, তা হয়ত দেবে না। কিন্তু সেখানে কি ভাবে আমি থাকব? আমি ত আগেই বলেছি আপনাকে, হয় গলগ্রহ হয়ে লাঞ্ছনার ভাত খেতে হবে নয়ত বিনা মাইনের দাসীবৃত্তি করতে হবে।'

'কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি নেওয়ার থেকে সেটাও বাঞ্ছনীয় নয় কি?'

'যে যেমন ভাবে মা। বেশ্যাদের সঙ্গে মিশলেই যে বেশ্যাবৃত্তি নিতে হবে তার ত কোন মানে নেই। তাছাড়া উপায়ই বা কি।'

তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে, যেন চরম সাহসে ভর ক'রে বলে, 'আর এক উপায় আছে—মুসলমান হয়ে আর একটা বিয়ে করা—কিন্তু তাতেই যে আমি সুখী হবো তারও ত ঠিক নেই। কোন অবস্থাতেই আপনি আর আমাকে ঠাঁই দিতে পারবেন না তা জানি—তবে এ-ও আপনাকে বলে দিচ্ছি মা, আপনি যদি অন্য পথ আমাকে দেখাতে না পারেন ত থিয়েটারেই আমাকে যেতে হবে। বড় মাসিমার মত হুতাশন হয়ে থাকতে পারব না। সুখ না পাই, স্বাধীন ভাবে বাঁচবার পথ ত পাবো।'

রাসমণি আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকেন ওর কথা শুনে।

এত সাহস যে উমার হবে—এমন কথা ওঁর মুখের ওপর বলবে তা তিনি কোন-দিন স্বপ্নেও ভাবেন নি—কিন্তু সত্যিই যখন বললে তখন ভৎর্সনা করবারও শক্তি রইল না তাঁর। মেয়ে যে কি জ্বালায় জ্বলে এতখানি ধৃষ্ট হ'তে পেরেছে তা মায়ের প্রাণে উপলব্ধি ক'রে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

চার

তিন-চারদিন কেউ কারও সঙ্গে কথা কইলেন না। সে এক বিচিত্র অবস্থা। একটা দোতলা বাড়িতে ঝিকে নিয়ে তিনটি প্রাণী। ঝির সঙ্গে দু'একটা কথা হওয়ায় যা কিছু শব্দ হয় এ বাড়িতে। তাও সে দুবেলা অন্য বাড়িতে ঠিকে কাজ করতে যায়, সে সময় মনে হয় বাড়ি সম্পূর্ণ খালি।

এই গুমোট আবহাওয়া যখন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে—অকস্মাৎ শ্যামা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে হাজির হ'ল একদিন।

প্রথমটা ওরা কেউ চিনতে পারে নি।

তারপর উমা ছুটে এসে শ্যামাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল, রাসমণি দু'-হাতে নিজের কপালে কঠিন আঘাত করতে লাগলেন।

যেন দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে এসেছে ওরা,—মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ-অবতার!

কঙ্কালসার চেহারা, রুক্ষ চুল—জট পাকানো, ময়লা ছেঁড়া কাপড়। অমন দুধে-আলতা রং পুড়ে কালি হয়ে গেছে একেবারে। ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখলেও আঁতকে উঠতে হয়, হেমটা ত রীতিমত ধুঁকছে। মনে হয় প্রাণশক্তি কে নিংড়ে বার ক'রে নিয়েছে ওদের মধ্যে থেকে।

'এ কি অবস্থা রে তোর! এমন হ'ল কি করে? আমাদের চিঠি লিখতে পারিস নি।' এক নিঃশ্বাসে উমা প্রশ্ন করে।

শ্যামার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'একটু বসি আগে। এক ঘটি জল দে। সারা পথ হেঁটে এসেছি—এই চার ক্রোশ পথ। তার ওপর কোলে মেয়ে। আমি আর পারছি না—'

উমা তাড়াতাড়ি শরবৎ ক'রে এনে দেয়। দুধ গরম ক'রে এনে ছেলেমেয়ে দুটোকে খাওয়াতে বসে।

শ্যামা তখন শুয়ে পড়েছিল নিচের রকেই। ওরই মধ্যে হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল, 'একটু জল মিশিয়ে নে, একটু জল মিশিয়ে নে,—নইলে যে পেট ছেড়ে দেবে! কদিন উপোসের পর খাঁটি দুধ খেতে পারে? এক ভাগ দুধ তিন ভাগ জল—'

নিজেরই করাঘাতে রাসমণির কপাল ফুলে উঠেছিল এর মধ্যে। তিনি এইবার নিঃশব্দে উঠে রান্নাঘরে চলে গেলেন। মেয়ের এ অবস্থা কেন হ'ল তা প্রশ্ন করবারও প্রবৃত্তি ছিল না তাঁর।

অবশ্য শ্যামা নিজেই ক্রমশঃ সব বললে। বলবার কিছুই নেই। মধ্যে মধ্যে নরেন যেমন ডুব মারে তেমনি—এবার বেশিদিন ডুব মেরেছে। ঠিকে পূজারী পুজো

ক'রে আগে শুধু সকালের চাল নিত, এখন বিকেলের দুধটাও নেয়। বলে, 'তোমরা ত মিছিমিছি ঘর জোড়া ক'রে রেখেছ। কাজ আমি করব ষোল আনা, তোমাদের ভাগ দেব কেন?' প্রথম প্রথম সরকার-গিন্নী বা পাড়ার লোক দয়া-ধর্ম করত, এখন কেউ খবর পর্যন্ত নেয় না, সাহায্য করবার ভয়ে। যা সামান্য সোনা-রূপো ছিল তা গেছে, বাসন-কোসনসুদ্ধ বাঁধা পড়েছে, তারও পরে সাতদিন উপবাসে কাটিয়ে আজ মরীয়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছে শ্যামা। ঘরে চাবি দিয়ে এসেছে, তাও ফিরে গিয়ে দখল পাবে কিনা সন্দেহ! ইত্যাদি···

বিকেলে খাওয়া-দাওয়া সারা হয়েছে, রাত্রের আর ঝঞ্ঝাট নেই। উমা ছাদে শুয়েছে মাদুর পেতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ঝি বাইরের কাজ সেরে আসতে শ্যামাই গেছে তাকে ভাত বেড়ে দিতে। ঝি খেতে খেতে গল্প করছে, তাদের কথা বলার একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন কানে আসছে। রাসমণির কোন দিকে মন ছিল না। তিনি সারা সন্ধ্যাটাই অন্ধকার ঘরে কেমন স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বসে ছিলেন—এমন সময় শ্যামার তীব্র কণ্ঠস্বর কানে গেল, 'মা, এসব কি শুনছি?'

চমকে উঠলেন রাসমণি, 'কেন, কী হয়েছে? কী শুনেছিস?'

গলাটা খানিক নামিয়ে অথচ বেশ তীক্ষ্ণকণ্ঠেই শ্যামা বলে, 'উমি নাকি থিয়েটারে যাচ্ছে—ও নাকি থিয়েটার করবে?'

ওর বলার ধরনে রাসমণি চটে উঠলেন, 'বেশ ত, কী হয়েছে তাতে?'

'তাহ'লে ত আর আমার এক দণ্ডও এ-বাড়ি থাকা হয় না। এই মুহূর্তে চলে যেতে হয়। আমার স্বামী শুনলে আমার আর মুখ দেখবেন না।'

রাসমণি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি ত তোমাকে এরে-বেরে আনতে যাই নি মা, যে, তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ! তোমার স্বামীর আশ্রয়েই যাও না—'

'সে যাই হোক্ মা, সে-ই আমার আশ্রয়। এই শিক্ষাই ত এতকাল দিয়েছেন। আমি এখনই যাবো—'

উমা ছুটে এসে ওর দুটো হাত চেপে ধরলে, 'তুই কি পাগল হলি রে! আগে সব কথা শোন্—'

'না ভাই, ঢের শুনেছি। তুই ছাড়্—'

'অবুঝ হ'সনি ছোড়দি, শোন্—তোর দু'টি পায়ে পড়ি—'

শ্যামাকে সে ছাদে টেনে নিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বলে। তখন খানিকটা সুস্থ হয় শ্যামা। কিন্তু বলে, 'ভাই, তুই যদি এ কাজ করিস, মা তোকে ত্যাগ করতে পারবেন না—তাহ'লে আমার আর-এই সময়ে-অসময়ে এসে দাঁড়াবার

আশ্রয়ও থাকবে না। ছিল, তাই ছেলেমেয়েগুলো বাঁচল—নইলে সত্যিই শুকিয়ে মরত।',

উমা চুপ ক'রে রইল, একটা বিদ্রোহ, একটা অভিমান আকণ্ঠ ফেনিয়ে উঠছে ওর।

খানিক পরে বললে, 'তোর আশ্রয়ের কথাই ত ভাবছিস, আমার কথা ভেবে দেখেছিস!'

শ্যামা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'আমার কথায় তুই রাগ করিস নি উমি, কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে যত নির্যাতনই হোক্, স্বামী যেমনই হোন—সেইখানটা মেয়েমানুষের আগে। তোর উচিত পায়ে-হাতে ধরে সেখানেই যাওয়া। ভদ্রঘরের মেয়ে থিয়েটারে যাবে কি—ছি! এই দেহটাই কি এত বড়?…না ভাই, সে হ'লে আমাদের আর সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে না। শ্বশুরবংশের নামে আমি কালি মাখাতে পারব না।'

বড় মাসিমার বুকের আগুনের খানিকটা আন্দাজ পায় কি উমা?

অন্ধকারে শ্যামা দেখতে পায়না কি বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে উমার মুখে। স্বামীকে যদি একেবারেই না পেত শ্যামা, তাহ'লে কেমন ক'রে এ কথা বলত সে—তাই বুঝতে চায় উমা। শ্বশুরবংশের প্রতি এ প্রীতি থাকত কি না!

শ্যামা আবারও বলে, 'না না, বুঝছিস না! ছেলেমেয়ে বড় হবে, তাদের একটা পরিচয় আছে—আমার কথাটা ভাব্ একবার!'

তা বটেই ত।

উমা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে গিয়ে বলে, 'ভয় নেই তোর, তোদের আশ্রয় আমি নষ্ট করব না। যা, তুই শুতে যা—এদের নামিয়ে নিয়ে যা।'

'আর তুই?'

'আমার দেরি আছে।'

অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রে, সেই তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণপণে যেন শুধু জীবনের সম্বল খোঁজবার চেষ্টা করে উমা। ওর অন্তরের বেদনা চারিদিকের নৈঃশব্দ্যসাগরে কিসের ঢেউ জাগায় কে জানে!

প্রহরের পর প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ওপরে জাগে উমা, নিচে জাগেন রাসমণি।

দশম পরিচ্ছেদ

এক

দিন-পনরোর বেশি থাকতে সাহস হ'ল না শ্যামার। মুখে সে ঘরের অজুহাতই দেখায়, 'কি জানি মা, মুখপোড়া চক্কত্তী যদি জোর ক'রে তালা ভেঙে এসে ঢোকে—সেই ভয়!' কিন্তু আসল ভয় তার অন্যত্র—সেটা উমা বুঝতে পারে। নরেন যদি ইতিমধ্যে এসে ফিরে যায়—আর যদি কোনদিন না ফেরে—রাগ ক'রে চলে যায় চিরকালের মত—এই ভয়ই ওর সবচেয়ে বেশী। একদিন উমা সেই প্রসঙ্গটা স্পষ্টই তুললে, বললে, 'অত ভাবিস নি, জামাইবাবু এসে যদি দেখেন ঘরে চাবি দেওয়া ত বুঝতেই পারবেন এখানে এসেছিস্—চলে আসবেন সোজা।'

'হ্যাঁ—তার ভাবনায় ত আমার ঘুম হচ্ছে না। তুইও যেমন। তা নয়—ঘরটার জন্যেই। আশ্রয় চলে গেলে কোথায় দাঁড়াব বল্!'

উমা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলে, 'যদি তার ভাবনাই না থাকে ত অত ভাবছিস কেন, আর সেখানে উপোস করতেই বা যাবি কেন? এখানেই থাক না—দুজনে থাকলে তবু সুবিধে, যা হয় ক'রে চালাব। না হয় দু বোনে পৈতে কাটব, ঠোঙা গড়ব—তাতেই দুটো ছেলেমেয়ে মানুষ হয়ে যাবে।'

'বাপ রে!'—শিউরে ওঠে শ্যামা, 'অমন কথা মুখে উচ্চারণ করিস নি ভাই, স্বামীকে ছেড়ে চিরকাল বাপের বাড়ি দাসীবিত্তি করা, সে আমি পারব না। বাপ থাকতে ছেলেমেয়েগুলোকে পিতৃপরিচয়ে বঞ্চিত করলে এর পর ওরা কি বলবে! তার চেয়ে সেখানে উপোস ক'রে পড়ে থাকাও ভাল। আর ক'টা দিন গেলে, ছেলেটা আট বছরের হ'লেই পৈতে দিয়ে দেব যেমন ক'রে পারি—তারপর ত আর ভাবনা নেই। ও ঘরটা ত বজায় থাকবেই—চাই কি অন্য যজমানী ক'রেও খেতে পারবে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—সে ভাবনাও আছে।'

উমার মুখ আজও অপমানে রাঙা হয়ে উঠল। শ্যামা কি বোঝে না তার কথা—না, ইচ্ছে ক'রেই আঘাত দেয়!

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে তবু শান্ত কণ্ঠে বলে, 'ছেলেকে পুরুতবামুন করবি?'

'তা কি করব বল্! সবাই কি আর লেখাপড়া শিখতে পারে? অল্প বিদ্যেয় শাঁখে ফুঁ—চলতি কথাতেই ত আছে। তাছাড়া শিষ্যি-যজমান দেখা ত ওদের কুল-কর্ম।'

উমা আর কথা বলে না। এদের সামনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেও তার লজ্জা করে।...

শ্যামা গুছিয়ে পুঁটলি বাঁধে। মার কাছ থেকে জোর ক'রে সোনা যোগাড় ক'রে, দু'গাছা পেটি গড়িয়ে নেয়। রাসমণি বললেন শুধু, 'ক'দিন রাখতে পারবি মা—আবার ত বাঁধা দিতে হবে, নয়ত বিক্রি করতে হবে!'

শ্যামা অম্লান বদনে বলে, 'সেজন্যেও ত দরকার। আর বাপের বাড়ি এসেও এমনি কড় নোয়া সার ক'রে যদি যাই ত লোকে বলবে কি?'

চাল ডাল তেল নুন মশলাপাতি গুছিয়ে নিতে কিছু ভুল হয় না। মায় বাসন-কোসন কাপড়-চোপড় পর্যন্ত। একদিন দিদির বাড়ি গিয়ে তার ছেলের পরিত্যক্ত ছোট-হয়ে-যাওয়া গরম জামা সব চেয়ে নিয়ে আসে। সামনে শীত আসছে। কমলা ওর লোলুপতা দেখে বিস্মিত হয়—একটু লজ্জিতও হয় বুঝি বা, বলে, 'আমি না হয় নতুন জামা করিয়ে দিচ্ছি। ওগুলো—'

'না, না। কি দরকার! সে তুমি বড়জোর দুটোই দেবে দুজনকে। এ আমি অনেকগুলো পাচ্ছি। এ ত তোমার কোন কাজে আসবে না। ঝিয়ের ছেলেমেয়েকে দেবে শেষ পর্যন্ত। তার চেয়ে আমাকে দুটো নগদ টাকা দিও, খেয়ে বাঁচবে ওরা।'

কমলা ভেবেছিল, কথার কথা! কিন্তু যাবার সময় সত্যিই শ্যামা চাইলে, 'কৈ দিদি, টাকা দুটো? ভেবে দ্যাখো, নতুন জামা করাতে গেলে কত বেশি পড়ত তোমার!'

কমলা দুটো নয়—পাঁচটা টাকাই এনে ওর হাতে দিলে, তার সঙ্গে নিজের দুটো পুরোনো আর একটা নতুন শাড়ি।

কিন্তু শ্যামার এই নির্লজ্জতায় সে যেন মরমে মরে গেল।

তার সেই ফুলের মত সুন্দরী বোন! শৌখিন ভদ্র বিবেচক বোনের বদলে সে দেহে এ কে এল? এ কী মৃত্যু ঘটল শ্যামার!

সব গুছিয়ে নিয়ে গাড়ি ডাকিয়ে যাবার সময় শ্যামা মাকে উপদেশ দিয়ে গেল, 'আপনার গুরুদেবকে ডাকিয়ে এনে উমিকে যা হোক একটা দীক্ষা দিন মা। তবু পুজো-আচ্চায় মনটা ভুলে থাকবে। সত্যি, ও কী নিয়েই বা থাকে বলুন!'

রাসমণি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি নিজের চরকায় তেল দাও মা, আমাকে আর জ্ঞান দিতে এসো না।'

শ্যামাকে মুখে যা-ই বলুন, কথাটা নিয়ে রাসমণিও খুব নাড়াচাড়া করেন মনে মনে। এ কথা ওঁরও যে মনে হয় নি তা নয়। বংশপরম্পরায় এই কথাই ত শুনে এসেছে সকলে হিন্দুর ঘরে—বিশেষত বাঙালী হিন্দুর ঘরে—'মেয়ের যদি কপাল পুড়ে থাকে ত যা হয় ক'রে তাকে একটা মন্তর দিয়েই দাও…তবু ইষ্টকে নিয়ে ভুলে

থাকবে। ভগবানের দিকে মন থাকলে সংসারের প্রলোভন জয় করতে পারবে!' এ কথা শুনতে শুনতে সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। সে সংস্কার রাসমণির রক্তেও আছে বৈ কি!

তবু রাসমণির মনে সংশয় জাগে। এ সংশয় বহুকালই জেগেছে—হয়ত বা নিজের মন দিয়েই অপরের মনের হদিস পেয়েছেন খানিকটা—ঈশ্বরকে চিন্তা ক'রে এ জন্মের দৈহিক ভোগ-সুখ-প্রলোভন কি সত্যিই ভোলা যায়? কোন শক্ত আঘাত পেয়ে মনে বৈরাগ্য না আসা পর্যন্ত মন কি ফেরানো যায় সংসার থেকে?

সংস্কার ও সংশয়ের, শ্রুতি ও অভিজ্ঞতার এই দ্বন্দ্বে ক্লান্ত হয়ে পড়েন রাসমণি—কিন্তু কিছুতেই যেন কূলকিনারা পান না কোথাও—পথ তাঁর চোখে পড়ে না।

অবশেষে একদিন উমাকেই জিজ্ঞাসা করেন, 'তুই দীক্ষা নিবি মা? নিতে চাস? শ্যামা সেদিন বলছিল, কিন্তু আমি জোর ক'রে দেব না। নেবার জন্যে পরামর্শও দেব না। তোর মন যা বলে তাই কর্।'

উমা স্তব্ধ হয়ে ভাবে খানিকটা। জীবনতরী তার অকূল সমুদ্রে ভাসছে। নাবিক নেই, পথের সন্ধান নেই। তীরের চিহ্ন পর্যন্ত নজরে পড়ছে না। নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘিরেছে তাকে—এর মধ্যে পারবে কি কেউ পথ দেখাতে? ঈশ্বর—তিনি কেমন? শুনেছে ত যে তিনিই পরম নাবিক, দিক্‌দিশাহীন জীবনযাত্রার একমাত্র পথ-প্রদর্শক। তাঁকেই অবলম্বন করবে নাকি শেষ পর্যন্ত?

হয়ত আছে ওখানেই পথের ইঙ্গিত, নূতন ঊষার স্বর্ণাভাস। তাঁর দিকে টেনে নেবেন বলেই হয়ত ভগবান দুঃখ দিয়ে তার মন ফিরিয়ে নিচ্ছেন সংসার থেকে। পুড়িয়ে পুড়িয়ে তাকে খাঁটি সোনা ক'রে নিতে চান তিনি। হয়ত সুখও আছে ঐখানে—

তাঁকে চিনিয়ে দেবেন, হাত ধরে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন যিনি, তিনিই গুরু। 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।'—এ ত মাকে প্রত্যহ পাঠ করতে শোনে সে।

মন্দ কি?

উমা আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'সেই ব্যবস্থাই করুন মা। আমি দীক্ষা নেব।'

'ভাল ক'রে ভেবে ছাখো। তাড়াহুড়ো ক'রো না। যে-সে জিনিস নয় ইষ্টমন্ত্র!'

উমা ভেবে দেখেছে বৈ কি। তবু একটা কিছু অবলম্বন ত পাবে। সেই কথাই জানায় মাকে সে।

কিন্তু রাসমণি আরও বিপদে পড়েন। সেকালে ইচ্ছামত শৌখিন গুরু বেছে

নেবার প্রথা ছিল না। কুলগুরু ত্যাগ করতে নেই—'গুরু ছেড়ে গোবিন্দে ভজে, সে পাপী নরকে মজে'—এই ছিল ওঁদের বিশ্বাস। যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবংশের গুরুই তার কুলগুরু। কিন্তু তাঁর সন্ধান দেবে কে? অনেক ভেবেচিন্তে মেয়েকে বললেন, 'তুই না হয় আমার জবানীতে—না না কাজ নেই—কমলার জবানীতে জামাইকে একটা চিঠি লেখ্—তোদের কে কুলগুরু আছেন, তাঁর ঠিকানাটা যদি পাওয়া যায়।'

উমা শিউরে উঠল—অন্ধকার পথে সাপ দেখলে মানুষ যেমন শিউরে ওঠে, তেমনি। থরো-থরো-কাঁপা ঠোঁটে সে বললে, 'না মা—দরকার নেই। সবই যখন ত্যাগ করলুম তখন ও গুরুইষ্টও থাক। তবে ওঁরা শাক্ত সেটা জানি—শাশুড়ীর ঘরে দশমহাবিদ্যার পট টাঙানো আছে, সেইখানে বসে নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন তিনি।'

'না মা। তুমি চিঠি লেখো। কুলগুরু ত্যাগ করতে নেই। তাছাড়া তোমাকে স্বামীর অনুমতিও নিতে হবে।'

স্বামীকে চিঠি লিখতে হবে! এই প্রথম—এতকাল পরে—তাও পরের জবানীতে।

উমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কেন, কেন তাকে নিয়েই বা বার বার এই ছেলেখেলা?

কুলগুরু? কিসের কুল তার—কে-ই বা তার স্বামী! যে স্বামী একবার মাত্রও স্পর্শ করলেন না তাকে, পায়ে স্থান দিয়েও স্ত্রী ব'লে স্বীকার করলেন না!

আবার মনে হয়, স্বীকার করেছেন ঠিকই।

সেদিনের কথাটা মনে পড়ে যায়, '…না না উমা, এ আমি ভাবতেই পারি না। এ কাজ কোরো না, ছি!'

স্বীকার করেছেন ঠিকই। কিন্তু এভাবে চিঠি লেখা?

তবু লেখে সে। লিখতে বাধ্য হয়। তিন-চারখানা চিঠি ছিঁড়ে দিদির জবানীতে একটা চিঠি লেখে—শুষ্ক, প্রয়োজনীয় চিঠি।

এই প্রথম চিঠি। প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ—কৈশোরে পা দেওয়ার পর থেকেই যে চিঠি লেখার স্বপ্ন দেখে মেয়েরা। হায় রে!

উত্তর আসে তিন-চার দিনের মধ্যেই। অস্পষ্ট হস্তাক্ষর—আঁকাবাঁকা লাইন—তবু চিঠি। এই প্রথম চিঠি স্বামীর কাছ থেকেও।

প্রিয়—প্রিয়তম-দয়িতের চিঠি—কল্পনা করতে চেষ্টা করে উমা, খোলবার আগে।

চিঠি তাকেই লেখা—

'কল্যাণীয়াসু—তোমার পত্র পাইয়া নিজেকে আরও অপরাধী মনে হইতেছে। ঈশ্বর আমাকে কোনদিনই ক্ষমা করিবেন না—অথচ যে জালে জড়াইয়াছি—ছাড়া পাইবারও উপায় নাই।...যাক্—যখন আমাদের কোন সংস্রব রাখ নাই—গুরুর ব্যাপারেও আর যোগ রাখিও না। তোমার মার গুরুদেবের কাছেই মন্ত্র লইও। আমি অনুমতি দিতেছি, তাহাতে দোষ হইবে না...যদি কোন পাপ হয়—সেও আমার হইবে। ইতি - তোমার হতভাগ্য স্বামী শরৎ।

পুঃ -- কোন অধিকার নাই, তবু সেদিনের কথাটা ভুলিতে না পারিয়া তিন-চারদিন থিয়েটারে গিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে দেখিতে না পাইয়া বুঝিয়াছি আমারই ভুল, ক্ষমা করিও।'

বার বার পড়ে উমা। বার বার বুকের কাছে রেখে দেয়।

চোখের জলে আর বুকের ঘামে অক্ষর অস্পষ্টতর হয়ে ওঠে—তবু যেন আশা মেটে না।

আশাও জাগে কোথায়, হয়ত তার স্বামী তার কাছে একদিন ফিরে আসবেন, নইলে এত খবর রাখতেন না। চিঠিতে অনুতাপের সুরও স্পষ্ট। সারারাত চিঠিটা গালের নিচে রেখে জেগে কাটিয়ে দেয় উমা।

দুই

আর এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। গুরু কাকে করবেন এই নিয়ে মহা চিন্তায় পড়লেন রাসমণি।—সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'যখন কুলগুরুই ত্যাগ করতে হবে তখন আর আমার গুরুবংশ ধরে কাজ নেই। গুরুদেব দেহ রেখেছেন, গুরুভাই যে আছে সে শুনেছি তো লোক ভাল নয়, মদ গাঁজা খায়—হয়ত অভক্তি হবে তার ওপর। তার চেয়ে বড় জামাইয়ের সন্ন্যাসী গুরু আছেন এক, তাঁর কাছেই নয়ত দীক্ষা নে। কী বলিস্!'

উমা আর কি বলবে, সে চুপ ক'রেই রইল।

তবে দিদির গুরুকে দেখে তার শ্রদ্ধাই হ'ল। দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ—প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। গেরুয়া পরেন কিন্তু জটা নেই। পিঠ পর্যন্ত এলানো দীর্ঘ কেশ। কপালে তান্ত্রিকদের মত রক্তচন্দনের ফোঁটা। অত্যন্ত মিষ্টভাষী—সস্নেহ ব্যবহার সকলের সঙ্গেই। গানের গলাটি ভাল--যখন-তখন রামপ্রসাদী গান ধরেন, উমা সে গান শুনে চোখে জল রাখতে পারে না।

যত্ন ক'রে দীক্ষা দিলেন, প্রতিদিন এসে অভ্যাস করান, উপদেশ দেন, শিক্ষা দেন।

উমা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে এই নতুন জীবনকে। দিনে দিনে অন্তত একটা বৈরাগ্য ঘিরে ধরে ওকে, জগৎ থেকে সে যে প্রত্যহই দূরে সরে যাচ্ছে এটা সে অনুভব করে নিজে নিজেই।

গুরু প্রথম প্রথম নিত্য আসতেন, তারপর নিয়মিত দুদিন অন্তর আসতে লাগলেন। উমা তাঁকে ভক্তি করে দেবতার মত, সেবা করে সন্তান বা পিতার মত। রাসমণি তার এই ভাব দেখে মনে মনে শান্তি পান।

হঠাৎ একদিন গুরুদেব বললেন, 'উমা, তোমাকে মা নিজে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। তোমার জীবন সার্থক। মহাভাগ্য তোমার, তাই লোকে যেটাকে সৌভাগ্য বলে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছ।'

হেঁয়ালি বুঝতে না পেরে, উমা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

গুরুদেব হাসেন, 'পাগলী, এটা আর বুঝলি না? আমার সিদ্ধির জন্যে এমনি একটি মেয়েই দরকার ছিল—যখন খুঁজে খুঁজে প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছি তখন মা তোকে মিলিয়ে দিলেন অভাবনীয় ভাবে। এ তাঁর দয়া ছাড়া আর কি? তোর ওপরও দয়া কম ভাবিস নি। সাধনার কাজে লাগবি—এ কি এক জন্মের সুকৃতি ভেবেছিস? জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য। স্বামী যদি তোকে গ্রহণ করতেন, তাহ'লে সম্ভব হ'ত না।'

সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হয় উমার। সত্যিই কি মার এত দয়া তার ওপর? সত্যিই কি এ তার জন্মান্তরের সুকৃতি? তার জীবন অধিকতর সার্থক করবেন বলেই কি তাকে আপাত-সার্থকতা থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন?

সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা, তবু খুশির ঢেউ বয়ে যায় তার মনের ওপর দিয়ে। সাধনার সহায় হবে সে? তপস্যার সঙ্গিনী হবে গুরুদেবের? তপস্বিনী, সন্ন্যাসিনী হবে সে?

সাগ্রহে প্রশ্ন করে গুরুদেবকে, 'সে সাধনা কবে শুরু করবেন বাবা? কী করতে হবে তাতে আমাকে?'

'বলব রে, বলব!' ওর ডান হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে সস্নেহে চাপ দেন তিনি।

প্রায়ই প্রশ্ন করে উমা—কল্পনা করতে চেষ্টা করে অনেক রকম কিন্তু কোনটাই যেন মেলে না।

গুরুদেবও ঠিক স্পষ্ট জবাব দেন না। নীরবে সস্নেহে পিঠে হাত বুলোন। নয়ত

ওর বিপুল কেশভার-সুদ্ধ মাথাটা নিজের কোলে টেনে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আদর করেন।

ইদানীং ওঁর কথাবার্তাও যেন কি রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। উনি অবশ্য বলেন, 'গুরুর কাছে শিষ্যের কোন অবস্থাতেই কোন সঙ্কোচ নেই' কিন্তু উমা লজ্জাই পায়। উনি পুরাণ থেকে গল্প বলেন, সব আদিরসাত্মক। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নানা উদাহরণ দেন উপদেশের মধ্যে, তাও যেন কেমন কেমন!

উমার ভাল লাগে না এসব। অথচ গুরুদেবের সামনে থেকে যেতেও পারে না। সে কেবল বলে, 'ওসব কথা থাক বাবা—আপনি আমাকে কবে তপস্যার কাজে টেনে নেবেন তাই বলুন, কী করতে হবে আমাকে বুঝিয়ে দিন। আমি সন্ন্যাসিনী হ'তেই চাই।'

অবশেষে একদিন শোনে সে—কী করতে হবে তাকে।

ছুটে এসে মার কাছে মাথা খোঁড়ে—টিব্ টিব্ ক'রে।

'কী হ'ল রে, কী হ'ল?'

'মা, কেন গুরুদেবের ওপর ভক্তি রাখতে পারছি না, কেন এমন সব সন্দেহ জাগছে মনে? কী হবে আমার?'

'কী হ'ল বল্ ত', জোর ক'রে ওর মুখখানা তুলে ধরেন রাসমণি!

'উনি ত বলছেন এ বড় পুণ্যের কাজ, ওঁর সাধনার সহায় হওয়া—কিন্তু আমি ত—না মা—সে আমি পারব না। আমি যে ওঁকে সাক্ষাৎ ইষ্ট বলেই জানি মা।'

পাথর হয়ে যান রাসমণি।

'তুই বোস্। আমি আসছি।' তিনি উঠে এসে গুরুদেবের সামনে হাতজোড় ক'রে বললেন, 'ভগবান যাকে মারবেন তার আশ্রয় কোথাও নেই, এইটেই আজ বুঝলুম। আপনি ওকে অব্যাহতি দিন। আর আপনি আসবেন না।'

গুরুদেব মুখ কালি ক'রে চলে গেলেন।

উমা রাসমণির সামনে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে বললে, 'এ সংশয় কেন এল মা? সত্যিই কি আমার কোথাও আশ্রয় নেই? তবে আমি কি করব?'

একাদশ পরিচ্ছেদ

এক

একটি একটি ক'রে বছর কাটে।

মহাকাল তাঁর হিসেবের খাতায় একটি ক'রে পাতা ওল্টান! সেই পাতার মধ্যে বহু সুখদুঃখের বিবরণ চিরকালের মত চাপা পড়ে যায়। কত মর্মান্তিক

ইতিহাস—কত বুকভাঙা বেদনা।

আজ যা মনে অসহ্য—কাল তাই একটা অস্পষ্ট বেদনাদায়ক অনুভূতিতে পরিণত হয়ে স্মৃতির কোন্ সুদূর দিগন্তে মিলিয়ে যায়!

শ্যামারও বছর কাটে। এক-এক সময় মনে হয় বুঝি কাটল না কিছুতে—মনে হয় এতকাল পরে সংসারের তরণী বুঝি এই ঘূর্ণিতে ডুবল, বুঝি বা এই তুফানে বানচাল হ'ল। আবারও তা কোনমতে হেলে-বেঁকে একসময় সোজা হয়ে দাঁড়ায়। স্তব্ধ নিঃশ্বাস আবার সহজে বেরিয়ে আসে—উঁচু পর্দায় বাঁধা স্নায়ুতন্ত্রী আবার নিশ্চিন্ত আলস্যে শিথিল হয়ে যায়। এই ত প্রায় প্রতি দরিদ্র সংসারের ইতিহাস। শ্যামার জীবনেই বা তার অন্যথা হবে কেন?

নরেনের ডুব মারাটা আজকাল সয়ে গেছে শ্যামার। বরং যখন সে আসে তখনই যেন বেশী অসহ্য বোধ হয়। চালটা পায় বটে—স্বামীকেও কাছে পায়—এই পর্যন্ত, কিন্তু তার ঝঞ্ঝাট-ঝামেলাও বড় কম সইতে হয় না। শ্যামার এক-এক সময় মনে হয় আর বুঝি সে পারে না।

মঙ্গলা ঠাকরুণ অবশ্য এদের তাড়াবার চেষ্টা কম করেন নি। আগের পূজারীকে দিয়েই যখন পূজো করাতে হবে অর্ধেকদিন, তখন মিছিমিছি এরা ঘর-জোড়া ক'রে থাকে কেন? তাছাড়া সে পূজারীও বড় গোলমাল করে—নরেন মধ্যে মধ্যে এসে দেড়মাস দু'মাস থাকে যখন, তখন তার বরাদ্দ মারা যায়। প্রথম প্রথম ঝগড়া ক'রে নরেনকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু দু'একবার মাত্র সে চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়েছে। নরেন একেবারে কাটারি কি বঁটি ধরে। সে সময় তার যা প্রচণ্ড মূর্তি হয়, তাতে সামনে দাঁড়ানো শক্ত। অগত্যা চুপ ক'রে সহ্য করা ছাড়া পূজারীর উপায় থাকে না—সহ্যই করে, আর মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করে মঙ্গলা ঠাকরুণের কাছে।

অথচ মঙ্গলাই বা কি করবেন ভেবে পান না! এ হয়েছে তাঁর স্বখাত সলিল। নরেনের দ্বারা ভাল পূজা হবে সে আশা-ভরসা আর তাঁর নেই। ও যেন গেলেই তিনি বাঁচেন। বিশেষত নরেনের প্রকৃতির যে পরিচয় তিনি পাচ্ছেন দিন দিন, তাতে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হয়েছে যে, নতুন বামুনঠাকুর একেবারে পাগল। একদিন ত হাতে-নাতেই ধরলেন। পাইখানার কাপড়ে এসে, না স্নান না কিছু, পুজো করতে বসে গেল। হাঁ-হাঁ ক'রে এলেন মঙ্গলা ঠাকরুণ, 'ও কি ঠাকুর, ও কী করলে গো! সর্বনাশ করলে! এখুনি তুমি বেরোও—বেরোও বলছি!'

প্রথমটা নরেনও একটু হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল, 'কেন গো, কী হ'ল আবার?'

'কী হ'ল আবার জিজ্ঞেস করছ! সদ্য পাইখানার কাপড়ে এসে ঠাকুর ছুঁলে।

াবার বলা, কি হ'ল ?'

'কে বললে পাইখানার কাপড়—না ত !'

'আবার মিছে কথা বলছ ঠাকুর ? আমি স্বচক্ষে দেখলুম তুমি মাঠ থেকে ঘুরে গেলে আর সোজা উঠে এসে গাছ থেকে ফুল পেড়ে নিয়ে মন্দিরে ঢুকলে। আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলুম আক্কেলখানা। তা এত সাহস যে হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। ধন্যি বুকের পাটা বাবা। যাক্ যা হয়েছে তা হয়েছে। খুব আক্কেল হয়েছে আমার। এখন বেরোও, আমি বেচা ঠাকুরকে ডেকে অভিষেক করাই—। আজই তুমি বিদেয় হয়ে যাবে আমার ভিটে থেকে—বলে রাখলুম।'

মিছে কথা বলে পার পাবার আর উপায় নেই দেখে নরেনও নিজমূর্তি ধরলে, 'থাম্ মাগী—মেলা ভ্যানর ভ্যানর করিস নি। ঠাকুরের সেবা কি হবে না হবে সে কথা বামুন বুঝবে আর ঠাকুর বুঝবে। এ হ'ল গে আমাদের কাজ, যার যা। বলে যার কম্ম তারে সাজে অন্যের মাথায় লাঠি বাজে !'

তবু মঙ্গলা হাল ছাড়েন না। বলেন, 'তাই বলে তুমি যা-তা কাপড়ে ঠাকুর ছোঁবে ? হেগো-হাতে পুজো করবে ?'

নরেন খিঁচিয়ে ওঠে, 'আলবত করব। মাগী, এত শাস্তর জানিস আর এটা জানিস না যে বামুন এক পা গেলেই শুদ্ধু ? হাওয়া লাগলেই বামুন শুচি হয় তা জানিস না ? না জানিস ত জিজ্ঞেস ক'রে দেখ্ গে যা কোন টুলো পণ্ডিতকে। শুনেছি ত মন্তর হয়েছে, সেই গুরুকেই জিজ্ঞেস করিস।'

এই বলে সে ঠাকুরকে স্নান করাতে শুরু ক'রে দিলে।

'এ ত কম অত্যেচার নয় গা ! বামুন বলে যা খুশি তাই করবে ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ। করব। বামুনের পায়ের ধুলো ভগবান বুক পেতে নেন। তোরা শুদ্দুর, কি বুঝবি এর মম্ম ! আমরা হলুম গে গুরুবংশ। আমরা সব জানি।'

সম্প্রতি কালনায় গিয়ে কথকতা শুনে এসেছে নরেন। এখনও মনে আছে ঘটনাটা। শুধু ভৃগুর নামটা মনে পড়ল না ব'লে আফসোস হ'তে লাগল। নইলে জমত আরও।

মঙ্গলা তবু একবার শেষ চেষ্টা করলেন, 'আমি ঠাকুর তোমাকে রাখব না, আমার খুশি, তুমি আজই পথ দেখবে। সিধে বাত !'

তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে যেন ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে নরেন, 'যেতে পারি আমি, কিন্তু পৈতে ছিঁড়ে ঐ নারায়ণের সামনে মাথা খুঁড়ে ব্রহ্মরক্ত-পাত ক'রে চলে যাবো তা বলে দিলুম। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করো—তোমার তাতে ভাল হবে ত ?'

এর পর আর একটি কথাও বলতে সাহসে কুলোয় নি মঙ্গলার। তখনকার দিনে কুলোনো সম্ভবও ছিল না। তিনি এক পা এক পা ক'রে পিছিয়ে চলে গেলেন বিড়বিড় ক'রে বকতে বকতে, 'ষাট্ ষাট্! এ কি সাংঘাতিক সর্বনেশে লোক রে বাবা! আজই বাছাদের কপালে পাঁচ পয়সা ক'রে ঠেকিয়ে তুলে রাখতে হবে। মায়ের ওখানে যেদিন যাবো পুজো দেব। হে হরি, হে নারায়ণ, রক্ষে করো বাবা!'

নরেন একা দাঁড়িয়ে হি হি ক'রে হাসতে লাগল সেখানেই।

সব শুনে শ্যামা বলেছিল, 'তারপর? তোমার ত হুট্ বলতেই যাওয়া। একা পেয়ে আমাকে যদি একদিন তাড়িয়ে দেয়?'

'ইস্, দিলেই হ'ল! আমার বৌ হয়ে এই কথা তুই মুখে আনলি! ওরে হাজার হোক আমরা হলুম বামুন, গোখ্‌রো সাপের জাত। আমাদের ঘাঁটাতে সাহস করবে না সহজে।...তেমন হয় বলবি—এই আমি তিনদিন উপোস ক'রে পড়ে রইলুম। তে-রাত্তির ক'রে তবে বেরাব।'

তখন সে কথায় অতটা আমল দেয় নি শ্যামা। কিন্তু একসময় কথাটা খুব কাজে লেগে গেল। মঙ্গলা একদিন স-পুত্রকন্যা একেবারে রণচণ্ডী মূর্তিতে এসে দাঁড়ালেন, 'বাম্‌নি, তুই যাবি কিনা, বল্। না বেরোস্ ত জোর ক'রে বার ক'রে দোব। ভাল চাস্ ত মালপত্তর যা নিয়ে যেতে হয় নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যা—আমি গাড়িভাড়া দিচ্ছি।'

মরীয়া হয়ে মানুষ যা করতে পারে, আগে থেকে তা কল্পনা করা শক্ত। নরেনের মুখে কথাটা শোনবার সময়ে শ্যামা কল্পনাও করে নি যে ঐ কথাগুলো সত্যিই তার মুখ দিয়ে বেরোবে। কিন্তু এখন, যখন একান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে মনে হ'তে লাগল ওর পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, তখন অনায়াসেই সে বলে ফেললে, 'আমার স্বামী বাড়ি নেই বলে দল বেঁধে গায়ের জোর দেখিয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিতে এসেছেন মা—বেশ, গায়ে হাত দিয়ে বার করতে হবে না—আমি নিজেই ছেলেমেয়ের হাত ধরে রাস্তায় গিয়ে বসছি। তবে অমনি যাব না মা—রাস্তার ওপর ত আর আপনার জোর নেই—আপনার বাড়ির সামনে বসে তে-রাত্তির ক'রে—যদি যেতে হয় ত তখন যাবো। জিনিসপত্তরে কি দরকার—ও আপনারা ফেলে দিন। আয় রে খোকা—'

মঙ্গলা অবাক্ হয়ে গালে হাত দিয়ে থাকেন কিছুকাল।

'শুনলি, তোরা শুনলি একবার! যেমন দ্যাবা তেমনি দেবী। বেইমানের ঝাড় একেবারে। এতকাল ঘরে রেখে পুষলুম, তার এই শোধ, আমারই সব্বনাশ করার

ল্লা! বেশ, তাই তুমি থাকো মা, আমার ঘর-জোড়া ক'রে। তাই যদি তোমার শ্মে বলে তাই করো।'

সদলবলে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শ্যামাও সেদিন সেছিল আপন মনে—পাগলই হোক বদমাইশই হোক কিন্তু লোকটার যে বুদ্ধি াছে তা মানতেই হবে।

দুই

াদিন থেকে সোজাসুজি তাড়াবার চেষ্টা আর মঙ্গলা করেন নি। কিন্তু তাছাড়া যত মে করা যায় তার কোন পথটাই বাদ দেন নি। হেম আর মহাশ্বেতার ওপর ত ত্যাচারের অন্তই ছিল না—শ্যামার পক্ষেও সে সব সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ঠেছিল। শুধু আর কোথাও কোন পথ নেই বলে চুপ ক'রে সইতে হ'ত।

এমনিই ত দিন চলে না। নরেন যখন থাকে না তখন বরাদ্দ চাল বন্ধ হয়ে যায়— হনা যা সামান্য থাকে তাতে কয়েক দিনও চলে না ভাল ক'রে। তারপর উপবাস। র অসহ্য হয় যখন ছেলেমেয়েগুলোকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে শ্যামা চলে যায় হেঁটে লকাতায়—মার কাছে একবেলা খেয়ে কিছু চাল ডাল টাকা নিয়ে আবার হেঁটেই রে আসে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতে ভরসা হয় না—ঘরে যদি আর ঢুকতে না য় ফিরে এসে!

নরেন থাকলে—এক-আধবার যখন মেজাজ ভাল থাকে তখন সে নিজেই ওদের াঠিয়ে দেয়, বলে, 'তুই নিশ্চিন্তি হয়ে চলে যা ছোট বৌ—আমি এই মাটি কামড়ে ড়ে রইলুম, তুই না ফিরলে নড়ছিনি!' সে রকম ক্ষেত্রেও সাত-আট দিনের বেশি াকতে ভরসা হয় না। তবু তাতেই ঢের উপকার হয়। রাসমণি নামই দিয়েছেন, ভিক্ষ অবতার। আসে যখন কঙ্কালসার চেহারা, একমাথা উকুন, গায়ে ময়লা ছেঁড়া াপড়। এখানে এসে মাথা ঘষে, তেলসাবান মেখে চক্‌চকে হয় আবার—নতুন াপড় পায়, ছেলেমেয়েদের অঙ্গেও জামাকাপড় ওঠে। যাবার সময় পাঁচ-দশটা াকাও আঁচলে বেঁধে ফেরে।

এর বেশি রাসমণি দেন না। প্রথমত তাঁরই সংসার চলা শক্ত। আরও কতদিন াচতে হবে তাঁকে কে জানে, উমারও ত এই অবস্থা—বিশেষ ক'রে উমার চিন্তাই ন তাঁকে আরও বেশি বিব্রত ক'রে তুলেছে। সেক্ষেত্রে কত টাকা ওদের দেওয়া ম্ভব? তাছাড়া নরেনকে বিশ্বাস করেন না তিনি একটুও, বেশি টাকা নিয়ে মেয়ে ফিরলে সে টাকা তার ভোগে হবে কিনা সন্দেহ!

শ্যামা কিন্তু এতে একটু ক্ষুণ্ণই হ'ত। দীর্ঘকাল ধরে অহরহ দারিদ্র্য ও

উপবাসের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ওর মনটাও যেন পাল্‌টে গেছে অনেকটা। মা যে বেশি ক'রে টাকা দেন না, সেটা যেন মায়ের অন্যায়। মা কোথায় পাবেন সে কথা একবারও ভাবে না। শুধু এইটেই মনে হয়, নিজেরা ত বেশ ভোগে-সুখে আছেন —আমার বেলাই যত নেই নেই!...ওর মানসিক পরিবর্তন ও নিজেও যেন অনুভব করে—তবু তার প্রভাব এড়াতে পারে না।

কিন্তু মার আশঙ্কা যে কতটা সত্য তা একদিন প্রমাণিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল শ্যামা। প্রসবের সময় হিসেব ক'রে রাসমণি চিঠি লিখলেন তাঁর কাছে যাবার জন্যে। শ্যামার তা সাহসে কুলোল না। একমাস দেড়-মাস সেখানে থাকতে হবে হয়ত, কিংবা আরও বেশি। তাহলে এ বাসা ঘুচবে চিরকালের মত। মার ওখানে তার আশ্রয় মিললেও মিলতে পারে—নরেনের যে স্থান হবে না এটা ত ঠিক। কাজেই অনেক ভেবেচিন্তে সে মাকে লিখলে, 'কিছু টাকা যদি সম্ভব হয় ত পাঠান মা—যাওয়া আমার হবে না।'

হাজার হোক, সন্তান। রাসমণি অনেক কষ্টে পঞ্চাশটি টাকাই যোগাড় ক'রে পাঠালেন। টাকা যেদিন এল সেদিন নরেন সেখানে উপস্থিত। লোলুপ দৃষ্টিতে টাকাটার দিকে চেয়ে রইল সে, কিন্তু শ্যামার ভয়ে তখন কিছু বলতে পারলে না। ইদানীং শ্যামাও শক্ত হয়ে উঠেছে। তাকে ভয় দেখিয়ে কিছু করা যায় না।

সন্ধ্যার সময় শ্যামা রান্না চাপিয়েছে, নরেন কাছে এসে বসল।

'কি খবর বলো দিকি? এত ন্যাওটোপনা করছ কেন?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় শ্যামা।

'না—এমনি। অনেকদিন যেন তোকে ভাল ক'রে দেখি নি। মাইরি বলছি ছোটবৌ,এত দুঃখু-কষ্টে এখনও তোর রূপটা কিন্তু নষ্ট হয় নি। এখনও আর এক-বার বিয়ে দিয়ে আনা যায়।'

এ স্তুতির আড়ালে আর কিছু আছে জেনেও পুলকিত হয় শ্যামা। আগুনের তাতে তার শুভ্র ললাটে স্বেদবিন্দুর মধ্যে যে রক্তিমাভা ফুটে উঠেছিল তা নিবিড়তর হয়ে ওঠে।

'আর হবে না-ই বা কেন? আমার শাশুড়ীঠাকরুণের রূপটাই কি কম! অন্ধকারে যেন জ্বলে। কত বড় বংশের মেয়ে। রাজা-রাজড়ার ঘরে মানাত তোকে—নেহাত আমার হাতে এসে পড়েছিস, তাই।'

শ্যামা বাঁকা কটাক্ষে ওর মনের কথাটা বোঝবার চেষ্টা করে কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। গলাটা হঠাৎ একটু নামিয়ে বলে, 'মাইরি, ছোটবৌ, তোর

দুটি পায়ে পড়ি—তিনটে টাকা দিবি ?'

'টাকা ? টাকা কি হবে ? টাকা কোথায় পাবোই বা।'

'অনেকদিন নেশাভাঙ্ করি নি, তোর দিব্যি বলছি। আজকে শরীরটাও বড় ম্যাজম্যাজ করছে—যাবো আর আসবো। একটু বিলিতি খাবার ইচ্ছে হয়েছে আজ।'

'আচ্ছা, তোমার একটু লজ্জা করছে না। আমার আঁতুড়ের খরচ বলে মা পাঠিয়েছেন—একমাস আঁতুড় ঠেলতে হবে। দাই আছে, খাওয়া-দাওয়া আছে,—তোমার ত পাত্তাই থাকবে না। এ সময় উপোস ক'রে থাকলে চলবে ? তোমারই দেওয়ার কথা—মা পাঠিয়েছেন, বিধবা মানুষ, তাঁকে দেনে-আলা ত কেউ নেই। তাইতেই ত তোমার লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত। আর উল্টে কি না—ছি ছি ! তোমার কাছে থেকে ঘেন্না-লজ্জা আর আশা করি না, তবু মানুষের কোন পদার্থ কি আর নেই ?'

'মাইরি বলছি, এই তোর দুটি পায়ে পড়ছি—এইবারটি দে, তারপর যদি লক্ষ্মীছেলে হয়ে ঘরে বসে না থাকি ত কি বলছি। দু'মাস কোথাও নড়ব না—এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি। তোকে, ছেলেমেয়েদের রেঁধে দিতে হবে না ?'

কোমল হয়ে আসে শ্যামার মন। সে আস্তে আস্তে গোপন ভাণ্ডার থেকে তিনটি টাকা বার ক'রে দেয়।

তিন

সেই দিনই রাত্রে শ্যামার ব্যথা উঠল। তখন আর উপায় নেই—পাড়ার যে দুলে-বৌ দাইয়ের কাজ করে তাকেই ডেকে পাঠাতে হ'ল। ছ'বছরের ছেলে হেম সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অন্ধকার রাত্রে তাকে ডাকতে গেল—আর দ্বিতীয় লোক কৈ ! মঙ্গলা ঠাকরুণ অবশ্য পরে এলেন--কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে তুলে যে দাই ডাকতে পাঠাতে দেবেন না তিনি—এটা শ্যামা বেশ জানত।

হেম ভয়ে চোখ বুজে হোঁচট খেতে খেতে কোনমতে গেল—আসবার সময় দুলে বৌ সঙ্গে এল এই যা ভরসা। কিন্তু ততক্ষণে আপনা থেকেই একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে শ্যামার। দুলে-বৌ-এর মুখে খবরটা শুনে শ্যামার দু চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, এত কষ্টের সন্তান যদি বা হ'ল--বাঁচল না !

মঙ্গলা এসে হেঁট হয়ে দেখে বললেন, 'এ বাছা তোমার সোয়ামীর দোষ। নিশ্চয়ই ওর খারাপ ব্যামো আছে। নইলে এমন হ'ত না। আমি ভাবছিলুম যে রাত-বিরেত অন্ধকারে যাও আমার ফলগাছগুলোর সব্বনাশ করতে—পেটের জ্বালায়

কিছুই ত মানো না—তাই বুঝি কি নজর-টজর লেগেছে! কিন্তু এ ত···দেখেছিস বসনের মা?'

বসনের মা দাই ঘাড় নাড়ল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে মা।'

ওর জা রাধারাণীর কথা মনে পড়ে যায় শ্যামার···তা হ'লে কি তার কোন ছেলেই আর বাঁচবে না?···এর কি কোন প্রতিকার কি চিকিৎসা নেই?

কিন্তু ক্লান্ত চোখ দুটি অবসন্ন হয়ে বুজে আসে। এ সব কথা এখন আলোচনা করতে ইচ্ছাও করে না।

মঙ্গলা আবশ্যকীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'তবে তুই সব ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়ে যা বসনের মা। আমার আবার ঘরদোর পড়ে রয়েছে, কর্তাকে দোর দিতে বলেছি, দিয়েছে কি না জানি না—হয়ত ঘুমিয়েই পড়ল। মনটা আমার সেইখানেই পড়ে রয়েছে। আমি এখন যাই—'

বসনের মাও শেষরাত্রে চলে গেল। ছেলেটা ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো পড়ে রইল—নরেন এসে যা হয় একটা ব্যবস্থা করবে।

বসনের মা যাবার সময় প্রশ্ন করলে, 'দোর?'

'ভেজানো থাক। রাত ত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উনিও এসে পড়বেন এখন।'

ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। শ্যামার চোখও তন্দ্রায় অবশ হয়ে আসে। তাই সে টেরও পায় না কখন নরেন এসে ঘরে ঢোকে। নেশায় তার চোখ লাল কিন্তু দৃষ্টিতে ঘুমের আমেজ নেই, তাতে ফুটে উঠেছে অপরিসীম ধূর্ততা। নিঃশব্দে ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলির মধ্যে থেকে ন্যাকড়ায় বাঁধা টাকাগুলো বার করে। সবগুলোই নিয়ে চলে যাচ্ছিল, কি ভেবে ঘুরে এসে দশটা টাকা রেখে যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল।

পরের দিন বসনের মা সকালে এসে ঘুম ভাঙাতে শ্যামা হেমকে বললে টাকা বার ক'রে দিতে। কিন্তু পুঁটলি খুলতেই শ্যামা সব বুঝতে পারলে। লজ্জায় অপমানে ঘৃণায় আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। নরেন চামার—কিন্তু এ যেন তার পক্ষেও বিস্ময়কর আচরণ।

ব্যাপার-গতিক দেখে বসনের মা চারটি টাকা নিয়েই চলে গেল। ক্লান্ত শ্যামা মরা ছেলেটাকে দেখিয়ে বললে, 'ওটার একটা গতি তুমিই করো বসনের মা, যা হোক—'

মঙ্গলা এসেও সব শুনলেন।

'চামার মা, আস্ত চামার!···তুমি যাই সতী-সাধ্বী বউ তাই ওর সঙ্গে ঘর

করো।…ঘেন্না করে অমন ভাতারের নামে।…যাক্ গে, তুমি আজ আর উঠো না, আমিই সাবু ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ছেলেমেয়েদেরও খানকতক রুটি গড়ে দিক পিঁটকী। বামুনের ছেলেমেয়ে, ভাত ত দিতে পারব না। বামুন ঠাকরুণ আবার এই সময় দেশে গেলেন কিনা।'

তারপর একটু থেমে দম নিয়ে বললেন, 'ঐ জন্যেই ত কেবল টিক্‌টিক্ করি—দোরটা যদি উঠে দিয়ে রাখতে…সোয়ামীই হোক যেই হোক—এমন নিঃশব্দে কিছু আর নিয়ে যেতে পারতো না।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এক

হেম একসময় আট বছরে পড়ল। কথাটা অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য। যেখানে এক বছরও কাটবার কথা নয় সেখানে এত কাল কি ক'রে কাটল ভেবেই পায় না শ্যামা।

সরকারদের প্রকাণ্ড বাগানের পাকা তাল, নোনা, আতা, নারকেল, পেঁপে, কলা—চুরি ক'রে ক'রে সংগ্রহ করে শ্যামা। শুধু শ্যামাই বা কেন—হেম, মহা—সবাই! এটা আর গোপনও নেই—সরকাররা সবাই জানে, এখন শুধু চলে লুকোচুরি খেলা—পিঁটকীর ছেলেটা সব চেয়ে বড় শত্রু, সে আজকাল প্রায় সারাদিনই বাগানে বসে থাকে, আর ওদের কারও টিকি দেখলেই নাকে কাঁদে, 'ওঁ মা দ্যাখো, আবার ওঁই বাঁমুনগুলো এঁসেছে চুরি করতে—ওঁ মা—'

আর মহা, ওদেরই কাছে শুনে শুনে গালাগাল শিখেছে, সে আধো-আধো কণ্ঠেই আঙুল মট্‌কে শাপ দ্যায়, 'হতচ্ছাড়া ছেলে মরেও না—মর্ মর্ —'

এইভাবে চলে টানাটানি—যখন ধরা পড়ে তখন চোরের মার খায় একদিন, বামুনের ছেলে ব'লে রেয়াৎ করে না কেউ। শ্যামা দিনের আলোয় ও চেষ্টা করে না—রাত্রির অন্ধকারে গা ঢেকে ঘুরে বেড়ায় নিশাচরী প্রেতিনীর মত। আগে আগে সরকাররা ভয় পেত, সত্যি-সত্যিই 'অস্থি দেবতা' মনে ক'রে চিৎকার ক'রে রামনাম করতে করতে দৌড়ত, অন্ধকারের মধ্যে সাদা কাপড় পরা ওকে দেখে—কিন্তু ক্রমে কথাটা জানাজানি হয়ে পড়ায় তারাও নির্ভয়ে বেরোয় বাগানে। তাল কি নারকেল পড়ার শব্দ হ'লেই দু দলে চলে প্রতিযোগিতা—কে আগে আসতে পারে। সরকারদের ছেলেমেয়েরাও নির্ভয়ে বেরিয়ে আসে—বামনী ত আছেই বাগানে, ভয় কিসের?

যেদিন শ্যামা আগে পৌছয়, ফল সংগ্রহ ক'রে নিয়ে নিঃশব্দে ফিরে চলে আসে।

ওরা সারা বাগান তোলপাড় ক'রেও কিছু খুঁজে পায় না। তখন ফিরে যাবার সময় হেমদের জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গালাগাল দিয়ে যায়, 'বামুন না ঘোড়ার ডিম! চোর, চোর সব! চোর আবার বামুন হয়? মর্ মর্—ওলাউঠো হোক্!'

কিন্তু শুধু ত সংগ্রহ করাই নয়—তা থেকে কিছু অর্থ-সমাগমও প্রয়োজন।

সেটা আরও কঠিন। পাড়াগাঁয়ে সবাই কিছু কিছু জমি নিয়ে বাস করে—ফল-ফুলুরী সব্‌জী প্রত্যেকের বাড়িতেই হয়, সুতরাং পাড়াঘরে এসব কেনবার লোক নেই। বিক্রি হয় সুদূর শিবপুরের বাজারে পাঠালে—কিংবা আরও দূরে—শালিমারে। একসঙ্গে সব কিছু সংগ্রহ হয় না। রোজ রোজ অত দূরে যায় কে? কাজেই অধিকাংশ দিনই ঐ সব পাকা ফল খেয়ে ফেলতে হয়, ঐ খেয়েই জীবনধারণ করতে হয়। যে দিন দু' রকম তিন রকম জিনিস জমে সেদিন শ্যামা বেরোয় খদ্দেরের খোঁজে। তাও পাহারার শেষ নাই। অনেকক্ষণ ধ'রে একটা একটা ক'রে জিনিস সরিয়ে কোন গোপন স্থানে রেখে আসে, তারপরে মা ছেলে দু' পথে গিয়ে সেখানে মিলিত হয়। মহা একা বাড়ি থাকে। শ্যামা মাল বয়ে নিয়ে গিয়ে বাজারের বাইরে কোথাও গাছের আড়ালে অপেক্ষা করে, হেম ভেতরে গিয়ে বিক্রি করে। দর একেই কম—ছেলেমানুষ দেখে আরও কম দেয়—অর্থাৎ এত কাণ্ড ক'রে, এত পথ হেঁটে পয়সা মেলে কোনদিন দু আনা, কোনদিন দশ পয়সা, কোনদিন বা আরও কম।...ফেরবার পথে যেদিন হেম রৌদ্রের তাপে আউতে-ওঠা দোলনচাঁপার পাপড়ির মত নেতিয়ে পড়ে সেদিন বড়জোর এক পয়সার বাতাসা কিনে মায়ে-বেটায় কোন পুকুরপাড়ে বসে একটু জল খেয়ে নেয়। তার চেয়ে বেশি খরচ করতে ভরসা হয় না, কারণ ঐ সামান্য পয়সা-তেই চাল কিনতে হবে। আজকাল এই ভাত খাবার দিনগুলো ওদের কাছে মহোৎসবের দিন।

আর এত কষ্টের পর যেদিন চালান করার মুখে ছেলেমেয়েরা ধরা প'ড়ে নির্যা-তিত হয়—মালও হয় বাজেয়াপ্ত, সেদিন শ্যামা অন্তরালে থেকে অসহায় ভাবে মাথা খুঁড়ে কপাল ফুলিয়ে ফেলে শুধু—কোন প্রতিকারই করতে পারে না। আর সে নির্যাতনেরও নব নব রূপ—দস্তুরমত যেন গবেষণা ক'রে বার করা হয়। একদিন বা হাত বেঁধে গায়ে আলকুশী ঘষে দেওয়া হ'ল—আর একদিন হয়ত বিছুটি ঘষে জল ঢেলে দিলে গায়ে। এমনি নানারকম কৌশল। সব চেয়ে কষ্ট হয়েছিল শ্যামার যেদিন সত্যিই অপরের বাগান থেকে চেয়ে আনা একটা নোনার জন্য মহাশ্বেতাকে শীতের বিকেলে পুকুরের জলে ডুবিয়ে ওর মাথায় পা দিয়ে চেপে রইলেন অক্ষয়বাবু স্বয়ং, চোর বলেই ধ'রে নিলেন, কোন কথাই বিশ্বাস করলেন

না। দু'তিন মিনিট ঐভাবে থেকে হাঁপিয়ে মেয়ে যখন নীল হয়ে উঠেছে তখন হেমের মুখে সব কথা শুনে শ্যামা আর থাকতে পারলে না, ছুটে এসে জোর ক'রে মেয়েকে টেনে জল থেকে কোলে তুলে নিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'এই ত পাশেই চট্‌খণ্ডীদের বাড়ি, ওরা দিয়েছে কিনা জেনেই না হয় মেয়েটাকে খুন করতেন! এই দুধের বাছাকে এমনভাবে মেরে ফেলতে লজ্জা হয় না আপনার?'

অক্ষয়বাবুও ভেংচি কেটে জবাব দিলেন, 'লজ্জা হয় না তোমাদের বাগানসুদ্ধ ফল চুরি করতে?'

শ্যামা এর আগে কোনদিন কথা কয়নি ওঁর সঙ্গে, বলে ফেলে লজ্জিতই হয়েছে—তবু এখন আর ফেরা যায় না—সেও সদম্ভে জবাব দিলে, 'ফল ত কত পাখি-পাখালি কাকে-বাদুড়ে-ভামে খেয়ে যাচ্ছে, না হয় খেলেই বামুনের ছেলে-মেয়েরা দুটো।...তাই বলে বামুনের কুমারী মেয়ের মাথায় পা! মা সতীরাণী এর বিচার করবেন।'

এতক্ষণে আরও ভাল ক'রে মেয়ের নীল মুখের পানে চেয়ে দেখবার ফুরসুত হয়েছে শ্যামার। কেমন যেন হয়ে গেছে মহাশ্বেতা, ঠোঁট দুটো কাঁপছে শুধু, কাঁদতেও পারছে না। সেই দেখে আরও জোরে কেঁদে উঠে পাগলের মত একটা আমগাছে সে মাথা খুঁড়তে লাগল।

এইসব গোলমালে ততক্ষণে মঙ্গলারা ছুটে এসেছেন। মঙ্গলা স্বামীকে তিরস্কার করলেন। জোর ক'রে শ্যামার চোখের জল মুছিয়ে মেয়েটাকে নিজের শুকনো আঁচল দিয়ে গা মুছিয়ে বুকের মধ্যে ক'রে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিলেন, 'ষাট্‌ ষাট্‌, কিছু মনে করিস্‌ নি মা, ও মিন্‌সে অমনি। রাগলে আর ওর জ্ঞান থাকে না!'

শ্যামা কিছু বললে না। কিন্তু দৈবক্রমে সেই দিনই পিঁটকীর এক মেয়ের প্রবল জ্বর হ'ল—দিন দুই পরে ডাক্তার ডাকতে শোনা গেল, নিমোনিয়া। ওরা যত ভয় পেলে—শ্যামাও তত, সত্যি-সত্যিই কিছু ভালমন্দ হবে না তো মেয়েটার? হে মা দুগ্‌গা, হে মা কালী, রক্ষে করো মা। দিনরাত জপ করে শ্যামা। বড় দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছে, উপকারও যে কিছু করে নি তা নয়।

মঙ্গলা এসে জোর ক'রে একদিন ওকে ধরে গিয়ে ওর পায়ের ধুলো মেয়েটার মাথায় গায়ে মাখিয়ে দিলেন। ওর হাত দুটো ধরে বার বার বলতে লাগলেন, 'তুই ওকে মাপ কর্‌ বামনি, মাপ কর্‌, নইলে দুধের বাছা আমার বাঁচবে না।' পিঁটকী এসে দুটো পা ধরে পড়ে রইল। 'কি শাপ দিলি বামুন-দি, মেয়েটা আমার শুকিয়ে মরে গেল!'

কেমন ক'রে বোঝাবে শ্যামা ওদের যে, শাপ সে সত্যিই দেয় নি। এত ছোট

মন নয় তার।

সে কিছুই বলতে পারলে না, শুধু হাউ হাউ ক'রে নিজেও খানিক কাঁদলে। তারপর অচৈতন্য মেয়েটার মাথার কাছে বসে প'ড়ে ওর সর্বাঙ্গে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগল, 'ওর সব বালাই নিয়ে আমি যেন মরি মা—ওর যেন কোন অনিষ্ট না হয়। ছি ছি—কী বলছেন আপনারা, এ আমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাবিনি!'

যাই হোক্—শ্যামা কাঠ হয়ে রইল কদিন। সে যেন কণ্টকশয্যা। অক্ষয়বাবু নিজে একদিন উঠোনে দাঁড়িয়ে মাপ চেয়ে গেলেন। এক ধামা চালও পাঠিয়ে দিলেন এর ভেতর। তেরোদিন পরে ডাক্তার যেদিন বললে আর ভয় নেই—সেদিন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটি ঝুড়ি বোঝাই ক'রে এল সিধে—চাল ডাল তেল ঘি আটা ময়দা—মায় একটা শাড়ি পর্যন্ত।

সেই থেকে এঁরা আর বিশেষ ঘাঁটান নি শ্যামাদের। বরং বলা চলে, মঙ্গলা একটা রফাই ক'রে নিলেন। স্থির হ'ল যে বাগানে যা নারকেল পাতা পড়বে—মায় গাছ ঝাড়িয়ে যা কেটে ফেলা হবে, সব শ্যামা পাবে, তা থেকে ঝাঁটার কাঠি করিয়ে শ্যামা শহরে বিক্রি করতে পাঠাবে, শুধু সরকারদের দরকার-মত কিছু কিছু দেবে ওঁদের। আর জ্বালানী পাতা—অর্ধেক ওদের, অর্ধেক শ্যামার।

সেই শুরু হ'ল পাতা-জমানো।

এ বন্দোবস্তে শ্যামা খুশী হ'ল। নারকেল গাছ কম নয়—খ্যাংরা এক-একবারে পাঁচ সের আন্দাজ জমলে বয়ে বয়ে নিয়ে যায় সে শিবপুরের বাজারে। পাঁচ আনা ছ'আনা পয়সা হয়। তার সঙ্গে ফল-ফুলুরি কিছু কিছু বেচেও দু'চার পয়সা হয়।

অর্থাৎ কোনমতে উপবাসে শুকিয়ে মরাটা বাঁচে।

কমলা মধ্যে মধ্যে দু'পাঁচ টাকা অবশ্য পাঠায় ছেলেমেয়েদের নাম ক'রে। সে টাকা এলে তেল মশলা কাপড় ইত্যাদি কেনে শ্যামা—একেবারে কিনে ফেলে। নইলে ত শুধু নগ্নতার জন্যই বাইরে বেরোনো বন্ধ হয়ে উপবাস ক'রে মরতে হ'ত ওদের।

নরেন আজকাল আসে ছ মাস আট মাস অন্তর। কিছু কিছু হয়ত হাতে ক'রেই আসে কিন্তু সেগুলি নিজেই খেয়ে নিঃশেষ ক'রে যায়। এদের কথা চিন্তা করার অভ্যাস তার নেই।

কোথায় যায় সে, কোথায় ঘোরে—কী খায় কী করে—এ সব প্রশ্ন আজকাল আর শ্যামা করে না। সে সহজ ভাবেই মেনে নিয়েছে তার স্বামীভাগ্যকে। শুধু

ওর কথাবার্তার মধ্যে থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে সে একরকমের ভ্রাম্যমাণ পুরোহিতের পেশা থেকেই সাধারণত পেট চালায়—প্রয়োজন হলে চুরি-জুচ্চুরিতেও আপত্তি নেই। জুয়া খেলার কৌশল খুব ভাল রকম আয়ত্ত করেছে, এমন কি পথে-ঘাটে অপরিচিত লোকের সঙ্গেও খেলতে বসে যায়, জিতলে সে পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে সোজা কোন পতিতালয়ে বা মদের দোকানে গিয়ে ওঠে—আর হারলে অম্লান বদনে জানায় যে তার সঙ্গে কিছু নেই; সত্যি-সত্যিই থাকে না কিছু, সুতরাং বিজয়ী পক্ষ কিছুই করতে পারে না, কেউ শুধু গালাগাল দিয়ে ছেড়ে দেয়, কেউ দু'চার ঘা দেয় উত্তম-মধ্যম।

'ট্যাঁক থেকে যখন পয়সা খসছে না তখন আর কি, কোনটাতেই আমার আপত্তি নেই। যত মারই দিক, একপো ধেনো কিনে মালিশ করলেই গায়ের ব্যথা মরে যায়। হুঁ হুঁ বাবা, নগদ টাকা বার করবে এ শর্মার কাছ থেকে, এমন লোক এখনও জন্মায় নি।'

বিজয়গর্বে কথাগুলো প্রচার ক'রে নিজের বুকে নিজেই ঘুষি মারে!

দুই

বুদ্ধিটা মঙ্গলাই দেন। তাঁরও প্রয়োজন ছিল অবশ্য। বেচা ঠাকুর কিছুদিন ধরেই নানান্‌খানা রোগে ভুগছে—আজকাল পুজো করানো হয়েছে এক সমস্যা।

একদিন দুপুরবেলা এসে ওদের ঘরে জেঁকে বসে বললেন, 'এক কাজ কর্ বামুন মেয়ে, ছেলেটা ত আট বছরে পড়ল, ওর একটা পৈতে দিয়ে দে।'

'পৈতে! এরই মধ্যে?'...হক্‌চকিয়ে যায় শ্যামা, 'আমি কোথায় কি পাবো, কেমন ক'রে দেব?'

'যেমন ক'রে হোক দে। এই ত ঠিক পৈতের বয়স। পৈতেটা হয়ে গেলে পুজোটা ও-ই হাতে নিতে পারবে। নিত্যি নেই নিত্যি নেই, নিত্যি উপোস—সেটা ত ঘুচবে। চালটা হাতে পাবি, দুধ-বাতাসা থাকবে—এক রকম ক'রে চলে যাবে। চাই কি, গাঁয়ের দু-একটা মনসা পুজো লক্ষ্মী পুজো—এও কোন্ না করতে পারবে। আমাদেরই ত লেগে আছে বারো মাসে তেরো পব্ব।'

শ্যামা কথাটা ইদানীং ভাবে নি কোনদিন। এককালে সে-ই বলেছিল এই কথাই। কিন্তু এই নিঃস্বতার মধ্যে আর কিছু মনে ছিল না, সব ভুলে বসে ছিল। সে যেন আঁধারে কূল দেখতে পেলে। ছেলেটা এত বড় হয়ে গেল, লেখাপড়া শেখানোরও কোন ব্যবস্থা করতে পারে নি। যেটুকু নিজে জানত সেটুকু অবশ্য শিখিয়েছে কিন্তু আজকাল একটু ইংরিজী না জানলে কি চলে! কমলা লিখেছিল

ওকে তার কাছে পাঠাতে, শ্যামা তা পারে নি। সে থাকবে কাকে নিয়ে, কেমন ক'রে? শুধু ভালবাসার প্রশ্নও নয়—হাত-মুড়কুৎ ঐ ত একটি, রোজগার করতে—পুরুষমানুষ বলতেও ত ঐ এক।

না, হেমকে ছেড়ে দিতে পারবে না সে।

কিন্তু এ কথা হ'ল স্বতন্ত্র। হেমের যদি নিজস্ব উপার্জন কিছু হয়, তাহ'লে হেড-মাস্টারের হাতেপায়ে ধরে মিড্‌ল ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিতে পারে সে। সরকাররা বললে কিছু আর 'না' বলতে পারবে না। ওদেরই ইস্কুল।

এক নিমেষে বহুদূর পর্যন্ত ভেবে নিলে সে। কল্পনা চলে গেল অনেকখানি, অনেক বাস্তব বাধা ডিঙিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে। বিহ্বল ভাবে মঙ্গলার দিকে তাকিয়ে বসে রইল সে একদৃষ্টিতে।

খানিকটা ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে হাতে ক'রে আনা পিকদানীতে পিচ্‌ ক'রে খানিকটা পিক্ ফেলে মঙ্গলা বললে, 'কী হ'ল, অমন হাঁ করে চেয়ে আছিস কি? কী ঠিক করলি?'

'ঠিক?' যেন চমকে জেগে ওঠে শ্যামা, 'ঠিক আর আমি কি করব বলুন, আমার অবস্থা ত সবই জানেন?'

মঙ্গলা বিশেষ একরকম কণ্ঠস্বর বার ক'রে বললেন, 'নেকু! তা আর জানি নি? হ্যাঁ—আমরাও কিছু সাহায্য করলুম না হয়, পিঁটুকীকে না হয় ভিক্ষেমা ক'রে দিলুম ওর—এ সব কাজ ত খারাপ নয়, পুণ্যি আছে ওতে—কিন্তু তোর মা মাগীকেও এক কলম লেখ্‌ না। ঠিক কিছু পাঠাবে এখন ধার-দেনা ক'রে। তোদের আর কি, তোদের ত কলমের জোর আছে, কারুর খোশামোদ করতে হবে না, এক কলম নিজেই লিখবি, ডাকে দিবি, আর টাকা!...তবে তাও বলি, মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখতে নেই। তোর মা তোদের লেখাপড়া শিখিয়েছে ব'লেই এত দুর্দ্দশা। আমার বাবা আমাকে ঐজন্যেই লেখাপড়া শিখতে দেন নি। বলতেন মেয়েরা হ'ল লক্ষ্মী, ঘরের লক্ষ্মী পর হয়ে যাবে—সরস্বতীর সঙ্গে যে ওদের চিরকালের ঝগড়া। আসলে সরস্বতী ত লক্ষ্মীর সতীন; সতীন-কাঁটাকে কে দেখতে পারে বল্‌ মা?'

শ্যামা মাথা হেঁট ক'রে বসে রইল। আশা কি জিনিস তাই যখন সে ভুলতে বসেছে তখন এ কি এক নতুন শিহরণ নিয়ে এল নতুন আশা! তাহ'লে সেও কোনদিন দাঁড়াতে পারবে, মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে।

'কি করবি তাহ'লে?'

'চিঠি লিখব মা। আপনারাও একটু দেখবেন।'

'হ্যাঁ, তাই লিখিস। কত্তাকে আবার বলি। কত্তার হাতে এখন সব গিয়ে ড়েছে কিনা। যা চারদিকে চুরি ডাকাতি হচ্ছিল—ভয় ধ'রে গিয়ে আমার সব ঁজি-পাটা বার ক'রে ওর হাতে দিয়েছি, ও কি ব্যাং ম্যাং কোথায় রেখেছে ায়েবদের কাছে। এখন কতকটা ওর হাতে আমি। ওর হাত-তোলায় থাকা। দখি, আদায় করব'খন।'

টাকা রাসমণিও কিছু পাঠালেন। কমলাও। শ্যামা তা থেকে অনেকখান রিয়ে রেখে দিলে দুর্দিনের জন্যে। সে যতটা পারলে সরকারদের ওপরই চাপালে। াসমণি লিখেছিলেন কলকাতায় নিয়ে যেতে—তাহ'লে তাঁরাই পৈতেটা দিয়ে দিতে ারতেন, কিন্তু এইজন্যেই শ্যামা যায় নি। কি দরকার মায়ের গোনা পুঁজি সাবার! পরের ঘাড় দিয়ে যদি হয়ে যায় ত যাক না!

পৈতে হয়ে যাবার দিন সাত-আট পরেই নরেন কোথা থেকে এসে হাজির। সটা বিকেলের দিক, আবছা হয়ে এসেছে দিনের আলো। তবু উঠোনে পা দিয়েই হমকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি, মাথা ন্যাড়া কেন? গলায় ওটা কি? য়্যাঁ, ামাকে না জানিয়ে আমার ছেলের পৈতে দেওয়া হয়েছে! কার এত সাহস শুনি? ত বড় আস্পদ্দা? আমি কেউ নই, না? আমি হলুম ওর জম্মদাতা পিতে— ামাকে না জানিয়ে এত বড় কাজটা ক'রে বসল হুম ক'রে! মেয়েমানুষের এত াহস! আজ যদি গো'র-বেটার জাতকে এক কোপে সাবাড় না করি ত—'

যেন তুড়িলাফ খেয়ে নেচেকুঁদে পাগলের মত কাণ্ড বাধিয়ে তুললে নরেন। ্যামা গিয়েছিল পুকুরে—আসতে আসতে এই আস্ফালন শুনে সেও জ্বলে গেল, ুটে এসে রান্নাঘরে ঢুকে একেবারে উনুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে এনে লিলে, 'চুপ করবে, না জ্যান্ত এই নুড়ো জ্বেলে দেব! চুপ! আর একটা কথা না ুনি! পিতে! জম্মদাতা পিতে! লজ্জার মাথা ত খেয়েছ—হায়া-পিত্তি বলেও ক কিছু থাকতে নেই?'

ওর সেই রণচণ্ডী মূর্তির সামনে আস্তে আস্তে যেন কুঁকড়ে গেল নরেন।

'থাম্ থাম্, খুব হয়েছে। চুপ কর্।…একটু আগুন দে দেখি কলকেটায়!'

তারপর দাওয়ায় বসে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'ঐ পুঁটুলির মধ্যে এক কোণে একটু চা বাঁধা আছে। চা কর্ দিকি—খাই একটু।'

তারপর চা-তামাক খেয়ে একথা সেকথার পর সহসা যেন কথাপ্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল, 'ঐ দ্যাখ, আসল কথাটা বলা হয় নি। যেজন্যে হঠাৎ চলে এলুম! আমার বড় ভায়রা যে ফর্সা!'

'য়্যাঁ !' আর্তনাদ ক'রে উঠল শ্যামা। 'কি, কী বললে ?'

'অক্কা ! সাবাড় !' হি-হি ক'রে হেসে বললে নরেন, 'কলকাতায় গিয়েছিলুম, ওদের বাড়িওলার সঙ্গে ছাখা। তিন দিন হ'ল—কি একটা যাগযজ্ঞি করতে গিয়ে নাকি বুকে ব্যথা ধরে—ব্যাস, তাইতেই শেষ !'

সেই প্রথম আর্তনাদের পর শ্যামার কণ্ঠ থেকে কোন স্বরই বেরোয়নি নরেনই একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, 'মানে কথা, এবার তোমার দিদি বিধবা হ'ল। পয়সার ছ্যামাক এবার একটু কমবে। বেশি পয়সা যে কত্তা রেখে যেতে পেরেছেন তা না। হেঁ-হেঁ ! পুরোনো জামা দিয়ে গরীব বোনকে সাহায্য করা—এবার ওকে কে সাহায্য করে তাই ছাখো !'

যেন উল্লাসের স্বর ফোটে ওর গলায়।

তিন

শ্যামার হয়ত তখনই কলকাতায় চলে যাওয়া উচিত ছিল, খবরটা শুনে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া ওর হয়ে ওঠে না। কারণ বিস্তর। প্রথমত কমলার এই অবস্থায় সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সাহস সঞ্চয় করতে পারে না কিছুতেই। সে নিজে মেয়েছেলে, মেয়েছেলের এত বড় সর্বনাশ যে আর নেই তা বোঝে, বিশেষত হিন্দু বাঙালীর ঘরে। ওর সেই রাজেন্দ্রাণীর মত দিদি—চওড়া লালপাড় শাড়ি প'রে গয়নায় ঝলমল করত—তার নিরাভরণ শুভ্র বেশ দেখতে হবে, তার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। উঃ, দিদি না জানি কি করছে ! ওকে দেখলেই হয়ত চিৎকার ক'রে উঠবে—হয়ত আছড়ে পড়বে—। না, না—এখন সেখানে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, হেমকে সবে ইস্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। ইস্কুলের কর্তারা দয়া ক'রে বিনা মাইনেয় ভর্তি ক'রে নিয়েছেন কিন্তু ব'লেই দিয়েছেন কামাই করা চলবে না একদিনও। কামাই করলেই এ সব সুবিধা বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। বেচু চক্কোত্তি শয্যাগত—হেমই নিত্যসেবা করছে। নরেন ত পরের দিনই আবার উধাও হয়েছে। হেমকে কার কাছে কোন্ ভরসায় রেখে যাবে ? কে তাকে খেতে দেবে ?

তাছাড়া—তাছাড়া সে আবার অন্তঃসত্ত্বা। এ অবস্থায় হেঁটে যাওয়া !—এখন গিয়ে কিছু আর মার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেওয়াও চলবে না—আবার হেঁটেই ফেরা। বড় কষ্টকর !

সুতরাং চোখের জল চোখে চেপে শ্যামা দৈনন্দিন অভ্যস্ত জীবনযাত্রাতেই ফিরে আসে ধীরে ধীরে।

অবশ্য উমার চিঠিতে খবর সবই পাওয়া যায়।

কথায় বলে, 'অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর।' রাসমণির সেই অবস্থা। আঘাত খেয়ে খেয়ে তাঁর সমস্ত অন্তরই যেন পাষাণ হয়ে গেছে। নতুন কোন আঘাতের প্রতিক্রিয়া জাগা শক্ত, তবে বজ্রাহত-বনস্পতির মত খাড়া থাকলেও ভিতরটা বোধ করি আমূলই শুকিয়ে গেছে।

কমলা বাপের বাড়ি এসে ওঠে নি। ওর ভাশুর এবং দেওর আছেন অনেকগুলি, কিন্তু তার স্বামী ইদানীং তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে দেন নি। সুতরাং আজ এতদিন পরে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কি অভ্যর্থনা মিলবে তা কমলা অনুমান করতে পারে সহজেই। সাংসারিক জ্ঞান খুব বেশি না থাকলেও মানুষকে এটুকু সে চেনে। হয়ত তারা প্রথমেই তাড়িয়ে দেবেন না কিন্তু শীগ্‌গিরই এমন অবস্থা ক'রে তুলবেন যে আর টেঁকা যাবে না।

ওর স্বামী চাকরি করতেন কোন এক সওদাগরী ফার্মে, মাইনে মোটা ছিল না। কিন্তু শতকরা চার আনা কমিশন একটা পেতেন, তাতেই ওদের সচ্ছলে সংসার চলত। ঝি রাঁধুনী চাকর—এলাহি ব্যাপার ছিল। দু'একবার কমলা সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার যে চেষ্টা করেনি তা নয়, কিন্তু তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন বরাবর। বলেছেন, 'ভয় কি, আর কিছুদিন চাকরি ক'রে নিজের ফার্ম খুলব। মূলধন? এদের সঙ্গেই অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ করব—মূলধন কি হবে? আমাদের এই ছোট্ট সংসার, কিই বা ভাবনা? তার জন্যে এখন থেকে দুশ্চিন্তা ক'রে লাভ নেই। চলেই যাবে এক রকম ক'রে।'

চলেই হয়ত যেত—এমনিতেই। কিন্তু মরবার কিছুদিন আগে এক তান্ত্রিক এসে জুটেছিল। ঠিক দীক্ষাগুরু নয়—দীক্ষা নিয়েছিলেন কুলগুরুর কাছে—এমনি শিক্ষাগুরু বলা যেতে পারে। তারই প্ররোচনায় এক কালী স্থাপনা ক'রে জমি-জমা যেখানে যা কিছু ছিল সমস্তই দেবোত্তর ক'রে দিয়েছিলেন—নগদ টাকা সব খরচ হয়ে গিয়েছিল বাড়ি ও মন্দিরে। সেই তান্ত্রিক তার আইনসম্মত সেবাইত এখন। সে অবশ্য বিধবাকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করে নি কিন্তু কমলা সংক্ষেপে বলেছিল, 'ঐ ত আমার স্বামীকে খুন করেছে! ওর আশ্রয়ে ছেলে মানুষ করার আগে ছেলের মুখে বিষ তুলে দেব…।'

এই নতুন মন্দিরেই কি একটা তান্ত্রিক-ক্রিয়া করতে গিয়ে হঠাৎ বুকে ব্যথা ওঠে তাঁর—অজ্ঞান হয়ে যান। সেই অবস্থাতেই একদিন পরে হয় মৃত্যু, কমলাকে কিছু বলেও যেতে পারেন নি।

কমলার নিজের হাতে যৎসামান্য নগদ টাকা যা ছিল তা এই ক'দিনেই শেষ হয়ে গেছে শ্রাদ্ধশান্তি করতে। অফিস থেকে প্রাপ্য কিছু ছিল কমিশন আর মাইনে বাবদ, তার সঙ্গে সামান্য যোগ ক'রে দিয়ে পাঁচশ টাকা দিয়ে গেছে তারা। আর আছে গায়ের গহনাগুলো। কমলা এই বিপদে একটুও মাথা গুলিয়ে ফেলে নি, সে শুধু বালা জোড়াটা গোবিন্দর বৌয়ের জন্য এবং গোবিন্দর অন্নপ্রাশনের গহনাগুলো তার ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে তুলে রেখে বাকী সব গহনাগুলো বেচে দিল। সবসুদ্ধ বাইশ'শ টাকা। এই টাকাটা একেবারে সে তুলে দিলে ওর স্বামীর বন্ধু এক সুবর্ণ-বণিক ব্যবসায়ীর গদীতে। তিনি পাকা রসিদ দিয়ে টাকাটা নিলেন—কথা রইল টাকাটা যথেচ্ছ খাটাবেন তিনি—লাভ-লোকসান তাঁর—তিনি শুধু এর সুদ বাবদ মাসে আঠারো টাকা ক'রে দেবেন কমলাকে।

কমলা অতঃপর ফার্নিচার পর্যন্ত বেচে দিয়ে মাসিক চার টাকা ভাড়ায় এক-খানি ঘর নিয়েছে এবং ছেলেকে নিয়ে সেইখানেই এসে উঠেছে। ভদ্র ব্রাহ্মণ-বাড়ির মধ্যে ঘর—সব দিক দিয়েই নিরাপদ আশ্রয়। অতঃপর সে ঐ আয়েই দিন গুজরান ক'রে ছেলেকে মানুষ ক'রে তুলবে, এই তার প্রতিজ্ঞা। মা তাঁর দুটি যমজ মেয়েকে নিয়েই বিব্রত, আবার তার ওপর বোঝা চাপাবে না কমলা—এই এক কথা, দ্বিতীয় কথা, যা অনেক পরে প্রকাশ পেয়েছে, মেয়েদের বিধবা হবার পর বাপের বাড়ি গিয়ে ওঠা তার স্বামী একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি নাকি অনেকদিন আগে একবার বলেও ছিলেন, 'যদি তেমন কোন দুর্দিন আসে ত চেষ্টা ক'রো ছেলেকে নিজেই মানুষ ক'রে তুলতে। তার জন্যে যদি গতর খাটাতে হয় ত লজ্জা নেই, কিন্তু বিধবা মায়ের কাছে গিয়ে উঠো না। সে বড় অশান্তি। দুই বিধবা বোন বাপের বাড়ি থাকলে আগুন জ্বলে। ওতে মন ছোট হয়ে যায়—ছেলেও মানুষ হয় না। তোমার উমা ত বিধবারই সামিল?'

খবরটায় কমলার জন্য দুঃখবোধ একটু করে বৈকি শ্যামা। আহা, সেই দিদি—তার কখনও কিছু করা অভ্যাস নেই, কখনও এক গ্লাস জল পর্যন্ত গড়িয়ে খায় নি! সে কি পারবে এত সব কাজ গুছিয়ে করতে? ঐ ত আয়! খুব কষ্ট না করলে দুটো পেট চালিয়ে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারবে না। আবার মনে মনে কোথায় যেন একটু আশ্বস্তও হয়। তার মনের গোপন কোণে বিশ্বাস বাসা বেঁধে আছে বহুদিন থেকেই যে, এখনও তার মায়ের হাতে কিছু সোনা আছে। এবং সেটা তিনি মরবার পর উমা ও শ্যামার মধ্যেই ভাগ হবে। কিন্তু কমলা এসে উঠলে সেও ত ভাগ পেত।

কমলা এসে ঐ বাড়িতে না থাকলেও যে তার এক ভাগ পাওনা হয় ন্যায়ত

ধর্মত—এবং এখন তার যা অবস্থা তা'তে পাওয়াই উচিত—এ কথাটা কে জানে কেন শ্যামা একবারও ভাবে না। তার আত্মকেন্দ্রিক মন নিজের দাবীটাকেই সর্বদা বড় ক'রে দেখে।

চার

এবারেও মঙ্গলা ঠাকরুণই কথাটা পাড়েন, 'হ্যাঁলা, মেয়ের বিয়ে দিবি? ছাখ্—দিস্ ত দে!'

আকাশ থেকে পড়ে শ্যামা। মেয়ের বিয়ে! তার মেয়ে যে সবে সাত পেরিয়েছে!

'আহা, তা হোক না সাত বছর। এই ত বিয়ের বয়স। অষ্টম বর্ষে গৌরীদান। তারও ত একটা পুণ্য আছে। তোর ভালর জন্যেই বলছিল। নইলে ব্যাটাছেলের আবার বিয়ের ভাবনা? কত মেয়ের বাপ তাদের দোরের মাটি রাখছে না। আমার কথাটা মনে পড়ল তাই। বলি ফুটফুটে মেয়ে তোর, হয়ত ওদের নজরে পড়ে গেলেও যেতে পারে। এই ফাঁকে পার হয়ে যায় ত যাক।'

লোভে কম্পমান হয় শ্যামার মন, যেদিন থেকে মেয়ে হয়েছে সেই দিন থেকেই ত বলতে গেলে দিন গুনছে। বরং বলা চলে যে, মেয়ে হবার আগে থেকেই দিন গুনছে—কবে মেয়ে হবে! মেয়ে হ'লে শীগ্‌গির কুটুম হয়, নাতি-নাতনী—ছেলের বিয়ের জন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়।

'কিন্তু মা, আসল কথাটা যে ভাবছেন না! আমার হাতে কিছুই নেই। কোথায় কি পাবো বলুন ত? আবার এই একটা মেয়ে হ'ল। এরই দেনা এখন শোধ হয়নি!'

'বলি, গায়ে গু মাখলে ত আর যমে ছাড়বে না! আমাদের হিঁদুর ঘরে মেয়ে যখন বিইয়েছিস্ তখন বিয়ে দিতেই হবে—খেতে পাস্ না পাস্। মেয়ে দেখা না—দেখাতে দোষ কি? দেখালেই ত আর বিয়ে হচ্ছে না। পছন্দ হলে চাই কি টাকা-কড়ি নাও নিতে পারে।'

কথাটা শ্যামার মনে লাগল। হেম আর একটা নিত্যসেবার কাজ পেয়েছে। এ গ্রামের বাইরে সেটা—প্রায় মাইল খানেক হেঁটে যেতে হয়। তা হোক—রাত চারটেয় উঠে হেম আগে সেখানে চলে যায়, তারপর এখানের পূজো শেষ ক'রে পড়তে বসে। খুব জোরে যায় আর জোরে আসে—ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগে না। সেখানে ব্যবস্থা ভাল, চাল ঐ আধসেরই বটে, কিন্তু তেমনি মাসে তিন টাকা মাইনে। রাত্রে শেতলে দু'খানা বড় বাতাসা—একপো দুধ। সেটা ঠিক বামুন-

কায়েতের বাড়ি নয়—কিন্তু যাঁর আপত্তি হতে পারত সেই মঙ্গলা ঠাকরুণই অভয় দিয়েছেন, 'কে বা আজকাল অত সব মানছে, তুমিও যেমন! ঐ বেচাই লুকিয়ে লুকিয়ে করত। নিয়ে নে—নিয়ে নে, ভাতের দুঃখ ত ঘুচবে।'

বেচু অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে এমনি মনসাপুজো, লক্ষ্মীপুজোও দু'একটা পায় হেম—অর্থাৎ ঠিক উপবাস করার অবস্থাটা ঘুচেছে। আর একটি শিশু এসেছে কোলে বটে—চাঁদের মত রং, পদ্মফুলের মত সুন্দর মেয়ে। কমলা চিঠিতে নাম পাঠিয়েছে ঐন্দ্রিলা। সে যাক—তার আর কতই খরচা! যদি মা কিছু দেয় এবং মঙ্গলা যদি কিছু ধার বলেও দেন ত কোনমতে কাজ সারা যেতে পারে হয়ত, দেনা সে রাখবে না—যেমন ক'রেই হোক কষ্ট ক'রে কাজ সারবে।

আয়ের ইদানীং আর একটা পথও বেড়েছে। মৌড়ীর কুণ্ডুবাবুরা সাতখানা গাঁয়ে ক্রিয়াকর্মে সামাজিক বিলোন, পুজাপার্বণে ছাঁদা দেন। এ গ্রামও সেই তালিকায় পড়ে; ব্রাহ্মণমাত্রেই পায়—এতদিন এরা পায়নি স্থায়ী বাসিন্দা নয় বলে। বহুদিনের চেষ্টায় ওদের খাতায় নাম উঠেছে। সামাজিক মানে নিমন্ত্রণের সঙ্গে একটা পেতলের হাঁড়ি কিংবা ঘড়া ক'রে তেল নয়ত কাঁসার থালায় সন্দেশ দিয়ে যায় বাড়ি বাড়ি। তেলটা ঘরে থাকে, বাসনটা বিক্রি করা যায়।...আর পূজায় রাসে ছাঁদার ব্যবস্থা আছে—মাথাপিছু ষোলখানা লুচি ও বারোটা সন্দেশ। তিন-চার দিন ধরে সপরিবারে খাওয়া চলে। সদ্যোজাতা ঐন্দ্রিলাও এ ছাঁদার অধিকারী।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে শ্যামা মনে মনে কত কি স্বপ্নজাল বোনে, কল্পনায় বহুদূর এগিয়ে যায়। তারপর বলে, 'বেশ ত, দেখুন না মা। তা ছেলে কি করে, বয়স কত?'

ছেলে নাকি ঐ মৌড়ীগ্রামেই থাকে—মঙ্গলার কাছে যা খবর পাওয়া গেল। কোন্ এক বিলিতি কারখানায় কাজ করে, উনিশ টাকা আন্দাজ মাইনে পায়; রোজ হিসেবে মাইনে, ঐ রকমই দাঁড়ায়। মা আর দু'টি ছোট ভাই আছে সংসারে। দুটো বোনও বুঝি আছে। পৈতৃক বাড়ির ভাগ খান-দুই ভাঙাঘর আছে, তবে জমি আছে অনেকখানি—প্রায় তিন-চার বিঘের বাগান।

মঙ্গলা বললেন, 'ব্যাটাছেলে, রোজগার করছে, বাড়ি করতে কতক্ষণ! জমি আছে, বাড়ি তুলে নেবে দেখিস্—দেখতে দেখতে। তারপর তোর মেয়ের বরাত। যদি তেমন তেমন পয় ফলাতে পারে ত ওর আয়ও বেড়ে যাবে না কি চড়চড় ক'রে?'

'বয়স কত মা—ছেলের?'

'বয়স?' একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বোধ করি হিসেব করারই চেষ্টা করেন

মঙ্গলা, 'বয়স আর কত, তেইশ-চব্বিশ হবে বড়জোর।'

'চব্বিশ বছর। আমার মেয়ে যে মোটে সাত বছরের মা!'

'ওমা, বলিস্ নি ওসব কথা। সাত বছর কি সোজা বয়স মেয়েছেলের? আগে ত এই বয়সে বিয়ে না হ'লে লোকে নিন্দেই করত। আর ৬ বরের কথা যদি বলিস—বেটাছেলের আবার বয়স কি লা? দোজবরে ত নয়। আগে ত শুনেছি তোদের কুলীন বামুনের ঘরে পাঁচ বছরের মেয়ের সঙ্গে ষাট বছরের ঘাটের মড়ার বিয়ে হ'ত।'

তবু শ্যামা চুপ ক'রেই আছে দেখে মঙ্গলা ঠাকরুণ আবার বললেন, 'আর বামুনের ঘরের কথাই বা কেন—আমারই ত বড় জা রয়েছে, তুই ত দেখেছিস তাঁকে, ঐ যে পিঁটকীর কোলের ছেলেটার অন্নপ্রাশনে এসেছিল! এয়োরাণী ভাগ্যিমানী পাকা চুলে সিঁদুর পরছে—কিন্তু ওদের কি বিয়ে হয়েছিল শুনবি? আমার জায়ের যখন পাঁচ বছর, তখন বট্‌ঠাকুর আটাশ পেরিয়ে উনত্রিশে পড়েছেন। বাইরে বাইরে পশ্চিমে ঘুরে কাজ-কর্ম করতেন, বিয়ে করবার ফুরসুত পান নি। তারপর হঠাৎ ঠাকুরের কানে গেল যে ছেলের স্বভাব-চরিত্তির বিগড়েছে, যেখানে থাকতেন সেখানে নাকি ইহুদী ম্যাম্ রেখেছেন বাধা। যেমন কানে যাওয়া অমনি তার পাঠিয়ে দিলেন, মা মরো-মরো, ঝট্ ক'রে চলে এসো। ছেলে যেদিন এসে পৌঁছল সেইদিনই দিলেন পিঁড়িতে বসিয়ে তিন-চার দিন মোটে সময়, মেয়ে ত আর দেখবার সময় পেলেন না—হাতের কাছে ছিল ঐ পাঁচ বছরের মেয়ে, তাই সই!...তা সে যা মজা মা বুঝলি, লজ্জার কথা এসব কাউকে বলিস নি, বলতে গেলেও হাসি পায়—আমার জা ফুলশয্যের রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে কাপড়-খানা গুটিয়ে বগলে চেপে ভাশুরকে ডাকছে—ও বল্ বল্, শুনছ, আমার যে পেচ্ছাপ পেয়েছে, দাঁড়াবে চলো।...বল্ দিকি কি কাণ্ড?'

মঙ্গলা হা-হা ক'রে হেসে ওঠেন।

শ্যামা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তা দেখুন মা, যা ভাল বোঝেন। আপনাদের দয়া হ'লে মেয়ে পার হয়েই যাবে।'

'হ্যাঁ—যাই আবার আবার দেখি—পিঁটকী হয়ত দোর-তাড়া খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়ল! ওর কাণ্ড! মেয়েটা বড্ড বাউণ্ডুলে!'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এক

সত্যি-সত্যিই যে মহাশ্বেতার এখানেই বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে তা শ্যামা কখনও ভাবে নি—এমন কি যখন দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গেল তখনও যেন তার বিশ্বাস হ'তে চায় না কথাটা। তা মঙ্গলা করেছেনও ঢের—তিনি একরকম জোর ক'রেই ছেলের মাকে চেপে ধরে এ সম্বন্ধে রাজী করিয়েছেন। একান্ন টাকা নগদ, চেলির জোড়, তিনখানা নমস্কারী, দানের বাসন আর দু'গাছা সোনাবাঁধানো পেটি এই দিতে হবে। বাসন কিছু কিছু মঙ্গলা নিজের ঘর থেকে বার ক'রে দিলেন—ঝালাই পালিশ ক'রে নেওয়া হ'ল। নগদ টাকাটা রাসমণি পাঠালেন। কমলা এত দুঃখের মধ্যেও পাঁচটা টাকা নগদ আর একখানা পার্সী শাড়ী পাঠিয়েছে। উমা ইদানীং ক্রুশ বুনে খুঞ্চিপোশ ক'রে বিক্রি করে—তার হাতেও দু'চার টাকা জমেছে, সে তা থেকে পাঠিয়েছে পাঁচ টাকা। আর এধার-ওধার ক'রে কিছু চেয়ে-চিন্তে আনলে শ্যামা। একরকম ভিক্ষে ক'রেই। বাকী কিছু ধার হ'ল। মঙ্গলাই ধার দিলেন। কথা রইল মাসে মাসে দু এক টাকা ক'রে শ্যামা শোধ করবে—মঙ্গলা সুদ নেবেন না।

শ্যামা পুরোনো ঠিকানায় বড় জায়ের নামেও একখানা চিঠি দিয়েছিল কিন্তু কোন উত্তর এল না। তবে আর একটা দিক থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে কিছু এসে গেল। না এলে শ্যামা বিব্রত হ'ত—কারণ বরযাত্রী আসবে ত্রিশজন এ তাঁরা বলেই দিয়েছিলেন, ওটা কিছুতেই কমানো গেল না। বরদের নিকট-আত্মীয়ই নাকি ওর চেয়ে বেশি। এখানেও দু-একজনকে না বললে চলবে না! সরকারদের বাড়িতেই ছেলেবুড়ো নিয়ে বাইশ জন। পাড়াতেও আছে। মঙ্গলা অবশ্য বারণ করেছিলেন এত হাঙ্গামা করতে কিন্তু শ্যামার তাতে মন ওঠে নি। এই প্রথম সন্তানের বিয়ে ওর, এই প্রথম কাজ ওর নিজের জীবনে ও সংসারে। যে রকম দেখে ও অভ্যস্ত বাল্যকাল থেকে, ঠিক সেরকম হবে না তা ত সে নিজেও জানে কিন্তু তাই বলে একেবারে সব কিছু বাদ,—সে সম্ভব নয়।

তাছাড়া মরুভূমে ওয়েসিস্ দেখা গেছে, তৃষ্ণার্ত পথিকের মন হয়ে উঠেছে দুরাশা-চঞ্চল। এখনই কত কি স্বপ্ন দেখছে ওর কল্পনা—কত কি সুদূর ও অসম্ভব স্বপ্ন। মনে তাই জোরও এসেছে—ঋণ করতে যেন আজ আর ভয় নেই। মনে মনে কোথায় এ আশ্বাস ওর জেগেছে যে, এ দেনা শোধ হয়ে যাবেই।

তবুও হয়ত শেষে সামলানো যেত না—যদি না একত্রিশটা টাকা ভগবান প্রায় ছপ্পড় ফুঁড়ে দিতেন। মঙ্গলা বললেন 'মেয়েরই পয় বামুন মা। মেয়ে আয়-পয় ফলাবে বলেই মনে হচ্ছে।'

কি ক'রে যে টাকাটা এল—তা আজও যেন শ্যামার ধারণার অতীত। অত সাহসই যে কে ওকে দিয়েছিল! সত্যিই বোধ হয় ভগবানের হাত।

বিয়ের ঠিক তিনদিন আগে নরেন এসে পড়ল কোথা থেকে—একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে। হাতে কচুপাতায় জড়ানো খানিকটা হরিণের মাংস আর সের দুই ময়দা।

'ভাল ক'রে প্যাঁজ দিয়ে রাঁধ্ দিকি মাংসটা! চাট্টি খড় দিয়ে আগে সেদ্ধ ক'রে জলটা ফেলে দিস্—নইলে মেটে মেটে গন্ধ ছাড়বে, খেতে পারবি না!'

তারপরই ওর চোখে ধরা পড়ল আয়োজনটা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে, 'এ সব ব্যাপার কি? য়্যাঁ? এত সব চক্‌চকে বাসন, নতুন চৌকি, বরণডালা—বলি মতলবটা কিসের? কার বে?'

শ্যামা হাত থেকে মাংসটা নিয়ে রান্নাঘরে রেখে ঘটি ক'রে জল এনে দাঁড়িয়েছিল, 'হাতটা আগে ধুয়ে নাও দিকি, বিয়ের খবর পরে নিলেও চলবে।'

নরেনের স্বর সপ্তমে চড়ে গেল, 'না, পরে নেবো না আমি। ওসব চালাকি চলবে না, বল্ শীগ্‌গির কার বে···নইলে অনর্থ করব!'

'বিয়ে আবার কার? তোমার মেয়ের!'

'এঁ!' অদ্ভুত একটা স্বর বার করে নরেন গলা দিয়ে, 'আমার মেয়ের বিয়ে! আমি জানলুম না—আমার মেয়ের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল! দেওয়াচ্ছি আমি বিয়ে, ভাল ক'রে দেওয়াব। ঐ এক পাত্তরে তোদের মা-বেটি দু'জনকে পার করব—এই বলে রাখছি। দেখে নিস!'

সে কি আস্ফালন ওর! যেন ধেই ধেই ক'রে নাচতে লাগল সারা উঠোনটা-ময়।

তবু শ্যামার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। সে বুঝিয়েই বলতে চেষ্টা করলে, 'ছাখো—মিছিমিছি ছোটলোক্‌মি ক'রো না বলে দিচ্ছি। তুমি কি বাড়িতে থাকো, না আমাদের খবর রাখো? তোমাকে বিয়ের কথা জানাবো কি, আমরা ক'দিন অন্তর খাই সে খবরটা জানবার চেষ্টা করেছ কখনও?'

'থাম্ হারামজাদী, ওসব লম্বা লম্বা বাত রাখ্! আমার মেয়ের বে আমি দোব না, দোব না। বলে পাঠা তাদের এখুনি যে ওসব চলবে না। তারপরও যদি বিয়ে

করতে আসে ত এই নাদ্না রইল, সব কটার মাথা যদি না ফাটিয়ে দিই ত আমার নাম নেই !'

চেঁচামেচিতে কখন অক্ষয়বাবু এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন ওরা কেউ টের পায় নি। তিনি এইবার একটু মুচকি হেসে বললেন, 'কিন্তু তাতে জেল হবে যে —চাই কি কেউ খুন হ'লে ফাঁসিও হতে পারে।'

'জেল হয় খেটে নেব। তাতে কি, ও আমার অভ্যেস আছে। জেলকে ভয় করিনে। মোদ্দা মেয়ের বে আমি দিতে দোব না। দেখি কেমন ক'রে ছায়। উঁ! মেয়ের বে দিয়ে উনি নিশ্চিন্ত হবেন! আমি বেঁচে থাকতে সেটি হচ্ছে না!'

অহেতুক একটা আক্রোশ যেন ওর কণ্ঠে।

অকস্মাৎ বোধ হয় ভগবানই বুকে দুর্জয় সাহস এনে দিলেন। শ্যামা মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে অক্ষয়বাবুকে উদ্দেশ ক'রে বললে, 'আপনি একটু আসুন ত বাবা আমার সঙ্গে, আমি থানায় যাবো!'

থানা শব্দটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই বেলুন যেন চুপ্‌সে গেল।

'উঃ! তবে ত ভয়ে আমি একেবারে কেঁচো হয়ে যাবো।...যা না থানায়, থানায় গিয়ে কি বলবি তাই শুনি!'

কথাগুলো বলে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে যে আর জোর নেই তা উপস্থিত সকলকার কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আর ওর সেই জোরের অভাবটাই যেন শ্যামার মনে অভূতপূর্ব একটা জোর এনে দেয়। কোথা থেকে যেন কথাগুলোও কে জুগিয়ে দেয় ওর মুখে, সে বেশ শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'বলব যে তুমি রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে জুয়া খেল, আমি তা জেনে পুলিসে খবর দেব বলেছিলুম তাই তুমি চেঁচামেচি মারধোর করছ। কনস্টেবল্ চাইব তোমাকে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্যে—'

এবার সত্যিই জোঁকের মুখে নুন পড়ল। মুখ কালি ক'রে একরকম ক্ষীণ কণ্ঠেই নরেন বললে, 'যা না—বলগে যা না। বললেই অমনি তারা বিশ্বাস করছে কি না। সাক্ষী চাই নে, প্রমাণ চাই নে, কিচ্ছু না! এ যেন শ্বশুরবাড়ি!'

তারপর গলা আরও নামিয়ে এনে বলে, 'বেশ ত দিগে যা না তোর মেয়ের বে। আমার কি? আমি ত তোর ভালর জন্যেই বলছি। বলি কে না কে ঠকিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে যাবে। তুই ত বুঝিস্ ছাই—মেয়েমানুষ দশহাত কাপড়ে কাছা আঁটতে পারে না—বুদ্ধি ত একতিল ঘটে নেই। শুধু নাচতেই জানিস্।'

অক্ষয়বাবু এবার একটু তিরস্কারের ভঙ্গীতেই বললেন, 'মেয়ের আমার যদি বুদ্ধি না থাকত তাহ'লে কি আর তুমি বাঁচতে ঠাকুর, না এই সংসারটাই বজায় থাকত!

…ও যা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছে, তা তোমার ইহজীবনে জুটত না। নাও, আর বেশি গোল ক'রো না। চুপচাপ শুয়ে পড়োগে।…হ্যাঁ, আর দেখো, যেন মেয়ের দানের বাসনগুলো চুরি ক'রে বেচে দিয়ে এসো না! তাহ'লে কিন্তু মেয়ে যাক না যাক আমিই থানায় যাবো।'

সত্যি-সত্যিই চাদরটা খুলে আলনায় রেখে গজগজ ক'রে বকতে বকতে গিয়ে নরেন বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পরের দিন দুপুরবেলা ভাত চাপিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে টাকার কথাটাই ভাবছে শ্যামা, পিঁটকীর মেজ মেয়েটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, 'জানো বামুন মাসি, বামুন মেসোর কাছে অনেক টাকা আছে, অ-নে-ক টাকা।'

'তুই কি ক'রে জানলি?' শ্যামার চোখ-দুটো যেন লোভে আগ্রহে জ্বলে ওঠে।

'এই যে এখন পুকুরে নাইতে নেমেছিল না? নেয়ে উঠে ভিজে কাপড়ের সঙ্গে কোমর থেকে একটা গেঁজে খুলে কতকগুলো টাকা বার ক'রে পুকুরপাড়ে ঘাসের ওপর রেখে গেঁজেটা শুকুতে দিয়েছে। আর বসে বসে তাই পাহারা দিচ্ছে।'

তবু যেন বিশ্বাস হয় না কথাটা। শ্যামা ঈষৎ সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করে, 'কি ক'রে জানলি সেটা গেঁজে? তুই গেঁজে কাকে বলে জানিস্?'

'হুঁ--' লম্বা সুরে টেনে বলে কালীতারা, 'গেঁজে জানি নি! দাদু কোথাও টাকা নিয়ে যেতে হ'লেই ত গেঁজেতে ক'রে নিয়ে যায়!'

শ্যামা ওর গাল টিপে আদর ক'রে বলে, 'বড় ভাল খবর দিয়েছিস মা!'

'আমায় বেশি ক'রে আনন্দনাড়ু খাওয়াবে!' উৎসুক আগ্রহে প্রশ্ন করে কালী।

'নিশ্চয়। যত খেতে পারিস্!'

তখন আর উচ্চবাচ্য করলে না শ্যামা। বিকেলের দিকে যখন বিয়ের নানা যোগাড় উপলক্ষে মঙ্গলা এসে বাইরের রকে জাঁকিয়ে বসেছেন, শ্যামা সোজাসুজি গিয়ে নরেনকে বললে, 'কৈ কুড়িটা টাকা দাও ত, আমি আর কিছুতেই পেরে উঠছি না। ময়দা ঘি, এখনো সব বাকী, তবু ত মাছ মা কাল পুকুর থেকে ধরিয়ে দেবেন বলেছেন।'

'টাকা! টাকা আমি কোথায় পাবো? এক পয়সা নেই আমার কাছে।…আর ঘি কি হবে, তেলেভাজা লুচিই ত বেশ! কিংবা ভাত খাওয়াগে যা। বামুনবাড়ি তাতে দোষ নেই। পূজুরী বামুনের মেয়ের বিয়ে—তাতে আবার লুচি!'

শ্যামা বললে, 'এ তোমার গুপ্তিপাড়া নয়--এখানে তেলেভাজা লুচি খাওয়ানোর রেওয়াজ নেই। ভাত ত খাবেই না। দুপুরে বৌভাতের যজ্ঞি হ'লে চলত। বিয়েতে

ভাত খাওয়াতে গেলে নিন্দে হবে। আর শুধু ত বিয়ের রাতই নয়—ফুলশয্যে পাঠানো আছে, দশটা টাকার কম কি ফুলশয্যে পাঠানো হবে!'

'তবে মরগে যা। আমি কি জানি, লবাবী করতে হয় নিজের কোমরের বল বুঝে করবি!'

'কোমরের বল বুঝেই ত করছি। যা কিছু ত আমিই করছি, আর করছেন মা। তুমি যে জন্মদাতা পিতে বলে চেঁচাও—তা তুমি কি করলে তাই শুনি। মেয়ে তোমার নয়?'

'মেয়ে আমার তা হয়েছে কি। আমি ত আর বিয়ে দিতে যাই নি। আমার যখন ক্ষ্যামতা হ'ত আমি বিয়ে দিতুম! তুই কি আমার মত নিয়ে বিয়ে ঠিক করিছিলি?'

'বেশ ত—তা যেমন করিনি তোমার ভরসায় ত ছিলুমও না। এসে পড়েছ, টাকাও আছে, তাই চাইছি। সংসারটা ত তোমার, সংসার-খরচ বলেই না হয় কিছু দিলে।'

'আমি—আমার কাছে টাকা!' যেন আকাশ থেকে পড়ে নরেন। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় একেবারে, 'আমি কোথায় টাকা পাবো? মাইরি, মা কালীর দিব্যি বলছি, আমার হাতে এক পয়সাও নেই।'

বাইরে থেকে মঙ্গলাও কতকটা স্বগতোক্তি করলেন, 'তুই আর টাকা চাইবার লোক পেলি নে বামুন মেয়ে! ওর কাছে আবার টাকা!'

কিন্তু শ্যামার মুখ ততক্ষণে কঠিন হয়ে এসেছে, সে এক পা কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'ত্যাখো, জেনেশুনে মিছিমিছি দিব্যিগুলো গেলো না বলে দিলুম। টাকা আমার চাই-ই—ভাল চাও ত দাও, নইলে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!'

'মিছিমিছি!' আরও আকাশ থেকে পড়ে যেন নরেন, 'এ যদি মিছে হয় ত কি বলিছি, তোর ঐ ছেলের দিব্যি বলছি—আমার হাতে এক পয়সাও নেই! বলিস্ ত ছেলের মাথায় হাত দিয়ে—'

'ফের!'

বলেই শ্যামা ওর কোমরে কোঁচার যে কাপড়টা সযত্নে জড়ানো বাঁধা ছিল তাতে এক হ্যাঁচকা টান মেরে গেঁজেটা টেনে বার করলে। হয়ত ভাল ক'রে মুখবন্ধ ছিল না বা আর কিছু—গেঁজেটায় টান দিতেই ঝন্‌ঝন্ ক'রে টাকাগুলো ছড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

সত্যিই যে ওর কাছে অতগুলো টাকা আছে তা শ্যামা আশা করে নি। সে

মুহূর্তকয়েক যেন সেই রজতমুদ্রা বর্ষণের শব্দের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু সে যথার্থই কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই ক্রোধে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে, যতটা শক্তি ওর হাতে ছিল তার সবটা প্রয়োগ ক'রে মারলে এক চড় নরেনের গালে! বহুদিনের বহু সঞ্চিত ক্ষোভ, স্বামীর অমানুষিক আচরণের জন্য সমস্ত তিক্ততা ওর অন্তরে যা জমেছিল এতকাল—তা যেন ঐ চড়ের শক্তি ও প্রেরণা জোগাল ওকে নিজের অজ্ঞাতসারে, সম্পূর্ণ অতর্কিতে। এ ঘটনার পূর্বমুহূর্তেও এ ছিল ওর ধারণার অতীত, পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত রইল তা বিশ্বাসের বাইরে। জ্যেষ্ঠ এবং একমাত্র পুত্রসন্তানের নামে মিথ্যা দিব্যি গালাতেই ওর এতকালের সঞ্চিত চিত্তক্ষোভের বারুদে অগ্নিসংযোগ হয়ে গেল। এ বোধ হয় পৃথিবীর সমস্ত মায়েরই সহ্যের বাইরে!

যাই হোক—চড় মেরেও দু'তিন মুহূর্ত ব্যাপারটা মনের মধ্যে ধারণা ক'রে নিতে দেরি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারপরই শ্যামা মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে টাকাগুলো কুড়িয়ে নিতে শুরু করলে। মোট যতটা পাওয়া গেল—একত্রিশটা টাকা। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে দেখলে আরও, তক্তাপোশের নিচে, বাক্সের পাশে —আর পাওয়া গেল না।

একত্রিশ টাকা একসঙ্গে পাওয়াই ওর কাছে অবিশ্বাস্য।

নরেন কিন্তু বেশী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটায়। সত্যিই যে শ্যামা কোনদিন ওর গায়ে হাত তুলবে এ সে কল্পনাও করতে পারে নি। ওর কেমন একটা ভয় হয়ে গেল—নইলে তখনও হয়ত কাড়াকাড়ি ক'রে কয়েকটা টাকা বাঁচানো চলত। কিন্তু সে চেষ্টাও সে করলে না—তেমনি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে, শ্যামা মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে টাকাগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুলে নিলে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে মঙ্গলার সামনে এসে বসে পড়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'দেখলেন! দেখলেন হারামজাদীর কাণ্ডটা, দেখলেন? আমার গালে পাঁচ আঙুলের দাগ পড়ে গেছে একেবারে। জ্বালা করছে আমার গালটা।'

মঙ্গলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'তোমার যা কেলেঙ্কার ঠাকুর, আর ব'লো না! নিজের মেয়ের বে—কুড়িটা টাকা চেয়েছিল, সহমানে দিয়ে দিলেই হ'ত তা নয় আবার ছেলেটার নাম ক'রে মিথ্যে দিব্যি গালা! গলায় দড়িও জোটে না! দড়ি না জোটে ঐ পৈতেগাছটা ত আছে, আর আমি কলসী দিচ্ছি, গলায় বেঁধে পুকুরে গিয়ে ওলো গে।...লজ্জা করে না আবার নাকে কাঁদতে! বেশ করেছে মেরেছে। আমরা হ'লে অমন ভাতারের পাতে আকার ছাই বেড়ে দিতুম।'

টাকার শোকে সেদিন নরেন রাত্রে খেলে না—পরের দিন যেন কতকটা

প্রতিশোধ নেবার অভিপ্রায়েই আবার ডুব মারলে বাড়ি থেকে। শ্যামা যতটা সম্ভব চোখে চোখে রেখেছিল বলে আর কিছু নিতে পারে নি, শুধু একখানা কোরা কাপড় কি ক'রে চাদরের মধ্যে লুকিয়ে নিয়েছিল—ওরা কেউ টের পায় নি। খোঁজ করে যখন পাওয়া গেল না তখন সকলেই ব্যাপারটা অনুমান করলে! মঙ্গলা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তা বাপু একত্রিশটা টাকার বদলে না হয় গেলই একখানা তের আনা দামের বিলিতি কাপড়! আর সত্যি, ওরও ত কিছু চাই!'

দুই

মহাশ্বেতার কাছে সবটাই পুতুল খেলা। বরং যে দারিদ্র্যের মধ্যে, যে একান্ত অভাবের মধ্যে সে মানুষ হয়েছে—সে অভিজ্ঞতার কাছে এই সত্যিকারের বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজন যেন রূপকথার রাজ্যের মতই অবিশ্বাস্য এবং স্বপ্নের দেশেরই সূচনা বহন করে ওর মনের মধ্যে। শ্বশুরবাড়ি হয়ত ততটা খারাপ জায়গা নয়, ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে পিঁট্‌কীরা যেমন বর্ণনা করে। আর বর, সেই বা না জানি কেমন! সত্যিই কি রাজপুত্তুরের মত হবে সে? কিন্তু তাই বা ঠিক কি রকম? মঙ্গলার এক বুড়ী ননদ কোন কোন দিন সরকার-বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে রূপকথার গল্প বলতে বসত—মহাশ্বেতাও বহুদিন গিয়ে বসেছে সে দলে। রূপকথার রাজপুত্র, কেবলই সে রাক্ষস মেরে রাজকন্যাদের উদ্ধার করে—তারই একটা ধারণা করবার চেষ্টা করত মনের মধ্যে। জিজ্ঞাসাও করত এক-একবার, 'হ্যাঁ দিদ্‌মা—রাজপুত্তুর কেমন?' বুড়ী চোখ বড় বড় ক'রে বলত, 'ওমা তা জানিস না? এই ফরসা রং তোর মার মত—পটোল-চেরা চোখ, টিকোলো নাক, কাত্তিকের মত ফুরফুরে গোঁফ—এই ঠাকরুণ পিতিমের কাত্তিক ঠাকুরের মত আর কি কতকটা!' ব'লে শেষ করতেন। দুর্গা তাঁর শাশুড়ীর নাম। তাই ঠাকরুণ বলতেন। এমন কি সকালে উঠে রোজই বলতেন, 'ঠাকরুণ দুর্গতিনাশিনী মা গো!'

মহাশ্বেতা কার্তিককে ভাববার চেষ্টা করে ওর বর। ভাল লাগে না। ও কি খেলাঘরের পুতুলের মত—ছোট্ট একরত্তি—বাবরি চুল! না, অমনই যদি রাজপুত্তুর হয় ত চাইনে ওর রাজপুত্তুরের মত বর! অবশ্য রাজপুত্তুরের মত কেন হবে ওর বর—এ প্রশ্নটা একবারও মনে জাগে না। সেই প্রথম দিন সরকার দিদ্‌মা ওর মাকে বলেছিলেন, রাজপুত্তুরের মত ছেলে—সেই কথাটাই ওর মনে বাসা বেঁধেছে বোধ হয়।

অবশেষে বিয়ের দিন এল।

বর এসে পৌছতেই বরের উত্তরীয় চেয়ে এনে পিঁড়ির ওপর পেতে ওকে বসিয়ে

দিলে সবাই। পিঁটুকী চোখ রাঙিয়ে বললে, 'খবরদার, এক পা নড়বি নি এখান থেকে, উঠতে নেই! একেবারে সাতপাক ঘোরাতে নিয়ে যাবে পিঁড়িসুদ্ধু!'

কিন্তু মহাশ্বেতা বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারলে না। সরকারদের বৈঠকখানা ঘরে বর এসে বসেছে—মেয়েরা সব গেছে ভিড় ক'রে দেখতে আড়াল থেকে। ওর কাছে কেউ নেই—যে ঘরে ও বসেছিল সে ঘরে আছে শুধু গুটি-দুই ঘুমন্ত শিশু। কৌতূহলে স্থির থাকতে না পেরে একসময় এদিক-ওদিকে চেয়ে মহাশ্বেতাও বরের উত্তরীয়খানা কুড়িয়ে বুকে ক'রে নিয়ে ছুটল যথাসম্ভব নিঃশব্দ গতিতে। যেদিক দিয়ে সবাই দেখছে সেদিক দিয়ে গেলে চলবে না—বাইরে দিয়ে যাবার ত উপায়ই নেই—থৈ থৈ করছে পুরুষ। দ্রুত ভেবে নিলে সে ছুটতে ছুটতেই—ওপাশে পিঁটুকীদের ঘরের দিকে একটা ছোট জানলা আছে ঘুলঘুলির মত—সেখান থেকে দেখা যেতে পারে। হ্যাঁ—এখানে ভিড় সত্যিই কম, একটা-দুটো ছোট ছেলে, তাদের ঠেলেঠুলে সরিয়ে মহাশ্বেতা উঁকি মেরে দেখলে। সবটা না হোক—পাশটা দেখা যাবে। হ্যাঁ, লম্বাচওড়া জোয়ান বটে, রংটাও খুব ফরসা, কিন্তু ওমা, একি, একগাল কালো আর ঘন দাড়ি যে! গোঁফদাড়িতে মুখখানা একেবারে…। এ আবার কি!

মহাশ্বেতা ক্ষুণ্ণ হয় একটু। অবাক্‌ও হয়। জ্ঞান হবার পর যে তিন-চারটে বিয়ে ও পাড়ায় দেখেছে, তার কোন বরই ত এমন দাড়ি নিয়ে বিয়ে করতে আসেনি! প্রতিমার কার্তিকের মত যে নয় তাতে ও খুশী বটে, তা বলে এমনি চোয়াড় হবে! অক্ষয়বাবুর অফিসের যে ভোজপুরী দারোয়ান আসে তার কতকটা এমনি দাড়ি আছে। তবু—তার দাড়ি দুদিকে ভাঁজ করা, কেমন কানের সঙ্গে বাঁধা—এমন জংলী দাড়ি ত নয়!

দেখছে—অবাক হয়েই দেখছে মহাশ্বেতা—পেছন থেকে কে এসে কান ধরলে। চমকে চেয়ে দেখে—পিঁটুকী।

'পৈ পৈ ক'রে না বারণ ক'রে এলুম! সেই অলুক্ষুণে কাণ্ড করা হ'ল! উঠতে নেই একে পিঁড়ি থেকে—তায় শুভদৃষ্টির আগে বর দেখা! একরত্তি মেয়ে ভেতরে ভেতরে পেকে উঠেছ! আর তর সইছে না দুটো ঘণ্টা! বর দেখা হচ্ছে লুকিয়ে লুকিয়ে!'

চাপা গলায় গজরাতে থাকে সে। শ্যামা ত ছুটে এসে একটা চড়ই কষিয়ে দিলে। মঙ্গলা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'করিস্ কি, করিস্ কি—আজকের দিনে!'

শ্যামা বললে, 'দেখুন দিকি, শুভদৃষ্টির আগেই বর দেখে নিলে, যদি ভালমন্দ কিছু হয়? যত সব অলক্ষুণে কাণ্ড!'

'ওলো, শুভদৃষ্টি ত আর হয়নি। বর ত অন্য দিকে চেয়ে ছিল। নে, আর মন খারাপ করিস নি।'

অপমানে আর অভিমানে মহাশ্বেতার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তাই সত্যিই যখন শুভদৃষ্টির সময় এল তখন সে চোখ বুজে বসে রইল জোর ক'রে! অনুরোধ অনুনয়, ধমক --কিছুতেই আর চোখ খুলতে পারে না।...শেষকালে অক্ষয়বাবু এসে আদর ক'রে মুখখানা তুলে ধরে যখন বললেন, 'একবার চোখ চাও ত দিদি এ-ই, বা! বেশ হয়েছে। দেখো ভালো ক'রে!' তখন কোনমতে এক লহমার জন্যে চোখ খুলেই আবার বুজে নিলে। তাতে শুধু ওর চোখে পড়ল, ঈষৎ পিঙ্গল একজোড়া চোখের গভীর স্থির দৃষ্টি।

ওর যেন কেমন ভয় করতে লাগল।

তিন

ওমা এ কি ছিরির শ্বশুরবাড়ি! পাল্‌কি থেকে নেমে মাথা হেঁট ক'রে থাকলেও, আড়ে এক ঝলক দেখে নিয়েছে মহাশ্বেতা। বিরাট ঝুপ্‌সী বাগান, উঠোনে প্রকাণ্ড একটা কাঁঠাল গাছ সেই দিনের আলোতেই যেন অন্ধকার ক'রে রেখেছে—আর তার মধ্যে জরাজীর্ণ স্যাঁতসেঁতে একটি নিচু নিচু পুরোনো ঘর। এই নাকি একটিই ঘর, পাশেও একটা ঘর আছে, তার ছাদের খানিকটা ভেঙে পড়ে গেছে, সেখানে আবার গোলপাতা দেওয়া ছাউনি খানিকটা। যত দুঃখেই পদ্মগ্রামে থাক ওরা, ভাল পাকা ঘরে থাকে, পোতা উঁচু ঘর, খট্ খট্ করছে শুক্‌নো। এইখানে থাকতে হবে ওকে, সা-রা-জী-ব-ন?

শাশুড়ী অবশ্য মন্দমানুষ নন। ছোটখাটো একরত্তি মানুষটি। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কথা-বার্তা। কোলে ক'রেই নামালেন পাল্‌কি থেকে। বরণের পর ঘরে এনে বসিয়ে বললেন, 'পুরোনো বাড়ি দেখে ঘেন্না ক'রো না মা—এ তোমার শ্বশুরের ভিটে। তোমার পয়ে এইখানেই একদিন রাজ-অট্টালিকা উঠবে দেখে নিও।'

কুশণ্ডিকার হাঙ্গামা চুকল বেলা তিনটে নাগাদ। ক্ষুধাতৃষ্ণায় মহাশ্বেতা তখন নেতিয়ে পড়েছে। তবু একটা জিনিস এরই মধ্যে সে লক্ষ্য করেছে যে কুশণ্ডিকার শেষের দিকে সে প্রায় টলে টলে পড়ে যাচ্ছিল—কিন্তু যতবারই মাথা ঘুরেছে ততবারই বর আগে থেকে যেন বুঝে নিয়ে কোনমতে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ওকে ঠেক্‌নো দিয়ে সামলে নিয়েছে। খুব লক্ষ্য আছে কিন্তু লোকটার!

জলখাবার এলো দুটো নারকেল নাড়ু আর দুখানা জিলিপি। কে তাই দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে একটু আখের গুড় গুলে সরবৎও ক'রে দিলে। কিন্তু তাই

তখন অমৃত মহাশ্বেতার কাছে। কনেকে যে প্রায় কিছুই খেতে নেই, একটু শুধু ভেঙে মুখে দিতে হয় তা তখন সে ভুলেই গেছে।

জল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে বসতে আশেপাশে যারা ভিড় ক'রে ঘিরে ছিল তাদেরও দেখবার সুযোগ পেলে মহাশ্বেতা। মানুষগুলোও যেন কি রকম, কি রকম এখানকার। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত মহাশ্বেতার জগৎ দুটি বাড়িতে সীমাবদ্ধ। এক কলকাতায় দিদিমার বাড়ি, আর এক পদ্মগ্রামে সরকার বাড়ি। দিদিমার বাড়ির যে দুটি-তিনটি মানুষ তাদের শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতার পরিমাণ বোঝার মত বয়স ওর হয় নি বটে কিন্তু সবটার ছাপ পড়েছে ওর মনে ঠিকই। সরকার বাড়িরও চলচলনে বিশেষত বেশভূষায় কলকাতার ছোঁয়া আছে। কিন্তু এখানকার মানুষগুলো যেন সে-সব থেকে একেবারে আলাদা। যেমন মলিন ও দীন পোশাক, তেমনি কথাবার্তার ধরণ। পুরুষদের হাঁটুর ওপর কাপড়, খালি পা, কাঁধে হয় একটা গামছা নয়ত কতদিনের ছেঁড়া পুরোনো কোট। ওর দুটি দেওর এবং দুটি ননদ। বড় ননদটির বিয়ে হয়েছে—বারো তের বছরের মেয়ে, প্রকাণ্ড একটা নথ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মুরুব্বীর মত। তবু তারই একটু ফরসা কাপড চোপড়, দেওর দুটির একটি বছর এগারো, একটি পাঁচ—কারও গায়েই জামা নেই। এই বিয়েবাড়িতেও তারা খাটো খাটো ময়লা ধুতি পরে খালি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তেমনি কি পাকা পাকা কথাবার্তা! মহাশ্বেতার মন বিরূপ হয়ে ওঠে।

বরটাও যেন কেমন কেমন। যতক্ষণ চেলির জোড় ছিল ততক্ষণ এক রকম। ব্যাস্, এখনই একটা মোটা চটের মত কোরা কাপড় পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের গুঁড়ি চেলা করতে লেগে গেছে। কাল যজ্ঞি হবে—তারই কাঠ। তবু কি ভাগ্যি একেবারে খালি গায়ে নেই—একটা ফতুয়া আছে গায়ে।

কিন্তু লোকটার খুব রং বাপু—যাই বলো! মনে মনে স্বীকার করে মহাশ্বেতা। ওর চাইতে অনেক বেশি ফরসা। পরিশ্রমে কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। আর মুখখানা হয়ে উঠেছে লাল—মহাশ্বেতার মনে হ'ল ঘাম নয়, সকালে যে দুধে-আলতায় দাঁড়িয়েছিল, সেই দুধে-আলতাই ওর মুখে কে ছড়িয়ে দিয়েছে। অত দাড়ি যদি না থাকত ত বেশ হ'ত!

শ্যামা ফুলশয্যার তত্ত্ব পাঠিয়েছিল ভালই। সবাই সুখ্যাতি করতে লাগল।

দশ টাকার বেশি খরচ হয় নি বটে কিন্তু নিজের কায়িক পরিশ্রমে অনেক পুষিয়ে দিয়েছে সে। দু থালা চন্দ্রপুলি, এক থালা ক্ষীরের ছাঁচ—আর এক থালায় জলখাবারের কচুরি, সিঙাড়া, সন্দেশ, পান্তুয়া—সব নিজে করেছে শ্যামা। জামাইয়ের

ধুতি-চাদর, মেয়ের লালপাড় শাড়ি, ফুলের থালা, মালা-চন্দন, ক্ষীর-মুড়কির বাটি কিছুই ভুল হয় নি। তায় একটি ছোট ডালায় অল্প একটু ঘি-ময়দা, সামান্য আনাজ চিনি মিছরি পর্যন্ত সাজিয়ে দিয়েছে। সকলেই স্বীকার করলে এ গ্রামে এমন ফুলশয্যার তত্ত্ব আর কখনও আসেনি।

বৌভাতের যজ্ঞি দুপুরেই মিটে গিয়েছিল—। যজ্ঞি ত কত—"ভেতো যজ্ঞি" – ভাত, ডাল, ছ্যাঁচ্‌ড়া, মাছের ঝোল, অম্বল—শেষপাতে দই জিলিপি। মহাশ্বেতার চোখে জল এসে গিয়েছিল—অত ভাল ক'রে বিয়ে হ'ল তার, আর বৌভাতে এই খাওয়া! তেমনি অবশ্য নিমন্ত্রিতরাও—মুখ-দেখানি পাওয়া গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিকি আর দুয়ানি—কেবল কে এক এদের আত্মীয়—কলকাতার লোক, সে-ই যা গোটা একটা টাকা দিয়ে গেল। আর হেম এসেছিল কন্যাপক্ষের হয়ে নিমন্ত্রণ রাখতে, সে দিয়ে গেল একটা আধুলি। রাজবাড়ির সরকার একটি ছোট ছেলে সঙ্গে ক'রে এসে নিমন্ত্রণ রেখে গেলেন, তিনি দিলেন সব চেয়ে বেশি—পাঁচ-পাঁচটা টাকা।

তবু সব গুনে-গেঁথে মন্দ দাঁড়াল না। মহাশ্বেতার সামনেই শাশুড়ী গুনে বাক্সতে তুললেন, সাতাশ টাকা প্রায়।

বৌভাতের ঝঞ্ঝাট সকাল ক'রে মিটে গিয়েছিল বলেই ফুলশয্যাও সকাল ক'রে হল। মেয়েরা সকলেই ক্লান্ত, জা-দেইজীরা বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত—কোনমতে অনুষ্ঠান সেরে সকলেই চলে গেলেন। মহাশ্বেতাও বাঁচল, সারাদিন কাঠের পুতুলের মত কনে সেজে বসে থেকে আর অবেলায় ভাত খেয়ে তার দু'চোখের পাতাতে টান ধরেছে, সে তখন একটু ঘুমোতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু সত্যি-সত্যিই যখন মেয়েরা অনুষ্ঠান শেষ ক'রে ওদের শুইয়ে রেখে বেরিয়ে গেল তখন আর যেন কিছুতেই ওর ঘুম এল না।

সেই একমাত্র পাকা ঘরখানিতেই ওদের ফুলশয্যার আয়োজন হয়েছে। পুরোনো কাঁঠাল কাঠের তক্তাপোশে পাতলা বিছানা। খানকতক ছেঁড়া কাঁথার ওপর বোধ হয় একটা সাদা চাদর পাতা। টিম টিম ক'রে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে এক পাশে, বাতাসে তার শিখাটা কাঁপছে আর সেই সঙ্গে কাঁপছে পুবদিকের দেওয়ালে ভাঙা তোরঙ্গটার ছায়া। পুরোনো ছাদের কড়ি বরগায় আলকাতরা মাখানো, দেওয়ালে চুনবালি নেই অনেক জায়গাতেই। কেমন যেন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। তবু মহাশ্বেতা একপাশ ফিরে সেই ঘরেরই খুঁটিনাটি দেখতে লাগল চেয়ে চেয়ে। ঘুমে চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে এসেছে, ব্যথা করছে দুটো চোখ—তবু যেন ঘুম আসে না। পাশে যে মানুষটা শুয়ে আছে, তার সম্বন্ধে কৌতূহলই যেন সব

চয়ে উগ্র। ভয় হচ্ছে খুব—শুয়ে শুয়েই বেশ টের পাচ্ছে পা-দুটো কাঁপছে সামান্য সামান্য। হাতের মুঠোয় ঘাম। ভয় অথচ কৌতূহলেরও যেন সীমা নেই।

ঘরের বাইরে খস্‌খস্‌ শব্দ—বোধ হয় কেউ আড়ি পেতেছে। তা পাতুক। কি লাভ আড়ি পেতে তা বোঝে না মহাশ্বেতা। ওর শুধু হাসি পায়। হেসেই ফেলত যদি না ঐ লোকটা ঠিক পেছনে গায়ের কাছে শুয়ে থাকত।

একটু উস্‌খুস করতেই বর লোকটি ওর কানের কাছে মুখ এনে খুব কোমল, খুব সস্নেহ কণ্ঠে বললে, 'কি, ঘুম পাচ্ছে না ? একটু জল খাবে ?'

সাগ্রহে ঘাড় নাড়ে মহাশ্বেতা। সত্যিই ত, তেষ্টাই ত ওর পেয়েছে—লোকটা ঠিক বুঝতে পেরেছে ত!

বর যথাসম্ভব নিঃশব্দে উঠে পেতলের একটা চুমকি ঘটিতে ক'রে জল এনে দিলে। মহাশ্বেতা উঠে বসে জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

তারপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। বাইরের খস্‌খসানি একটু থামতে বর ওকে টেনে খানিকটা নিজের দিকে ফিরিয়ে বললে, 'ঘুম না হয় ত একটু গল্প করো না।'

চুপিচুপি যে বরের সঙ্গে কথা কইতে হয় তা কেউ না বললেও মহাশ্বেতা কেমন ক'রে বুঝেছে। সে ফিসফিস ক'রেই বললে, 'কি গল্প করব ?'

'যা খুশি।'

একটু পরে মহাশ্বেতা বললে, 'তুমি দাড়ি কামাও না কেন ? সরকার দাদুদের বাড়ি, আমাদের পাড়ায় সবাই ত দাড়ি কামায়। বুড়ো হলে তবে দাড়ি রাখে।'

বর বললে, 'খরচে কুলোয় না।'

'খরচ হয় নাকি দাড়ি কামাতে ?'

'হ্যাঁ, এক পয়সা ক'রে নেয় নাপিত। মাসে দু আনা।'

'ভারি ত খরচ!' ঠোঁট উল্‌টে বলে মহাশ্বেতা।

বর একটু গম্ভীরভাবে বলে, 'আমি মাইনে পাই মোটে উনিশ টাকা। পাঁচটি লোক খেতে, বোনের বিয়ে দিয়েছি। তুমি এলে, ছ'জন হ'ল। এ আয়ে কি কুলোয় ? বাড়িঘর তুলতে হবে ত ? আর দাড়ি রাখলেই বা মন্দ কি ?'

'না, মন্দ আর কি!' মুরুব্বীর মত বলে মহাশ্বেতা।

খানিক পরে হঠাৎ সে-ই আবার প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, চোর কেমন দেখতে হয় ?'

'তা ত জানি না। মানুষের মতই দেখতে হয় বোধ হয়।...তা হঠাৎ চোরের কথা কেন ?'

একটু অপ্রতিভ হয়ে মহাশ্বেতা বলে, 'না, ঐ যে মা কাকে বলছিলেন, বাইরে কাপড়-চোপড় আছে কিনা দেখে শুতে—চোরে না নিয়ে যায়।...চোর

১৬:৩৩

আসে বুঝি এখানে ?'

'না। আমাদের কীই বা আছে চোরে নিয়ে যাবে !'

তারপর আর কি প্রসঙ্গ তুলবে ভেবে পায় না মহাশ্বেতা। ও লোকটাও ত কিছু কিছু বললে পারে! নিজে বেশ চুপ ক'রে শুয়ে আছে।...যত দায় যেন মহাশ্বেতারই। 'গল্প করো না!' বা-রে! বেশ লোক ত!

অনেক ভেবে-চিন্তে একসময়ে মহাশ্বেতা প্রশ্ন ক'রে বসে, 'তোমাদের বাড়িতে পুঁই গাছ আছে ?'

একটু হেসে বর বললে, 'আছে। কেন ? তুমি বুঝি পুঁই খুব ভালবাস ?'

কিন্তু ততক্ষণে বাইরে উচ্চ হাসির রোল উঠেছে। বোঝা গেল আড়ি পাতবার লোক তখনও অপেক্ষা করছিল, কেউ শুতে যায় নি। মহাশ্বেতা আরও বুঝতে পারল যে সে বিষম বোকার মত একটা কিছু কথা বলে ফেলেছে। তাই সে যৎপরোনাস্তি অপ্রস্তুত হয়ে ওপাশ ফিরে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল—বরের কথার উত্তর দিলে না।

পিদিমের শিখাটা কাঁপছে আর তার সঙ্গে কাঁপছে উপরি উপরি রাখা তুটো তোরঙ্গের ছায়া পুবদিকের দেওয়ালে। একটি চোখ ঈষৎ ফাঁক ক'রে সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল মহাশ্বেতা।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

এক

কথা ছিল মহাশ্বেতা আটদিনের দিন জোড়ে এসে এক বছর থাকবে। এ-ই নিয়ম। এই এক বছরে জামাই আসতে পারে কিন্তু মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে না। এ অঞ্চলের এই প্রথা, তাছাড়া মহাশ্বেতা একেবারেই ছেলেমানুষ—এক বছরের বেশি থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু মহাশ্বেতার শাশুড়ী ক্ষীরোদা এক অদ্ভুত প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন। তিনি নাকি কোন্ টোলে মত নিয়েছেন, বিয়ের আট-দিনের মধ্যে মেয়ে জামাই যদি বাপের বাড়ি আসে আর সত্ত ফিরে যায়—তাকে নাকি বলে 'ধুলো পায়ে দিন'—তাহ'লে আর এক বছর বাপের বাড়ি থাকার দরকার নেই ; ক্ষীরোদার ইচ্ছা মহাশ্বেতাকে তিনি মধ্যে মধ্যে নিয়ে যাবেন। তু-এক মাস ক'রে অবশ্য বাপের বাড়ি থাকবে—কিন্তু তাঁরও ত একটি হাত-নুড়কুৎ দরকার—একেবারে টানা এক বছর বাপের বাড়ি ফেলে রাখতে পারবেন না।

শ্যামার মুখ শুকিয়ে উঠল। তার তুধের মেয়ে, আর ঐ সাজোয়ান জামাই

—এখন থেকে শ্বশুরবাড়ি থাকবে কি! শ্বশুরবাড়ির ত ঐ ছিরি। হেমকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন ক'রে শ্যামা মেয়ের শ্বশুরবাড়ির যে চিত্র পেয়েছে তাতে তার ঐ সাত বছরের মেয়ে শ্বশুরবাড়ি আছে ভাবলেই বুকের মধ্যে কেমন করে যেন।

কিন্তু বিয়ে হ'লেই মেয়ে পর! তার ওপর আর জোর কি?

অগত্যা শ্যামা মঙ্গলার শরণাপন্ন হয়।

'কী হবে মা! ওরা যে এখন থেকেই মেয়ে আটকাতে চায়!'

মঙ্গলা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'শুনেছি আজকাল এরকম হচ্ছে। ধুলো পায়ে দিন ক'রে নিচ্ছে কেউ কেউ। তার আর কি করবি বল্! জোর ত আর নেই, বরং এর পর টেনেটুনে দু মাসের জায়গায় তিন মাস ক'রে আটকে রাখা যাবে। ওখানে নিয়ে গেলে আবার দু' মাস পরেই ফিরিয়ে আনবি'খন।'

'কিন্তু এটুকু মেয়ে এখন থেকে শ্বশুরবাড়ি থাকলে শুকিয়ে উঠবে যে। তারপর যা ভারিক্কি জামাই, মেয়ে হয়ত ভয়ে দব্‌কে দব্‌কে সারা হয়ে যাবে।'

'ঐটুকু মেয়ে ঢের অমন শ্বশুরঘর করছে—তার জন্যে কিছু নয়। আর জামাইয়ের কথা যদি বললি—এক বছর তোর কাছে থাকলেই কিছু তোর মেয়ে একেবারে লায়েক হয়ে উঠবে না। তারপর ত ঐখেনে পাঠাতে হবে, তখন কি করবি? তাছাড়া তোর একটা পেট ত বাঁচল!'

অগত্যা শ্যামাকে চুপ ক'রে যেতে হয়।

জামাই অভয়পদ কিন্তু খুব ভদ্র। বিয়ের দিন অত বুঝতে পারে নি শ্যামা। কিন্তু যেদিন ওরা ধুলো পায়ে দিন করতে এল আর যেদিন জোড়ে এল, দু'দিনই ভাল ক'রে ওকে লক্ষ্য ক'রে দেখে শ্যামা আশ্বস্ত হ'ল। বলতে গেলে জামাই আর সে একবয়সী—কাজেই খোলাখুলি কথা কইতে তার লজ্জা করে—কোন মতে মাথায় একহাত ঘোমটা টেনে সে সামনে আসে, নেহাত খাবার সময় দু'একটা অনুরোধ করতে হয়, করে—কতকটা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে, চাপা গলায় ফিস ফিস ক'রে, কিন্তু হেম এবং মঙ্গলার সঙ্গে যখন কথা বলে অভয়, তখন উৎকর্ণ হয়ে শোনে সে। না, কথাবার্তা বেশ ভাল। শুধু মিষ্টি নয়, বেশ জ্ঞানবান বা বুদ্ধিমানের মতই কথা। এই বয়সে বরং এতটা জ্ঞান ও জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কেমন ক'রে হ'ল তাই ভেবেই শ্যামার একটু অবাক লাগল। অবশ্য কারণটা সে অনুমান করতে পারে—নিতান্ত বালক বয়সে সংসারের ভার মাথায় এসে পড়েছে, সংসারের বিদ্যালয়ে সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং নির্মম গুরুমশায় বাস্তবের কাছেই পাঠ নিতে হয়েছে তাকে; তাই বোধ হয় বয়সের অনুপাতে ঢের বেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে। বয়স্ক লোকের বোঝা বইতে বইতে কিশোর দেহের মধ্যেকার মানুষটা কখন বয়স্ক ও প্রবীণ হয়েছে—তা

বোধ হয় বেচারী নিজেও টের পায় নি। শ্যামার মায়া হয় এই অকালপক্ক তরুণটির উপর। আহা, এই ত ওর আমোদ-আহ্লাদের বয়স, এখনই কি আর এমন বুড়িয়ে পেকে যাবার কথা ওর!

অভয়পদর আচরণও একটু অদ্ভুত!

জলখাবার, ভাত, যা তাকে সাজিয়ে দেওয়া যাক না কেন, শ্যামা লক্ষ্য ক'রে দেখে, ঠিক অর্ধেকটা খেয়ে অর্ধেকটা রেখে দেয় পাতে। জলখাবারের একটা রসগোল্লা দিলে ভেঙে আধখানা খায়। ভাত থেকে শুরু ক'রে মাছ পর্যন্ত সবই যেন মেপে আধাআধি খেয়ে ওঠে। প্রথমটা অত বুঝতে পারে নি শ্যামা কিন্তু পরে বুঝেছিল যে এটা সে ইচ্ছা ক'রেই রাখে মহাশ্বেতার জন্য। শ্বশুরবাড়ির পুরো পরিচয় না পেলেও বহুদর্শী অভয়পদ এক নজরে আন্দাজ ক'রে নিয়েছিল, সে জানত এতগুলি লোকের জন্য সমান আয়োজন করা এখানে সম্ভব নয়—যা তাকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে তা শুধু তার জন্যই সংগৃহীত। ওর খাওয়া হ'লে মহাশ্বেতাই সে পাতে বসবে নিশ্চয়—সুতরাং বালিকা বধূর প্রতি মমত্ববশত সে সব জিনিসেরই চুলচেরা ভাগ রেখে যায়।

এ আচরণ অভয়পদ চিরকাল বজায় রেখেছিল। কোন অনুরোধ বা অনুযোগেই তাকে টলানো যায় নি কখনও। শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছিল শ্যামা। বরং সম্ভব হ'লে বেশি ক'রেই ওর পাতে সাজিয়ে দিত—যাতে অর্ধেক রাখলেও একজনের মত যথেষ্ট হয়।

মহাশ্বেতা প্রথম প্রথম অবশ্যই পুলকিত হ'ত। শ্যামা কিছু সবটাই তাকে ভোগ করতে দিত না—হেমকেও ভাগ ক'রে দিত ভাল ভাল খাবারগুলো। তাতে মহাশ্বেতার খুব বিশেষ আপত্তি ছিল না। একটা দাদা ত! তাকে দিয়েও যা পেত তার কল্পনারও অগোচর!

প্রথম দিন, ধুলো পায়ে দিন করতে যেদিন আসে ওরা, আকণ্ঠ খেয়ে উঠে মহাশ্বেতা বলেই ফেলেছিল, 'যাই বলো বাপু, মানুষটা কিন্তু মন্দ নয়!'

সত্যিই প্রথমটা বুঝতে পারে নি শ্যামা, প্রশ্ন করেছিল, 'কে রে, কার কথা বলছিস?'

'আবার কে! ঐ বরটার কথা বলছি।'

মহাশ্বেতার মুখ লাল হয় নি। কিন্তু শ্যামার কপালে ও গালে কে সিঁদুর ঢেলে দিয়েছিল।

সে কি শুধু লজ্জায়? না—সুখেও। নিজের নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ ক'রে এ ক'টা দিন সে আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে ছিল। আজ অভয়পদকে ভাল

ক'রে দেখে এবং মেয়ের কথা শুনে সুখেই তার চোখে জল এসে গেল।

নিশ্চিন্ত হ'ল সে। মানুষের হাতে পড়েছে, জন্তুর হাতে নয়। এখন মেয়ে যত দুঃখই পাক—ওর তাতে কোন ক্ষোভ নেই।

প্রথম দিন ওরা চলে যাবার সময় হেম গিয়েছিল এগিয়ে দিতে। মল্লিকদের বাগান ছাড়িয়ে চট্‌খণ্ডীদের বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে পাকা রাস্তায় তুলে দিয়ে হেম যখন ফিরে এল—তখন তার হাতে চক্‌চক্ করছে একটা রুপোর টাকা।

'এ কি রে, কোথায় পেলি!' শ্যামা সচকিত হয়ে প্রশ্ন করে।

হেম উজ্জ্বলমুখে টাকাটা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'জামাই দিলে মা। আমি কিছুতেই নেবো না, সেও ছাড়বে না। বলে, সন্দেশ কিনে খেও। আর মহাটা কি পাজী জানো মা, আমাকে কানে কানে বলে কিনা—দিচ্ছে, নে না! আবার যেদিন জোড়ে আসব, সেদিন খরচা নেই?...এমন লজ্জা করছিল আমার শুনে!'

লজ্জার কথাই বটে, তবে কথাটা সত্যিই। শ্যামার দুর্ভাবনার শেষ ছিল না সেদিনের কথা মনে ক'রে। বিয়ে দিতেই তার হাত নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোথাও থেকে যে কিছু পাওয়া যাবে সে সম্ভাবনাও নেই। নরেন সরে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি ফিরলেও দু মাস। এক ভরসা ওর নারকেল পাতা—তাও এই গোলমালে কদিন হাত দেওয়া যায় নি, খুব খাটলেও চার-পাঁচ আনা পয়সা আসবে। তারপর?

এই তার পরের প্রশ্নটাতে যখন বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছিল, তখন যেন দেবতার আশীর্বাদের মত টাকাটা এসে পড়ল।

জামাই দীর্ঘজীবী হোক। মহাশ্বেতা সুখী হোক। হে মা মঙ্গলচণ্ডী, এতদিনে কি একটু মুখ তুলে চাইলে মা?

মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করতে গিয়ে মঙ্গলার কথাও মনে পড়ল। ভাগ্যিস্ তখন বয়সের কথা শুনে ইতস্তত করে নি! মঙ্গলার কাছে তার ঋণ শোধ হবার নয়।

দুই

শ্বশুরবাড়ির দারিদ্র্যের চেহারাটা বিয়ের আটদিন ভাল নজরে পড়ে নি মহাশ্বেতার। বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরে ধারদেনা ক'রেই হোক আর ভিক্ষে চেয়েই হোক—বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে এক রকমের কৃত্রিম প্রাচুর্য সৃষ্টি করা হয়, তাতে ক'রে গৃহস্থের ঠিক অবস্থাটা ঠাওর করা শক্ত হয়ে ওঠে। বরং অবস্থাপন্ন ঘরে কৃপণতা দেখা যায় কোথাও কোথাও, বোধ হয় সম্পন্ন অবস্থা ব'লেই সেটা দেখাতে সাহস

করেন তাঁরা—দরিদ্রের সংসারে, যেখানে যত অভাব, সেখানে তত সচ্ছলতা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগেন কর্মকর্তারা।

অভয়পদর বাড়িতেও তার অন্যথা হয় নি। পণের একান্ন টাকা ছাড়াও অভয়পদ তার বহু কষ্টে সঞ্চিত ষাটটি টাকা তুলে এনে দিয়েছিল—তা ছাড়াও কিছু ধার করতে হয়েছে। সংসার চালাতে হবে—এবং দেনা শোধ করতে হবে, সবই ঐ উনিশ টাকা ছ' আনা মাইনের মধ্যে। সুতরাং বধূর সামনেও কোন ছদ্ম-সম্ভ্রম রাখা সম্ভব নয়। মহাশ্বেতা যখন দুমাস পরে আবার ঘর করতে এল তখন বাইরের কৃত্রিম আবরণ শুধু নয়—যেন মাংস আর চামড়াও খসে পড়েছে! বেরিয়ে এসেছে কঙ্কালটা!

অভয়পদর অফিস নাকি হাওড়ার পোলের কাছে কোথায়। কারখানার চাকরি—আটটায় হাজ্‌রে। সুতরাং সে ছটার মধ্যেই ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। পাকা আড়াই ক্রোশ পথ হেঁটে বড় রাস্তায় পৌছলে, সেটা যদি সওয়া সাতটার মধ্যে পৌছনো যায় ত, বাকী দেড় ক্রোশের প্রায়ই একটা সুব্যবস্থা হয়—অর্থাৎ অফিসের সাহেবদের গাড়ী যায় অনেকগুলো সেই দিক দিয়ে—কেউ কেউ দয়াপরবশ হয়ে কোচম্যানের পাশে তুলে নেন ওকে, নইলে সেটাও পায়ে হেঁটে সারতে হয়। ফেরবার সময়ও অবশ্য ঐ একই ব্যবস্থা।

যাই হোক—আগের রাত্রের বাসি ডাল-তরকারির সঙ্গে গরম ভাত দিয়ে আহারপর্ব সারতে হয় অভয়পদকে। যেদিন তা থাকে না, সেদিন বড়জোর একটু ডালভাতে দিয়ে আগাগোড়া ভাত খেয়ে ওঠে। এর বেশি ক্ষীরোদা পেরে ওঠেন না। ওঠেন তিনি রোজই রাত চারটেয় কিন্তু বাসি পাট সেরে চান ক'রে ভাত চড়াতে চড়াতে কোথা দিয়ে পাঁচটা বেজে যায় বুঝে উঠতে পারেন না। শুধু যেদিন বাসি ডাল তরকারি কোন কারণে থাকে না সেদিন একটু হা-হুতাশ করেন—'আহা রে, নির্লখ্যে একটু ডালভাতে দিয়ে কি ক'রেই বা খাবি, তাই ত! ঘরেও কিছু নেই, ঐ জন্যে বলি একটা দুটো আলু অন্তত এনে রাখিস্। এই সময় একটা আলু থাকলে কত সুবিধে হ'ত!'

বলা বাহুল্য, অভয়পদ কোনদিনই এসব কথার কোন উত্তর দেয় না। খাওয়া নিয়ে সে কোন আলোচনাই করে না কারও সঙ্গে। এমন কি ডালে নুন না হলেও বলে না, বা চেয়ে নেয় না, ভুলে ডবল নুন পড়লেও কোন অনুযোগ করে না। রাত্রেও সে-ই সর্বাগ্রে খায়—কিন্তু তাকে খাইয়ে কোন ভরসা পান না ক্ষীরোদা। আগে আগে তিনি অভিযোগ করতেন, 'তুই কি রে, তখন বললে ত আবার নুন দিয়ে ফুটিয়ে নিতে পারতুম!' কিন্তু তাতে অভয়পদর মুখের প্রশান্তি

বা নীরবতা নষ্ট হ'ত না, খুব বাড়াবাড়ি হ'লে জবাব দিত, 'কি দরকার! যে রেঁধেছে সেও ত খাবে। তখনই বুঝবে।'

'তা তোর মুখে কি সাড় লাগে না? তুই খাস কি ক'রে?'

'খাই যখন, তখন অসুবিধে হয় না বুঝতে হবে।' এর বেশি কথা সে বলে না কোনদিনই।

অভয়পদর মত ভাত হয় ছোট তিজেলে ক'রে পাতার জ্বালে। তারপরই ক্ষীরোদা বেরিয়ে পড়েন পাড়ায়। কার পাঁদাড়ে ডুমুর হয়েছে, কোথায় দুটো ডাঁটা, কারও বাড়ি গিয়ে গোটাকতক আমড়া, কোথাও বা একফালি থোড়—এই সংগ্রহ ক'রে ফেরেন একেবারে আটটা নাগাদ। তারপর হাঁড়ি ক'রে ডাল চাপে। মহাশ্বেতা এসে পর্যন্ত দেখছে একই ডাল—অড়র। একদিন শাশুড়ীকে সে বলেই ফেলেছিল, 'হ্যাঁ মা, রোজ অড়র ডাল রাঁধেন কেন?' তাতে শাশুড়ী উত্তর দিয়েছিলেন, 'ওমা, তা জানো না, অড়র ডাল যে পোষ্টাই খুব! সায়েবরা পর্যন্ত খায়!'

কিন্তু পরে মহাশ্বেতা শুনেছিল কথাটা তা নয়। ওর সমবয়সী ননদ বুড়ী একদিন খুব অন্তরঙ্গতার অবসরে ব'লে ফেলেছিল, 'হ্যাঁ, পোষ্টাই না ছাই! আসলে সস্তা। দাদা কোথা থেকে অড়র ডাল আনে—পোস্তা না কোথা থেকে —চার পয়সা সের। ঐ ক্ষুদি ক্ষুদি ডাল—ও আবার পোষ্টাই! কুণ্ডুবাড়ি অড়র ডাল আসে এই এত বড় বড় দানা! তাও ওদের ওখানে ও ডাল খায় শুধু খোট্টা দারোয়ানেরা।'

ঐ ডাল আর একটা চচ্চড়ি, সকাল বিকেল একই অবস্থা। কোনদিন আমড়া কি কাঁচা তেঁতুল কোথাও থেকে পাওয়া গেলে বড়জোর একটু অম্বল কিংবা টক দিয়ে ডাল। তাও অম্বলে মিষ্টি পড়ত না—তাতে নাকি অসুখ করে।

শুধু ডাল-চচ্চড়ি দিয়ে খেতে মহাশ্বেতার আপত্তি হবার কথা নয়। যদি সেটাও ভালভাবে পেত সে। প্রতিদিনই দেখত যে পুঁই ডাঁটা বা কুমড়ো ডাঁটার (এই দুটো শাক ওদের উঠোনেই হয়েছিল অপর্যাপ্ত) সঙ্গে গা থেকে ডুমুর থোড় বা কাঁচকলা—যেদিন যা যোগাড় হ'ত চচ্চড়ির—চেঁচে নিয়ে পুরুষদের এবং ছোট ননদের পাতে দেওয়া হ'ত, ওদের শাশুড়ী-বৌয়ের জন্য অবশিষ্ট থাকত শুধু ডাঁটার অংশটুকু। যেদিন নাজনে ডাঁটা পাওয়া যেত সেদিনটা মহাশ্বেতার কাছে উৎসবের দিন, কিন্তু সে কদাচিৎ কখনও। জলের মত ডাল মেখে শুধু পুঁইডাঁটা দিয়ে ভাত খেতে এক-একদিন মহাশ্বেতার চোখে জল এসে যেত। শাশুড়ীও অবশ্য তাই খেতেন, কিন্তু তাতে সান্ত্বনা পেত না সে।

একদিন সে প্রশ্ন করেছিল, 'হ্যাঁ মা, আমাদের বাজার হয় না কেন ?'

চকিতে ক্ষীরোদার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল, 'হয় বৈ কি মা। তবে কি জানো, চলে যায়, পাঁচজনে ভালবাসে, এটা-ওটা দেয়—তাই আর আমার অভয়পদ গা করে না তেমন!'

সব চেয়ে মুশকিল, স্বামীকে কাছে পায় না মহাশ্বেতা। এবার শ্বশুরবাড়ি আসার পর দেখছে শোবার ব্যবস্থা অন্য রকম হয়েছে, বড় ঘরে সে, তার ছোট দেওর, ননদ এবং শাশুড়ী শোয়—ভাঙা ঘরে বাকী দু ভাই। সে একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিল এতে, শ্বশুরবাড়ির মধ্যে তার বর লোকটিই যে সব চেয়ে ভাল, আর যা কিছু তার মনের কথা একমাত্র ঐ লোকটিকেই নির্বিচারে বলা চলে—এ কথাটা কেমন ক'রে মহাশ্বেতা যেন নিজে নিজেই বুঝেছিল। কিন্তু উপায় কি ? এ কথা ত মুখ ফুটে বলা যায় না যে—সে বরের কাছেই শুতে চায়। বিশেষত শাশুড়ী বলেই দিয়েছিলেন যে, 'এখন তুমি বড্ড ছেলেমানুষ বৌমা, তুমি দিনকতক আমার কাছে শোও। নইলে হয়ত ভয়-টয় পাবে—'

হাসি পেয়েছিল মহাশ্বেতার কথাগুলো শুনে। প্রথম আটদিন ভয় পেলো না—এখন পুরোনো শ্বশুরবাড়ি ভয় করবে ?

ওরই মধ্যে একদিন এক ফাঁকে—সেটা বোধ হয় রবিবার—বলে ফেলেছিল সে অভয়পদকে নির্জনে পেয়ে, 'একদিন পটল এনো না। বড্ড পটল খেতে ইচ্ছে করে। বেশি ক'রে এনো কিন্তু, নইলে আমার আর মার অদৃষ্টে জুটবে না।'

অভয়পদ বলেছিল, 'তা আনবো। কিন্তু তুমি আর মাকে বাজারের কথা বলো না। আমাদের অভাবের সংসার—বাজার-হাট ক'রে আনতে গেলে কি চলে ? চেয়ে-চিন্তে সংসারটা চলে গেলেই হ'ল। মিছিমিছি মা লজ্জা পান।'

অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল মহাশ্বেতা সেই বয়সেই। 'আর কখনও বলব না' বলে প্রায় ছুটে পালিয়েছিল।

পরের দিনই সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ঢুকল অভয়পদ গামছায় পুঁটুলি ক'রে একরাশ পটল নিয়ে। মার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে, 'পোস্তার দিকে একটু দরকার ছিল আজ—পেয়ে গেলুম এক পয়সায় এতগুলো, তাই পটল নিয়ে এলুম।'

কিন্তু সে পটলের চেহারা দেখে হাসবে কি কাঁদবে মহাশ্বেতা ভেবে পায় না। যত রাজ্যের হল্‌দে পাকা পটল—কতক কতক হাজাও আছে। কোন-কোনটা ভাঙা দুখানা করা।

সেদিন রাত্রে সেই সব পটলের মধ্যে বেছে যেগুলো আর এক রাতও থাকবে

না সেইগুলো পোড়ানো হ'ল। সেই পোড়া পটলই রাত্রে একমাত্র ভরসা। শাশুড়ী রাতে ভাত খান না, মুড়ি খান—তিনিও পটল পোড়া দিয়ে মুড়ি খেলেন। ভারি খুশী, বললেন, 'পাকা পটল কেমন মিষ্টি লাগে দেখেছ বৌমা? আমি খুব ভালবাসি পাকা পটলপোড়া খেতে!'

মহাশ্বেতার আদৌ ভাল লাগল না এসব। পটল সে দিদিমার বাড়ি খেয়েছে, ভাজা কিংবা ঝোলে—কি আলু-পটলের ডাল্না! এ কী ছাই!...বার বার নিজের মনে বলতে লাগল, এই শেষ! ঐ ছিষ্টিছাড়া মানুষটাকে যদি সে আর কোনদিন কিছু বলে! তার খুব শিক্ষা হয়েছে!

মহাশ্বেতা একদিন শাশুড়ীকে খেতে খেতে বলে ফেলেছিল, 'আচ্ছা মা, আপনি এত পাতলা ডাল রাঁধেন কেন? আমার দিদিমা অড়র ডাল কি ছোলার ডাল রাঁধে—এই চাপ-চাপ। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তাতে সর পড়ে ফেটে যায়। সেই ত বেশ!'

তাতে এমন হেসেছিলেন ক্ষীরোদা যে মহাশ্বেতার লজ্জার শেস ছিল না। এই ন্যাখো কাণ্ড, সে আবার কী বলতে কী বলে ফেলেছে বোধ হয়! বর আবার না তাকে আড়ালে পেয়ে গম্ভীর মুখে শাসন করে!

ক্ষীরোদা বলেছিলেন, 'ওমা! অড়র ডাল আবার চাপ-চাপ? শুনলে লোকে হাসবে যে! যা বলেছ বলেছ আমার কাছে বলেছ—আর কারুর সাক্ষেতে যেন ব'লে ফেলো না অমন কথা।'

অড়র ডাল ঘন খেলে এমন কি লজ্জার কথা আছে তা ভেবে পায় না মহাশ্বেতা। খেতে ত সেইটেই ভাল লাগে। তবু মনে মনে আরও একবার প্রতিজ্ঞা করে যে, খাওয়ার কথা আর কখনও তুলবে না। বাপের বাড়িতে দুবেলা ভাত জোটাই ত তার স্বপ্নের অগোচর ছিল বলতে গেলে। দুটো ভাত যে খেতে পাচ্ছে পেট পুরে, এই ঢের।

বয়স অল্প হ'লেও অভাব ও দারিদ্র্য অনেক বেশি পাকিয়ে দিয়েছে মহাশ্বেতাকে, সে বেশ ভারিক্কী লোকের মতই নিজেকে বোঝাতে বসে মধ্যে মধ্যে।

কিন্তু তার কান্না পায় একটা ব্যাপারে। ওর দেওর ননদরা রোজই আগে খায়—যার পাতে যা কিছু পড়ে থাকবে, শাশুড়ী একটা বাটি ক'রে জড়ো ক'রে তুলে রাখবেন আর তাকে দেবেন সেইগুলো খেতে। ডাল তরকারি মাখা ভাত ছড়িয়ে বিছড়ে খায় ওরা, বিশেষত ছোট দেওর দুর্গাপদর ত সর্বদাই সর্দি লেগে আছে, তার খাওয়ার দৃশ্য মনে হ'লেই বমি আসে মহাশ্বেতার—আর সে-ই ঠিক

রোজ এতগুলো ক'রে ভাত চেয়ে নিয়ে খানিকটা পাতে ফেলে রেখে উঠবে। তাই কি তরকারি একটু রেখে যাবে? কোনদিনও না, তার বেলা সেয়ানা ছেলে, ঠিক চেটেপুটে খেয়ে যায়! শুধু শুধু ডালমাখা ভাতগুলো—মাগো, সাত পাতের ঐ কুড়োনো ঠাণ্ডা ভাত—! এক-একদিন আড়ালে মাথা কুটত মহাশ্বেতা, আর কাঁদত ডাক ছেড়ে। কোন কোন দিন রেগে আঙুল মটকে গালাগালও দিত, 'মর্, মর্—আঁটকুড়ো, চোখখেগো! মর্! এত লোকের ওলাউঠো হয়, তোর হয় না?'

সরকার বাড়ির পুকুরে চান করতে এসে পোদেদের গিন্নী ঠিক এই ভাষাতেই গালাগাল দিতেন তার দেওরদের। হুবহু সেইটেই মনে আছে মহাশ্বেতার।

এক-একদিন কাজের সময় বায়না ধরে কাঁদত যখন দুর্গাপদ তখন ক্ষীরোদা বলতেন, 'একটু ভোলাও ত বৌমা—থাক থাক, কোলে করতে যেও না, এমনি হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ভোলাও একটু।'

সেই ছিল মহাশ্বেতার সুযোগ। প্রাণভরে অন্তর-টিপুনী দিত এক-একদিন। তার ফলে ডাক ছেড়ে যখন কেঁদে উঠত সে, তখন আপনমনে দাঁতে দাঁত চেপে বলত, 'রাক্কোস ছেলে! মর্ মর্ তুই, মরিস্ ত আমার হাড় জুড়োয়!' আর প্রকাশ্যে চেঁচিয়ে শাশুড়ীকে ডাকত, 'ও মা, আসুন না একবার, কিছুতেই থামছে না যে।'

তিন

মহার শ্বশুরবাড়িতে বিগ্রহ আছেন রাধা-দামোদর—সে কথাটা বিয়ের সময় অত ভাল ক'রে বুঝতে পারে নি সে। একটা ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করানো হয়েছিল এই মাত্র—ছোট্ট অন্ধকার ঘরে নিচু বেদীর ওপর ন্যাড়াবুঁচো দুটি মূর্তি, কেষ্টটি পাথরের, রাধিকা পেতলের (বা অষ্টধাতুর)—সামনে একটি সিংহাসনে একটা শালগ্রাম আর একটি ছোট্ট পাথরের শিব। স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে অসংখ্য আরশোলা বেড়াচ্ছে, কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ—মোট কথা মহাশ্বেতার আদৌ ভক্তি হয় নি সে ঠাকুর দেখে। দিদিমার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে আনন্দময়ী-তলায় ঠাকুর দেখেছে, বাগবাজারের মদনমোহন দেখেছে—দক্ষিণেশ্বরে একবার গিয়েছিল, সে সব কেমন ঠাকুর! কি জাঁকজমক, কত গয়নাগাঁটি, ফুলচন্দনের গন্ধ! এমন কি, ওদের সরকারবাড়ির ঠাকুরঘরও কেমন আলাদা মন্দিরের মত, কত উঁচু! আর এ কি বিশ্রী!

কিন্তু সে যাই হোক—এ ঠাকুর যে ওদেরই তা তখন বুঝতে পারে নি।

একেবারে বুঝতে পারলে মাস আষ্টেক পরে যখন শুনল যে আসছে মাস থেকে ঠাকুরের পালা পড়বে তাদের।

'তার মানে কি মা?' প্রশ্ন করেছিল মহাশ্বেতা।

ক্ষীরোদা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'তোমার শ্বশুররা খুড়তুতো জেঠতুতো ধরে তিন ভাই—ঠাকুর হ'ল গে আমার দাদাশ্বশুরের—তা এ বংশের সকলকারই ত সেবা করার কথা। মরে হেজে গিয়ে এখন এই তিন ঘরে ঠেকেচে—তাই পালা ক'রে ক'রে এক এক বছর সেবা করা হয়। এ বছরটা ছিল আমার ভাশুরের, এবার আমার পড়বে। আবার আমরা এক বছর সেবা করলে আমার দেওর আছেন একজন, তাঁদের ওপর ভারটা পড়বে। বুঝলে মা?'

'তা সবাই মিলে একসঙ্গে করেন না কেন?'

'সে হয় না মা। তাহলে কেউ করত না—সবাই সরে থাকত, ফাঁকি দেবার চেষ্টা করত।'

এ আবার কি কথা—মহা ঠিক বোঝে না। ঠাকুরসেবা করা এ ত ভাগ্যের কথা, মাসিমার মুখে কতদিন শুনেছে—তাতে ফাঁকি দেয় নাকি কেউ!

তবু কথাটা শুনে ওর খুব আনন্দই হ'ল। ছেলেমানুষের মন—ঠাকুরসেবার মধ্যে পুতুলখেলার স্বাদটা পায়। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'কবে আসবেন মা ঠাকুর?'

'আসবেন না ত—ঐ ঘরেই থাকবেন। আমরা ঐখানে গিয়ে সেবা করব। ওদের দিকের দোরটা বন্ধ ক'রে রেখে আমাদের দিকের দোরটা খোলা হবে। এই শুধু। দ্যাখো নি—ও ঘরে তিনটে দরজা?'

সে কিন্তু দিন গোনে। ঠাকুরের পালা তার হাতে এলে সে ঐ ঘর ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করবে। আরশুলাগুলোকে মারবে ধরে ধরে—দু'বেলা ধুনো দিয়ে ঐ ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নষ্ট করবে। আরও কত কি—!

একদিন অভয়পদর অফিস যাবার সময় বুঝে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটা বুড়ো আমগাছের আড়ালে। অভয়পদ অত লক্ষ্য করে নি, হনহন ক'রে এগিয়ে যাচ্ছিল—মহাশ্বেতা ডাকলে, 'শোন।'

অভয় ত অবাক! কাছে এসে একটু মুচকি হেসে বললে, 'কি খবর গো, বলো বলো—বেলা হয়ে গেছে, কিছু ফরমাশ আছে বুঝি? কী চাই এবার?'

মহাশ্বেতা প্রায় মরীয়া হয়ে বলে উঠল, 'আসছে মাস থেকে ত আমাদের ঠাকুরের পালা পড়বে—একটা উঁচু দেখে কাঠের সিংহাসন কিনে এনো—বুঝলে? ঠাকুর অত নিচু হয়ে দেখতে হয়—আমার বড্ড খারাপ লাগে।'

হু', গম্ভীর হয়ে বলে অভয়পদ, 'ফরমাশ ত বেশ লম্বা-চওড়া দেখতে পাচ্ছি। মাসে একটা টাকাও বাড়তি থাকে না। আজ দু'মাস ওপরটাইম বন্ধ। কিনব কোথা থেকে ? জানো—এখনও বিয়ের দেনা শোধ হয় নি ?'

মুখ ম্লান হয়ে যায় মহাশ্বেতার। কেন যে মরতে এসব ফরমাশ করতে যায় সে বরকে! প্রতিবারেই এমনি কথা শুনতে হয়, এমনি অপমান! ছিঃ ছিঃ! আবারও সে প্রতিজ্ঞা করলে—আর কোনদিন কিছু বলবে না।

কিন্তু সেই রবিবারেই দেখা গেল অভয়পদ বাগানের এক কোণে জড়ো ক'রে রাখা কতকগুলো কাঠ্‌রা নিয়ে বসে গেছে সকাল থেকে। যন্ত্রপাতি সব ওর কাছেই থাকে বোধ হয়—অন্তত মহাশ্বেতার তাই মনে হ'ল, কৈ, কোথাও থেকে চেয়ে নিয়ে এল ব'লে ত মনে হ'ল না—সে যাই হোক সন্ধ্যানাগাদ দেখলে বেশ উঁচু গোছের একটা সিংহাসন তৈরি হয়ে গেল। বা রে! মনে মনে ভাবে মহাশ্বেতা, লোকটা ত কারিগর মন্দ না!

প্রথমটা ওর খুব আনন্দ হয়েছিল। ওর একটা সামান্য শখও সে মনে ক'রে রেখেছে আর সেটা মেটাবার জন্যে এত মেহনত করছে! কিন্তু তারপরই ভয়ে বুক দুরদুর করতে লাগল। যদি বলে দেয় লোকটা ? মাকে যদি বলে, 'তোমার বৌ ফরমাশ করেছিল তাই করলুম!' ওমা, সে কি ঘেন্নার কথা হবে! মা-ই বা কি মনে করবেন, ভাববেন হয়ত বৌ তাঁর ছেলের সঙ্গে অমনিই রোজ রোজ লুকিয়ে কথা কয়, আবার এরই মধ্যে ফরমাশ করতে শুরু করেছে। হে মা কালী, বলে না ফেলে কথাটা!

লোকটা কিন্তু খুবই ভাল। ক্ষীরোদা যখন প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ রে, কী করছিস রে সারাদিন ধরে ?' তখন বেশ সহজ ভাবেই বললে, 'পূর্ণিমে থেকে ত ঠাকুর আসছেন ঘরে—তাই ভাবছি একটা বেশ উঁচু দেখে ভাল সিংহাসন তৈরি করি। দেখি—কতদূর কি হয়।'

সন্ধ্যাবেলা কাজ শেষ হয়ে গেলে অভয়পদ মাকে ডেকেই দেখালে, 'দ্যাখো দিকি মা কেমন হয়েছে ?'

মা একটু খুঁতখুঁত ক'রে বললেন, 'হয়েছে ত ভালই। তবে ঠাকুরের সিংহাসন পুরোনো কাঠে করলি, ওতে দোষ হবে না ত ?'

'হ্যাঁ—তুমিও যেমন! চেঁচে-ছুলে দিয়েছি, তাছাড়া জিনিসটা ত নতুন তৈরি হ'ল। কাঠে দোষ কি ?'

কিন্তু ঠাকুর যখন সত্যি-সত্যিই ওদের দিকের দরজা খুললেন তখন মহাশ্বেতা

বুঝলে যে ঠাকুরসেবাটা আর যাই হোক্‌, পুতুলখেলা নয়। হাজারো রকমের কাজ আর ঝঞ্ঝাট। পুজোর কোন আয়োজন নেই কিন্তু নিয়ম অজস্র। মাটির বাসি হাঁড়ির ভাত চলবে না। প্রতিদিন মাজা পেতলের হাঁড়িতে ভাত রান্না হয়— ভাতের উপকরণ যাই থাক, বামুনবাড়ির ঠাকুর, অন্নভোগ দিতেই হবে। তাছাড়া ভোগ দেওয়াই বা কি হবে? সকালে দুখানা বাতাসা ছাড়া কিছুই থাকে না— পাড়ার লোক কেউ শশাটা পেয়ারাটা দিয়ে গেলে কিংবা কোন মানসিকের পুজো দিতে এলে তবে ঠাকুর নৈবেদ্যের মুখ দেখতেন। পর্বদিনে পাড়া থেকে পুজো আসত বিস্তর—তেমনি তা বিলোতেও হ'ত—লাভের মধ্যে খাটুনির সীমা থাকত না। ভোগও ত ডাল ভাত আর চচ্চড়ি, কোনদিন একটু পায়েসও জুটত না। আধ-পো দুধ নেওয়া হ'ত রাত্রের শেতলের জন্যে—সেটুকু শাশুড়ী খেতেন। মহাশ্বেতা বলেছিল একদিন, 'ঠাকুরের ভোগে যে পায়েস দিতে হয় শুনেছি মা?' তাতে শাশুড়ী উত্তর দিয়েছিলেন, 'ওমা, সে আমাদের নয়, আমাদের যে আত্মবৎ সেবা। নিজেরা যা খাবো তা-ই ঠাকুরকে দেব।' মহাশ্বেতার একবার মনে হয়েছিল রাত্রের শেতলের কথা—ওরা ত আর রোজ দুধ খেত না, ভাতই খেত, তবে ঠাকুরকে তা দেওয়া হয় কেন? কিন্তু শেষ অবধি সাহসে কুলোয় না।

ঠাকুর আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা উপসর্গ জুটল—গোরু। অভয়-পদ কোথা থেকে একটা বড়-সড় বাছুর নিয়ে এল, এ নাকি বড় হয়ে বছর দেড়েকের মধ্যেই দুধ দেবে। দুধ দেবে কিনা মহাশ্বেতা জানে না, কিন্তু কাজ যা বাড়ল তাতে ওর চক্ষুস্থির! খড় কাটা, জাব দেওয়া, জল দেওয়া, গোয়াল কাড়া সবই করতে হয় তাকে। শাশুড়ী ঠাকুরঘর নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাঁর নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না—তা মহাশ্বেতা নিজের চোখেই দেখে, সুতরাং তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না—রাগ ধরে ওর ননদের ওপর। ওরই বয়সী ননদ—অন্তত শাশুড়ী তাই বলেন (মহার মনে হয় আরও বেশী বয়স)—তবু সে কুটি ভেঙে দু'খানি করে না। শাশুড়ীও কিছু বলেন না ওকে—সারাদিন পুতুল খেলে ঘুরে বেড়ায়। তার ওপর বৌদির নামে নালিশ করতে পারলে আর কিছু চায় না। একটু কিছু হলেই সুর তোলে, 'ও-মা-খ্যা-খো-না-বৌ-দি—' ইত্যাদি! হাড় জ্বলে যায় মহাশ্বেতার ওকে দেখলে। শাশুড়ীকে বললে বলেন, 'তা বৌমা, ওর অত্যেচার একটু সইতে হবে বৈ কি! ননদ ত—তাছাড়া ওর কিই বা জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে বলো!...র'সো না, পরের বাড়ি গেলেই জব্দ হয়ে যাবে।'

অঘ্রাণ মাসে আর এক খাটুনি বাড়ল। কোথায় নাকি ওদের জমি আছে—

সরিকানা জমি, প্রতি বছর এই সময় তার দরুণ ভাগের ধান এসে পড়ে। কয়
আসে অন্য বছর, একই সঙ্গে চাল করিয়ে তোলা হয়। মাস-তিনেকের মত চা
হয়। এবার অন্য সরিকের ধানও সস্তায় কিনেছে অভয়পদ, তাছাড়া ধান হয়েছে
বেশী। সুতরাং বস্তা করেই ধান ঘরে তোলা হ'ল। মাঝে মাঝে বার ক'
সে ধান সেদ্ধ করতে হয়, নেড়ে-চেড়ে শুকোতে হয়, তারপর নিয়ে যেতে হয় ওদে
জেঠশ্বশুরের ঢেঁকিশালে ভাঙাতে। তারপর আছে ঝেড়ে-বেছে তুঁষ-কুড়ো আলাদ
করা। অসম্ভব খাটুনি।

এত খাটুনি অভ্যাস নেই, শরীরেও কুলোয় না। মাঝে মাঝে মহাশ্বেতা
চোখে জল এসে যায়। ভাত খেয়ে উঠেই গোরুর কাজ সেরে ধান শুকিয়ে তু
রেখে হয়ত আবার এসে শাশুড়ীর সঙ্গে ঘাটে বাসন মাজতে বসতে হয়।
সময় আর চোখের জল বাধা মানে না, সকলের অজ্ঞাতে আপনিই টপ্ টপ্ ক'
ঝরে পড়ে জলের ওপর। শাশুড়ীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে সে সে-সময়
কোন প্রতিকার ত হবেই না, মিছিমিছি নানা রকমের জবাবদিহি করা···হয়
ছেলের কাছেই লাগাবেন। দুঃখ সে চেপেই থাকে প্রাণপণে।

এমন কি, মাকেও কখনও বলে না। তবে মধ্যে মধ্যে গিয়ে যখন পনরে
কুড়িদিন বাপের বাড়ি থাকে তখন যেন মনে হয় জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে
সে। মা সঙ্কোচ করে মেয়েকে আনতে—মেয়ে এলেই জামাইকেও আনতে হয়,
খরচ আছে, তাছাড়া মেয়েকেও ভাল ক'রে খেতে দিতে পারে না। আর যা
হোক শ্বশুরবাড়ি পেট পুরে ত ভাত খেতে পায় দুবেলা। কিন্তু মহা অত বোঝে
না, গলা জড়িয়ে ধরে মাকে বলে, 'আমাকে একটু তাড়াতাড়ি এনো মা, তোমা
কাছে না খেয়ে থাকলেও শান্তি।'

আগে আগে শ্যামা ভাবত যে এটা নিছক তার ওপর প্রীতি। কিন্তু তারপ
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথার ছলে বোকা মেয়ের কাছ থেকে সব কথাই বার ক'
নেয় সে। কষ্ট হয় খুবই, তবু মনকে সান্ত্বনা দেয়, গরিবের ঘরে জন্মেছে যখ
তখন ত খাটতেই হবে। জামাই ভাল হয়েছে, এইটুকুই লাভ।···

এক বছর পরে মহাশ্বেতার ভাগ্য একটু ফিরল। শোবার ব্যবস্থা পালটালো
কোথা থেকে কি বাড়তি টাকা পেয়ে ছোট ঘরটা সারিয়ে-সুরিয়ে নিলে অভয়পদ—
তার পর থেকে স্বামীর ঘরেই মহাশ্বেতার শোয়ার হুকুম হ'ল।

সে যেন বাঁচল। দুটো কথা কওয়া যায় প্রাণভরে, তা অভয়পদ উত্তর দিক
বা না দিক (অধিকাংশ কথারই উত্তর দেয় না)—মধ্যরাত্রে শেয়ালের ডাকে ঘু
ভেঙে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ লুকোনো যায়—

এটাই কি কম লাভ? মানুষটা সত্যিই ভাল—যত দিন যাচ্ছে, ততই বুঝছে মহাশ্বেতা—দূরে কোথাও শবযাত্রার 'বল হরি, হরিবোল' আওয়াজ পেলে নিজেই বুকের মধ্যে নেয় বৌকে, পিঠে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করে, 'ভয় পাও নি ত?'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এক

মেয়ের বিয়ের পর একটা বছর কাটল শ্যামার, যেন এক যুগ। বারো বছরেও মানুষকে বোধ হয় এত দুঃখ, এত কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় না—এত দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় না। এক-একটা দিন এমন আসে, মনে হয় বুঝি কাটবে না। সামান্য কিছু উপার্জনের পথ হয়েছে এটাও ঠিক, তেমনি হেম ইস্কুলে পড়ছে—'ফ্রি' হ'লেও কিছু খরচ ত আছেই। যখন-তখন যজমানি করতে যেতে পারে না। তার ওপর আছে মেয়ে-জামাই আনা, জামাইবাড়ি তত্ত্ব করা।

সে যেন এক সাধনা।

একদিন—তখন সবে মাস-কতক বিয়ে হয়েছে—লোকমুখে হেমের খুব জ্বর হয়েছে খবর পেয়ে এক শনিবার জামাই এসে হাজির। ঘরে কিছুই নেই—হেমের জ্বর। সরকারদের বাড়ির প্রায় সকলেই মঙ্গলার বাপের বাড়ি কি একটা ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে গেছেন। টাকাপয়সা হাতে নেই—কখনোই থাকে না—থাকলেই বা আনাত কাকে দিয়ে? এরকম লজ্জায় বোধ হয় জীবনে কোন দিন পড়ে নি শ্যামা। ঐন্দ্রিলা বাগান থেকে কোনমতে বুকে ক'রে নারকেলটা আসটা কুড়িয়ে আনতে পারে বটে কিন্তু তাকে বাজারে পাঠানো চলবে না। বাক্স-প্যাটরা ঘেঁটে দশটা পয়সা বেরোল কিন্তু যায় কে? যেতে গেলে ওকেই যেতে হয়। জামাইয়ের সামনে দিয়ে বাজারে যাওয়া? ছি! জামাই যদি দেখতে পায়?

আকাশ-পাতাল ভাবল শ্যামা। শরীরটাও ভাল নেই। সদ্য একটি মেয়ে হয়েছে ওর—এখনও তিন মাস হয় নি। প্রসবের পর থেকে নানা রোগে ওকে যেন জেরবার ক'রে দিয়েছে—ভূতের মত খাটবার শক্তি ত গেছেই, মাথাতেও যেন সব সময় সব কথা আসে না।

দশটা পয়সা হাতে ক'রে অভিভূতের মত রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে থাকে শ্যামা। শোবার ঘরে হেমকে অসুখের খবর জিজ্ঞাসা করছে জামাই, ঐন্দ্রিলা কি সব বকে যাচ্ছে আপন মনে—কোথায় কোন্ আম গাছের ডালে বসে বসন্ত-বৌরি পাখিটা কটর কটর করছে—এই সব শব্দের দিকে যেন কান পেতে থাকে সে।

অনেকক্ষণ পরে —একটা দমকা গরম বাতাসে ওর যেন চমক ভাঙে। ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ায়। পথও দেখতে পায় চোখের নিমেষে। ঠিক ত, ডাল ত আছে! আর আছে সদ্য সিধে-পাওয়া একটু গাওয়া ঘি ও ময়দা। হেমেরই উপার্জন—কি একটা ব্রত করিয়ে পেয়েছে সে।

ডাল ভিজিয়ে দেয় দু-তিন রকম। কাঠ জ্বেলে ছোলার ডাল চাপায়। একটা বার্লির কৌটোর এক কোণে দুটি সুজি পড়ে আছে—একটু হালুয়া ক'রে দেওয়া চলবে জামাইকে—এখন জলখাবারের মত। হঠাৎ যেন উৎসাহের জোয়ার লাগে ওর দেহমনে। বিত্তের দৈন্য বুদ্ধি দিয়ে ঢেকে নেবে—এই ওর সংকল্প। তিন ঘণ্টা পরে যখন জামাইকে খাবার সাজিয়ে দেয় তখন নিজেই অবাক হয়ে যায়। ধোঁকার ডালনা, ছোলার ডাল, পরোটা, রসবড়া, পায়েস! পায়েসটা নিয়েই বিপদে পড়েছিল, প্রথম কারণ চিনি বাতাসা মিশ্রী—যা কিছু ঘরে ছিল কুড়িয়ে কুড়িয়ে এর আগে হালুয়া আর রসে খরচ হয়ে গেছে। অথচ মিষ্টি আনানো যায় নি, সে অভাবটা শুধু রসবড়া দিয়ে সারতেও যেন কেমন লাগে, তাও তেলে-ভাজা রসবড়া—মায়ের মত ঘিয়ে-ভাজা রসবড়া করবে, সে ঘি কোথায়? এই ত তাই—লুচি ক'রে দেওয়া যায় নি—পরোটা ক'রেই দিতে হয়েছে! অথচ শেতলের দুধটাও ত আছে। অনেক ভেবে শেষে আঁধারে কূল পায়। কিছুদিন আগেই কুণ্ডুবাড়ির ছাঁদা পাওয়া গিয়েছিল, তার দরুন সন্দেশ ক'টা আজও পড়ে আছে হাঁড়িতে। একে চিনির ডেলা সন্দেশ, তায় এতদিনের বাসি—সামান্য গন্ধও হয়ে গেছে—সে সন্দেশ জামাইকে দেওয়া যায় না ব'লে ও-কথা আব মনেই রাখে নি। এখন মনে হ'ল চিনির ডেলা ত চিনির কাজে লাগানো যেতে পারে! মিছিমিছি নষ্ট ক'রে লাভ কি? গন্ধ? বর্ষাকালে ঘরে থাকলে চিনিতেও ত একটু ম'দো গন্ধ হয়! তাছাড়া খুঁজেপেতে যদি একটা ছোট এলাচ বেরোয় বাড়ি থেকে তাহলে গুঁড়িয়ে দিলেই ত গন্ধটুকু ঢেকে যাবে।

বেশ তৃপ্তি ক'রেই খেলে অভয়। কোনদিনই কিছু বলে না কিন্তু আজ ব'লেই ফেললে উচ্ছ্বাসভরে, 'অনেকদিন এত ভাল খাই নি। রান্না সব হয়েছে যেন অমৃত।' অভয় এখনও ঠিক 'মা' বলে নিঃসঙ্কোচে সম্বোধন করতে পারে না! প্রায় সমবয়সী শাশুড়াকে মা বলে ডাকতে বোধ করি ওর একটু লজ্জাই হয়।

সেদিনের কৃতিত্ব নিয়ে বেশ একটু গৌরববোধই হয়েছিল শ্যামার। অনেকদিন পর্যন্ত সে-কথা মনে হ'লে আনন্দে গর্বে বুকটা ফুলে উঠত। মঙ্গলাও বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসে যখন সব শুনলেন, কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন,

কথা কইতে পারেন নি! অনেকক্ষণ পরে বলেছিলেন, 'তোর ত খুব মাথাখানা খেলে বামুনি, আমি ত বাপু সাত রাত ভাবলেও এত কথা মাথা থেকে বার করতে পারতুম না। তা এর বেশ ভাল খাওয়াই হ'ল—আর কি!'

কিন্তু শুধু কি গর্ব—একটু লজ্জার কথাও ছিল বৈকি। যত তৃপ্তি ক'রেই খাক—বুদ্ধিমান জামাইয়ের চোখে আসল ব্যাপারটা ঢাকা থাকে নি। ঐন্দ্রিলার হাতে একটা টাকা ত দিয়ে গিয়েই ছিল, পরের দিন বিকেলে পাড়ারই কে একটি ছেলেকে দিয়ে একরাশ বাজার পাঠিয়ে দিয়েছিল—ডুমুর, থোড়, কাঁচকলা—বিনা মূল্যের আনাজ, আর তার সঙ্গে কিছু সাগু, মিশ্রী হেমের জন্যে।

লজ্জা বোধ হয়েছিল খুবই, মাথা কাটা গিয়েছিল জামাইয়ের কাছ থেকে এই সাহায্যটুকু—সাহায্য ছাড়া আর কি!—নিতে, কিন্তু আনন্দেও চোখে জল এসে গিয়েছিল। এত বিবেচনা যার তার হাতে পড়ে মেয়ে সুখী হবে, তার মত দুঃখ কিছুতেই পাবে না।

অভয় এলে তার ছেলেমেয়েদের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এটাও শ্যামা লক্ষ্য করেছিল। শুধু যে এলেই ওদের হাতে টাকা বা আধুলি দিয়ে যায় তাই নয়—ভাল খাবার যা কিছু ওর জন্য তৈরি হয় তারও ভাগ পায় তারা। শুধু তারা কেন—হেম অসুস্থ—সেদিন জামাইয়ের পাতে যা ছিল তা ঐন্দ্রিলার পক্ষে সব খাওয়া সম্ভব নয় এই অজুহাতে কি সেও খায় নি সে সব খাবার? অনেক ইতস্তত করেছিল অবশ্য জামাইয়ের পাতের উচ্ছিষ্ট খাবার আগে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোভের আর প্রয়োজনের জয় হয়েছিল। ঘরে কিছুই নেই, শরীর দুর্বল, সদ্য-প্রসূতির অসহ্য ক্ষুধা—লোভ সামলানো শক্ত। খেয়েছিল এবং খেয়ে খুশীই হয়েছিল। সে কথা মনে পড়লে এতকাল পরেও লজ্জা হয়—কিন্তু সেদিন উপায় ছিল না।

দুই

শ্যামা অনেকদিন ধরেই ভাবছে যে কলকাতায় যাবে কিন্তু আগেকার মত যাওয়াটা আর তার সহজ নেই বলেই হয়ে ওঠে নি। অথচ যাওয়াটা তার প্রয়োজন—এবারের প্রসবের পর থেকে শরীরটা যেন কিছুতেই সারছে না। কিছুদিন শুধু বসে খেতে পারলেও বোধ হয় একটু বল পেত সে। কিন্তু এদিকে হেমের ইস্কুল। তার বাঁধা বন্দোবস্তের নিয়ম-পূজা রয়েছে দু-দুটো। অথচ হেমকে ফেলেই বা যায় কি ক'রে? কে তাকে খেতে দেবে—কে দেখবে? এই সাতপাঁচ ভেবেই তার যাওয়া হয় না—ক্লান্ত দেহটাকে যেন চাবুক মেরে চালায়।

এরই মধ্যে চিঠিটা এল। লিখেছে উমা—মার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে, ডাক্তার বলেছে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া দরকার। মাকে রাজী করানো গেছে, এখন যাবার আগে মা তাঁর তিন মেয়েকেই একবার একসঙ্গে দেখতে চান—আর ফেরেন কি না ফেরেন তার ঠিক কি! শ্যামা কি দু-চার দিনের জন্য আসতে পারবে?

শ্যামা ব্যাকুল হয়ে উঠল চিঠি পড়ে, হওয়াই স্বাভাবিক। মা শুধু মা-ই ত নন—এখনও তার ভরসা, আশ্রয়। চরম কোন অবস্থায় পড়লে মার কাছে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে, তা সে জানে। মার কি আছে—কতটুকু আছে, সে খবর সে রাখে না। তবে মা চালাবেনই যেমন ক'রে হোক। এই বিশ্বাসটা মনের গোচরে, কিছু বা অগোচরে—আছে বলেই এমন ক'রে জীবনযুদ্ধ চালাতে পেরেছে শ্যামা। পেছনে কোথাও আছে ভরসা, আছে শেষ নিরাপদ অবলম্বন, এই জ্ঞান বা অনুভূতিই দিয়েছে তাকে শক্তি। সেই অবলম্বন কি শেষে ভেঙে পড়বে? এত তাড়াতাড়ি, এমন অসময়ে? এখনও যে হেম মানুষ হয়ে উঠল না! এখনও যে –

স্বার্থপরের মত শোনালেও এইটেই বোধহয় স্বাভাবিক। কোন দুঃসংবাদ শুনলে মানুষের প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় তার স্বার্থের স্থানটিতেই। শ্যামাকে তাই দোষ দেওয়া যায় না।

যাওয়া প্রয়োজন—আর এখনই।

শুধু যে মাকে শেষ দেখা তাই নয়, কোথায় আর তাঁর কি আছে—কতটুকু তার হেমের পাওনা—সেটাও জানা দরকার।

কিন্তু যাওয়া কি সম্ভব!

চিঠি হাতে নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে শ্যামা, অশ্রুসজল দৃষ্টি,—এমন সময় একমুঠো পানের খিলি মুখে পুরে চিবোবার চেষ্টা করতে করতে দেখা দিলেন মঙ্গলা।

'কী হয়েছে রে বামুন মেয়ে? অমন কাঁদো কাঁদো হয়ে বসে আছিস কেন? ওমা—হাতে চিঠি যে—কোন খারাপ খবর নাকি? মা মাগী ভাল আছে ত?' রুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ ক'রে কথাগুলো বেরিয়ে আসে।

কেঁদেই ফেললে শ্যামা উত্তর দিতে গিয়ে।

সব শুনে মঙ্গলা বললেন, 'এখনই চলে যা। এখনই। হেম থাক না, আমরা দেখব এখন। আমি না হয় এসে রাত্রে থাকব'খন। ভয় কি?'

'কিন্তু ওর খাওয়া-দাওয়া?'

'তাই ত!' একটুখানি চুপ ক'রে গেলেন মঙ্গলাও—তারপরই আবার তাঁর

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তা সে-ও একরকম ক'রে হয়ে যাবে এখন। আমি কি পিঁটুকী যদি ভাতটা চাপিয়ে দিই, তাহলে কোন রকম ক'রে ও নামিয়ে নিতে পারবে না ?'

হেম কাছেই বসেছিল, সে বললে, 'তা বোধ হয় পারব—দেখিয়ে দিলেই পারব।'

উৎসাহিত হয়ে ওঠেন মঙ্গলা, 'তোদের ত আতপ চালের ভাত—ফ্যানেভাতে খাওয়াও অভ্যাস আছে। এমন ভাবে জল দেব যে ফ্যানও গালতে হবে না। আর আমার ওদিকে আ-সকড়িতে যা ভাল তরকারি হয় দিয়ে যাবো'খন। রাত্রে দুখানা রুটি গড়েও দিতে পারবো। তুই নিভ্ভরসায় চলে যা বাম্‌নি, আমি তোর ছেলেকে দেখব।...আর উনি ত রাঁধুনী রাখবেন বলে আবার চেষ্টা করছেন। আমারও শরীর খারাপ, পিঁটুকীও গুছিয়ে রাঁধতে পাবে না। রাঁধুনী পেলে আর ভাবনা কি, আমাদের ওখানেই খাবে। পাওয়া যায় ঢের, তবে কি জানিস, সোমথ মেয়েছেলে আমি রাখব না। সে আমার এক কথা—খেতে পাই আর না পাই! ওদের দোষ ওই, এসেই কত্তাটিকে গিলে খাবার চেষ্টা করে। হুঁৎকো ব্যাটাছেলেও চলবে না। সোমথ সোমথ মেয়ে আমার ঘরে। তাই ত মুশকিল! যেটা ছিল তাকে ত আমিই তাড়ালুম বলতে গেলে। আমাব যে হয়েছে শতেক জ্বালা—চোরছ্যাঁচোড় না হয় তাও দেখতে হবে ত!'

তারপর একটু থেমে পানের পিচ ফেলে আবার বললেন, 'তুই কাল সকালেই চলে যা।'

রাসমণির শরীর কিছুদিন ধরেই ভাঙছিল। কমলা ও উমার চিঠিতেও ওঁর অসুখের খবর পেয়েছে সে—কিন্তু সত্যিই যে এত খারাপ হয়েছে তা শ্যামা কল্পনা করে নি। অমন রাজেন্দ্রাণী মূর্তি যেন শুকিয়ে ঝলসে কুঁকড়ে গেছে। উজ্জ্বল গৌর বর্ণে কালি মেড়ে দিয়েছে কে। দাঁতগুলো পড়ে গেছে সব কটাই। নিত্য জ্বর হচ্ছে—খুব সম্ভব ম্যালেরিয়া, কিন্তু ডাক্তার ডাকতে দেন নি এতকাল। পাড়ার এক বৃদ্ধ কবিরাজ চিকিৎসা করছেন—কিছুতেই যখন কিছু হয় নি তখন কমলা একদিন জোর ক'রে ডাক্তার নিয়ে এসেছে। তিনি দেখে ওষুধ দিতে জ্বর ওঠাটা বন্ধ হয়েছে কিন্তু একেবারে ছাড়ে নি। বিকেলের দিকে গা-গরম হয় প্রত্যহ। ডাক্তারবাবু বলেছেন হাওয়া বদল করতে হবে—নইলে এ পুরোনো জ্বর ছাড়বে না কিছুতেই। আর হাওয়া বদল করতে গেলে পশ্চিমে যাওয়াই দরকার। দেওঘর গেলেই ভাল হয়—তবে অতদূর যদি না যেতে চান রাসমণি

ত বর্ধমান কিংবা নলহাটি যেতে পারেন—জল-হাওয়া ভাল, উপকার হবে। নলহাটি ত আবার তীর্থস্থান, ললাটেশ্বরী আছেন, বাহান্নপীঠের এক পীঠ।

রাসমণি অনেক ভেবেছেন। উমাকে একা ফেলে যাওয়া চলবে না—নিয়ে যেতে হবে। এ বাড়িতে কে থাকবে? কমলা হয়ত রাজী হ'তে পারে। কিন্তু তিনিই বা একা যান কার ভরসায়? এই দুর্বল দেহ, তাছাড়া কখনও একা কোথাও যান নি, কলকাতার বাইরে কোথাও যাওয়া অভ্যাস নেই। কে সঙ্গে যাবে?

কিন্তু সে ব্যবস্থাও কমলা ক'রে দিলে। ওদের বৃদ্ধ পুরোহিত—রাঘব ঘোষাল বহু তীর্থ ঘুরে এসেছেন, বিদেশ যাওয়া তাঁর অভ্যাস আছে, তিনি সঙ্গে যেতে রাজী হলেন। খরচ আর খোরাকি দিলেই তিনি যাবেন, তাঁর কোন অসুবিধা নেই। তাঁর ছেলে বড় হয়েছে, যজমানী সে-ই বজায় রাখতে পারবে। মাঝখান থেকে তাঁর শরীরটাও সারিয়ে নিতে পারবেন।

এবার আর রাসমণি 'না' করতে পারলেন না। তাছাড়া তিনি চিরদিনই একরোখা মানুষ, তেজের সঙ্গে থাকতে ভালবাসেন। এমন অকর্মণ্য জবুথবু হয়ে, মেয়েদের সেবার ওপর ভরসা ক'রে থাকা তাঁর পক্ষে মৃত্যুর সমান। এতকালের গঙ্গাস্নান তাঁর—কোনদিন কোন কারণে যা বন্ধ করেন নি তা বন্ধ হয়েছে, সেটা যেন আরও কষ্টকর। মনে আছে প্লেগের বছরে যখন সারা কলকাতা শ্মশান হয়ে গিয়েছিল, তখনও তিনি প্রত্যহ ভোরে উঠে স্নান করতে গেছেন। রাস্তার দুধারে বড় বড় খালি বাড়িগুলো হাঁ-হাঁ করছে, নিস্তব্ধ পথ যেন গিলতে আসছে, তবু রাসমণি ভয় পান নি। তিনি পালানও নি। মৃত্যুকে—ত্বরিত মৃত্যুকে তাঁর ভয় নেই। শহর উজাড় ক'রে পালিয়েছে সব, স্ক্যাভেঞ্জার গাড়িগুলো ধুয়ে তাতে বসে পালিয়েছে সপরিবারে—গাড়ির অভাবে। ঐ গাড়িগুলোই নিয়েছে পনরো-বিশ টাকা—এখান থেকে চন্দননগর কি চুঁচড়ো যেতে। দেখেছেন আর হেসেছেন। প্রাণ কি এমন ক'রেই এরা ধরে রাখতে পারবে চিরকাল! এমন কি পুলিস থেকে যখন ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে নিমতলায় গঙ্গাস্নান যাওয়া বন্ধ করলে—তখনও রাসমণি বিচলিত হন নি—শুধু সময়টা একটু এগিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। রাত চারটেয় যেতেন—তিনটেয় যাওয়া শুরু করলেন। অত ভোরে পুলিস থাকবে না তা তিনি জানতেন।

না—ভয় পাবার মেয়ে রাসমণি নন। তখন মৃতদেহের সংখ্যা বেশি বলে হুকুম হয়েছিল দু-ঘণ্টার বেশি কেউ চিতা জ্বালাতে পারবে না। ঐ দু-ঘণ্টায় যা পুড়ল পুড়ল—বাকী যা থাকবে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে। সেই জন্যই গঙ্গাস্নান

আরও নিষিদ্ধ হয়েছিল। এই রকমই একটা কন্ধ-কাটা শব ভেসে এসে স্নানের ঘাটে সিঁড়ির নিচে আটকে ছিল—রাসমণি ঘাটে নামতে গিয়ে পা দিয়ে ফেলেছিলেন তার গায়ে কিন্তু চেঁচিয়ে ওঠেন নি, সেখান থেকে ছুটে পালান নি—কোন রকমেই বিচলিত হন নি। বরং হেঁট হয়ে আব্ছা আলোয় ব্যাপারটা ভাল ক'রে দেখে বুঝে 'নমঃ শিবায়' বলে এক গণ্ডূষ জল ছিটিয়ে দিয়েছিলেন তার গায়ে, তারপর তাকে প্রদক্ষিণ ক'রে গঙ্গায় নেমে গিয়েছিলেন। সঙ্গে যে শুকনো তসরের কাপড়খানা ছিল সেটাও অপবিত্র হ'ল মনে করেন নি।

বাড়িতে এসে কথাটা বলতে উমা চেঁচামেচি ক'রে উঠেছিল ভয়ে। রাসমণি হেসে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'ওমা, ভয় কি? অগ্নিদগ্ধ হয়ে গঙ্গায় পড়েছে, ও কি ভূত হয়ে আমাকে তাড়া করবে? ও শবও যা শিবও তাই।'

'কিন্তু অসুখটার ভয়ও ত আছে! ঐ ছোঁয়াচে রোগ যদি লাগে? দুদিন গঙ্গা নাওয়া বন্ধ করলে কি হয়?'

'হ্যাঁ—কি না কি, আমি গঙ্গা নাওয়া বন্ধ করব। আমার ও রোগ লাগবেই বা কেন? ও সব যারা মরছে তারা কি জানিস মা, বছুরকে মড়া, ওরা বছর বছরই মরে। একটা ক'রে হুজুগ ওঠে আর গণ্ডায় গণ্ডায় মরে। আমি মরব কেন?'

সেই গঙ্গা নাওয়া আজ তাঁকে বন্ধ করতে হয়েছে! এইটেই চরম ব্যথা।

জীবনের যত বেদনা, যত ব্যথা—পুঞ্জীভূত যত গ্লানি, সব ভুলিয়েছে মা জাহ্নবীর ঐ সর্বদুঃখহরা শীতল জল। চোখের গরম জল দিনের পর দিন মার ঠাণ্ডা জলে ঝ'রে পড়ে বুকের তাপ ঠাণ্ডা করেছে। ওঁর উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস মিশেছে মার বুক থেকে ভেসে-আসা তাপনাশা বাতাসে—করেছে তাঁকে শান্ত, সমাহিত। সহ্য করার শক্তি খুঁজে পেয়েছেন, পেয়েছেন আবারও যুদ্ধ করার শক্তি—দুঃখের সঙ্গে, দুর্ভাগ্যের সঙ্গে।

গঙ্গা ত শুধু তাঁর নেশা নয়—তাঁর আশ্রয় যে! সব—সব দুঃখ তিনি ঐখানে নিবেদন করেছেন দিনের পর দিন—নইলে বোধ হয় তিনি পাগল হয়ে যেতেন। নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন—কি শান্তি, কি অভয় লুকিয়ে আছে মার ঐ ঊর্মিমুখর স্রোতে! কি দয়া মা গঙ্গার—তা রাসমণি ছাড়া বুঝি আর কেউ জানে না।

সেই গঙ্গাস্নান তাঁর বন্ধ হ'ল বেঁচে থাকতেই—! কতকটা সেই জন্যই বোধ হয় রাজী হয়েছিলেন রাসমণি বিদেশে যেতে।

কিন্তু যদি যেতেই হয় ত বর্ধমান নলহাটি কেন—দেওঘরই বা কেন—যাবেন কাশীতেই। একটু সুস্থ হয়ে যদি বাবার মাথায় এক ঘটি জল ঢালতে পারেন কোন

দিন ত সেটাও হবে একটা লাভ। এ জীবনে কোন তীর্থেই প্রায় কখনও যাওয়া হয় নি। মরবার আগে কাশীতে একবার গেলেও সান্ত্বনা পেতে পারেন।

কাশীতে যাবেন তিনি। রাঘব ঘোষালকে বলে দিয়েছেন, পাণ্ডাকে চিঠি লিখে ঘর ঠিক করতে।

তিন

শ্যামা এসে দাঁড়াতে যেমন শ্যামার দু'চোখ দিয়েও জল ঝরে পড়ল, তেমনি রাসমণির চোখও শুষ্ক রইল না। এ কি চেহারা হয়েছে তাঁর শতদলের মত রূপসী মেয়ের? এ যে কঙ্কাল! এর আগেও অনাহার-শীর্ণ দেহে অনেকবার এসে দাঁড়িয়েছে সে—কিন্তু এত দুর্বল তাকে কখনও দেখেন নি।

নিজের রোগশীর্ণ কম্পিত হাতখানি ওর গায়ে-মাথায় বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তুই যাবি মা আমার সঙ্গে? চল্! তোর শরীরও সারবে।'

'আমি? কাশী যাবো?'

'হ্যাঁ—চল্ না। তাহলে উমাকে আর নিয়ে যাই না। ওরা দুজনে এখানে থাক। উমারও মেয়ে পড়ানোর ক্ষতি হয় না—'

'কী পড়ানো!'

উমা পাশে এসে বসেছিল, মাথা হেঁট ক'রেই বসেছিল, এবার চোখ তুলে শ্যামার চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি জানো না—তোমাকে বলাও ত হয় নি! আমি এই পাড়াতেই মেয়ে পড়াচ্ছি। এখন অনেকেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে চায়, কিন্তু লোক পায় না। ছোট-বড় অনেকগুলি মেয়েকে আমি পড়াচ্ছি। কোন কোন বাড়িতে বৌ এমন কি গিন্নীরা সুদ্ধ পড়ছে।'

'তুই—তুই বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়িয়ে আসছিস?'

'কী করব বলো? তারাই বা আমার বাড়ি আসবে কেন? কেউ কেউ হয়ত আসতে পারে, কিন্তু সবাই আসতে চাইবে না!'

শ্যামার তবু যে বিশ্বাস হয় না, 'আমাদের বাড়ির মেয়ে, বাড়ি বাড়ি ছেলে-মেয়ে পড়িয়ে বেড়াচ্ছিস্!'

উমার মুখ আগুন-বর্ণ হয়ে উঠল! সে একটু কঠিন কণ্ঠেই বললে, 'তোমার এখানে বুঝি আয়না নেই ছোড়দি? এই বাড়ির মেয়ে নারকোল আর ঝাঁটার কাঠি নিয়ে বাজারে গিয়ে বেচে আসছে— সেটা দ্যাখো নি?'

তা বটে। শ্যামা এবার মাথা হেঁট করে।

রাসমণির দেহেরই শুধু পরিবর্তন হয় নি—মনেরও হয়েছে। নইলে তিনি

কৈফিয়ত দেবার মানুষ নন। আজ যেন কতকটা সেই সুরেই কথা বললেন, 'কি করব বল্—ও যখন বললে, আর না বলতে পারলুম না! সত্যিই ত, কি খাবে? আর ত কিছুই নেই। আমিই যদি তুটো দিন বেশি বাঁচি, আমাকে কে খেতে দেবে সেই ত এক ভাবনা। কম্‌লির ত ঐ ষোল টাকা ভরসা! বড় জামাই থাকলে তিনিই দেখতেন। তবু ত ওর পেটটা চলবে!'

শ্যামার বিষয়বুদ্ধি এবার উগ্র হয়ে ওঠে, 'কত ক'রে পায়?'

'মেয়ে পিছু তু টাকা—কোথাও কোথাও এক টাকাও আছে। তিনটে মেয়ে এক জায়গায় পড়ে, তারা দেয় চার টাকা। মোটমাট মন্দ হয় না, কোন কোন মাসে ষোল-সতেরো টাকাও পায়।'

'কখন যাস্ রে?' শ্যামা এবার সোজাসুজি উমাকেই প্রশ্ন করে।

'এই খেয়েই বেরুই। এগারোটা নাগাদ। সন্ধ্যের সময় ফিরে আসি। সবই এই পাড়াতে।'

রাসমণি নিজের প্রশ্নের জের টানেন, 'কি বলিস্, যাবি?'

'আমার এই ছানাপোনা নিয়ে?'

উমা বললে, 'ঐন্দ্রিলা না হয় থাকবে আমাদের কাছে। খুকীটাকে নিয়ে যাও।'

'কিন্তু হেম? হেমকে একা ফেলে এসেছি যে! কি করছে ছেলেমানুষ—নিজেকে ভাত রেঁধে খেতে হচ্ছে, হাত-টাত যদি পুড়িয়ে ফেলে?'

এবার সকলেই চুপ করে যান।

শ্যামার মন কিন্তু তুলতেই থাকে লোভে। কাশী সমস্ত বাঙালীর মেয়েরই স্বপ্ন—সুদূর স্বপ্ন। আজকের মত তখন অত বেড়াতে যাওয়ার চল হয় নি। কাশীতে আর শ্রীক্ষেত্রে জীবনে একবারই যেতে পারত মানুষ, তাও অনেক চেষ্টাচরিত্র করলে।

সারাদিন ভেবে ভেবে শ্যামা একখানা চিঠি লিখলে হেমকে, জোড়া পোস্টকার্ড দিয়ে।

তুদিন পরে উত্তর এল—অভাবনীয় সুসংবাদ। মঙ্গলা এক বুড়ী রাঁধুনী পেয়েছেন। হেম ওঁদের ওখানেই খেতে পারবে—মঙ্গলা অনুমতি দিয়েছেন—যতদিন খুশি মার সেবা ক'রে যেন আসে বামুন-মেয়ে। পিঁটুকীর যে ছেলেটা হেমের সমবয়সী সে-ই হেমের সঙ্গে শুচ্ছে, ওঁরা অনবরত খবর নিচ্ছেন। কোন ভয় নেই।

শ্যামা বাঁচল। স্থির হ'ল কমলা এখানে এসে উমার কাছে থাকবে, ঐন্দ্রিলাকে ওরাই দেখাশুনা করবে। শ্যামা যাবে ওঁদের সঙ্গে।...

পাজিপুঁথি দেখে মোটঘাট বেঁধে একদিন রওনা হ'লেন। সঙ্গে গেলেন রাঘব ঘোষাল এবং তাঁর ছোট ছেলে সত্যহরি—বছর ষোল বয়স, রাঘবও বুড়ো হয়েছেন, রাসমণির এই অবস্থায় একা তিনি সামলে নিয়ে যেতে পারবেন কিনা সন্দেহ হ'ল শেষ পর্যন্ত, তাই এই ব্যবস্থা। সত্যহরি আর কিছু না করুক—ছুটোছুটি ত করতে পারবে। অনেক ভেবে তার খরচও বহন করাই শ্রেয় বোধ হ'ল। যাওয়া-আসা গাড়িভাড়া গোটা আষ্টেক টাকা—আর এক মাস খেতে কাশীতে আর কতই বা লাগবে—বড় জোর চার টাকা।

শ্যামার মনে হ'ল এই পয়সায় হেমকে আনা চলত। আহা, যদি নিত্য-সেবার কাজগুলো না থাকত!

রাসমণি এর মধ্যে তিন-চারবার বলেছেন যে তাঁর আর কিছুই নেই। এক-জোড়া যশম বিক্রি ক'রে এই একশ টাকার ব্যবস্থা করেছেন। আর যা রইল যদি বছর তিনেকের বেশি বাঁচেন ত কুলোবে না, উমার উপার্জনের ওপর নির্ভর করতে হবে। একটা বাড়িতে আলাদা থাকার যে বিলাস, তাও আর চলবে না।

কিন্তু শ্যামার কথাটা বিশ্বাস হয় নি। সে আরও সেইজন্যেই সঙ্গে যাচ্ছে। ঠিক আর কতটা আছে–কী কী আছে সেটা ভাল ক'রে জানতে চায় সে। ঐন্দ্রিলার বিয়েটাও যদি ওঁর ওপর দিয়ে সেরে ফেলা যেত। ঐন্দ্রিলাটা যে বড়ই ছোট।

কমলা আর গোবিন্দ গিয়েছিল তুলে দিতে। সঙ্গে পাড়ারই একটি ছেলে নিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে পালকি থেকে নামতেই প্রথম যার সঙ্গে চোখো-চোখি হ'ল সে নরেন। একমুখ খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, খালি পা, ছেঁড়া মেরজাই গায়ে—বাইরের রকে উবু হয়ে বসে আছে। পাশে একটা গামছায় কী পুঁটুলি বাঁধা।

কমলাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বিনা ভূমিকাতেই বললে, 'গ্যাখো দিকি দিদি, উমির কি আস্পদ্দা! আমাকে দেখে দোর খুললে না, বলে কি না দিদি আসুক। কেন আমি কি বাঘ না ভালুক?'

'তার চেয়ে বেশি যে ভাই, চোর-ছ্যাঁচোড় বাঘ-ভালুকেরও বাড়া।'

'তুমিও এই কথা বললে দিদি?' আহত কণ্ঠে বলে নরেন।

'তুমিই ত বলাও। আমি কি আর বলি। চলো চলো, ভেতরে চলো।'

ভেতরে এসে চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়ে পা ধুতে ধুতে বললে, 'বাড়ি ফিরে খোকার মুখে শুনেই আমি ছুটতে ছুটতে এলুম। তা হেঁটে আসা ত—তোমাদের

মত গাড়ি পালকি চড়ার ক্ষ্যামতা ত আমার নেই—ঠিক তোমরা বেরিয়েছ আর আমি এসেছি। তা আমার পরিবার কি সত্যিই চলে গেল?'

'গেল বৈকি। গাড়িতে তুলে দিয়ে এলুম।'

'কিন্তু এটা কি শাশুড়ী ঠাকরুণের নেয্য কাজ হয়েছে? তুমিই বলো দিদি। উনি ত এত সভ্য-ভব্য মানুষ—আমার পরিবারকে আমার বিনা হুকুমে তিনি কোন্ আইনে নিয়ে যান?'

'তোমার পরিবার তোমার হুকুমে চলবে—সে অবস্থা কি তুমি রেখেছ? পরিবারকে খেতে দাও তুমি?'

'দিই নে ত কি? বলি হেম যে নিত্যি-সেবার কাজ করছে—সেটা কার কাজ? আমি যদি এসে কেড়ে নিই?'

'তাহলে ত বাঁচে ও। তুমি খেটে ওদের খাওয়াবে—সেইটেই ত নিয়ম। হেম করছে সে তোমার ভাগ্যি।'

'ইস্, ভারি নিয়ম! আমি খাটব আর ঐ গোরবেটার জাত বসে খাবে!'

কমলা চুপ ক'রে যায়। ইতরটার সঙ্গে মিছিমিছি বকে মুখ ব্যথা করা।

পুঁটুলি খুলে হুঁকো কলকে চকমকি বার করে নরেন। তামাক ধরাতে ধরাতে বলে, 'হুঁ। তা কে কে গেল সঙ্গে?'

'মা, শ্যামা, রাঘব ঘোষাল আর তার ছোট ছেলে সত্যহরি।'

'কে, কে গেল?' তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে নরেনের কণ্ঠ, 'রাঘব ঘোষাল, সে আবার কে? কত বয়স?'

'ওরে বাবা, আমাদের সেই বুড়ো পুরুত! তোমার বিয়েও সে-ই দিয়েছে। তার প্রায় ষাট বছর বয়স।'

'হলোই বা ষাট। এমন কিছু বুড়ো নয় দিদি। আমার এক যজমান সাতষট্টি বছর বয়সে চতুর্থ পক্ষে বিয়ে করেছে—তার পরও তার তিনটে ছেলেমেয়ে!'

কমলা ক্লান্তভাবে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। সেইভাবেই চুপ ক'রে বসে রইল। মনটা ভাল নেই। মা ঐ অবস্থায় গেলেন, সুস্থ হয়ে ফিরবেন কি না কে জানে! তারও ত মাথার ওপর মা ছাড়া আর কেউ নেই।

হঠাৎ কানে আবার সেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠের প্রশ্ন পৌঁছয়, 'আর ওর ছেলে কি যেন বললে সত্যহরি না ফত্যহরি—তার বয়স কত?'

'পনরো-ষোল হবে।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় কমলা।

'ওমা, তবে ত যুবো ছেলে! তা গাড়িতে কে কোথায় বসল?'

'সবাই এক গাড়িতে উঠেছে। মার শরীর খারাপ, মেয়ে গাড়িতে তুলতে

ভরসা হ'ল না।'

'তবেই ত বলসে ভাল! তা আমার পরিবারের পাশে কে বসল?'

'মা।'

'সে ত গেল এক পাশে। আর এক পাশে?'

'আর একদিকে পুরুত ঠাকুর আছেন, ভয় নেই।'

'হুঁ। তাহলে আমার পরিবার বসেছে রাঘব ঘোষাল আর শাশুড়ী মাগীর মাঝখানে! আর সেই ছোঁড়াটা? সে আবার মাঝরাস্তায় গিয়ে আমার পরিবারের পাশে এসে বসবে না ত?'

কমলা উঠে দাঁড়ায় এবার, রাগ ক'রে বলে, 'অত আমি জানি না, ইচ্ছে হয় উড়ে গিয়ে দেখে এসো গে।'

'বা রে, বেশ মজা ত! আমার পরিবার কার পাশে বসে যাচ্ছে আমি খবর নেব না?'

ততক্ষণে কমলা ওপরে উঠে গেছে। সেদিকে চেয়ে বসে খানিকটা তামাক টানবার পর একসময় কর্তা আপন মনেই ব'লে উঠল, 'ফিরে আসুক একবার। গোরবেটার জাতকে এক কোপে যদি সাবাড় না করি ত আমার নাম নেই।'

ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে উমা প্রশ্ন করলে, 'রাত্রে খাবে নাকি এখানে?'

'ও হরি, শউর বাড়ি এসেছি—খাবো না? একটু ভালো ক'রে মৌরী বাটা দিয়ে ঘন ঘন বিউলির ডাল রাঁধ্ দিকি উমি, অনেকদিন খাই নি।'

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এক

উমা ছেলেমেয়ে পড়ায় সবসুদ্ধ ন'টি। এর কম পড়ালে কোন কাজ হয় না কারণ মাইনে বেশি নয় কোথাও। সে ইংরেজী জানে না, ছেলেদের পড়ানো তার পক্ষে অসম্ভব, আজকাল সবাই চায় ছেলেদের ইংরেজী শেখাতে, যেমন-তেমন ক'রে দু-পাতা ইংরেজী শিখতে পারলেই ভাল চাকরি মিলবে। মেয়েদের ইংরেজী শেখাটা এখনও তত চল হয় নি তবে বেশিদিন অচলও থাকবে না, শোনা যাচ্ছে এখনই কেউ কেউ শেখাতে শুরু করেছেন, আগেকার মত মেয়ে ইস্কুল আর ফাঁকা প'ড়ে থাকে না। উমার চাড় আছে, লোক পেলে সে ইংরেজী শিখে নিতে পারে অল্পদিনেই। কিন্তু সে লোক কৈ? গোবিন্দ সবে পাড়ার পাঠশালায় যেতে শুরু করেছে, তার সম্বল ফার্স্ট বুক। সে যেটুকু জানে সেটুকু উমা অবশ্য

শিখে নিয়েছে কিন্তু সে ত অক্ষর পরিচয় মাত্র। অসহিষ্ণু উমা আরও এগিয়ে যাবার জন্য ছট্‌ফট করে—পাঁচ-ছ বছরের বালকের আধার বুঝে পণ্ডিত মশায় সাবধানে এগোন, উমার প্রয়োজন বুঝে তিনি ত আর ডিঙিয়ে চলবেন না! পূর্ণবয়স্কা উমা যেটা পাঁচ মিনিটে আয়ত্ত করতে পারে—শিশুর তাই আয়ত্ত করতে লাগে পুরো এক সপ্তাহ।

মেয়ে পড়ানোর রেওয়াজ খুব বেশি না হ'লেও এখন অনেকেই সচেতন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এ পাড়াটা বিশেষ এক শ্রেণীর বনেদী 'কলকাত্তাই' ব্যবসায়ী-বহুল, এবং তাঁদের ধারণা মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে লক্ষ্মী থাকবে না। এঁদের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার এখনও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রত্যেকটি প্রচলিত পথ অনুসরণ করে। এঁরা এগোতে চান না—লক্ষ্মী হারাবার ভয়ে। যদিও সে লক্ষ্মীকে তাঁরা তেমন করে ধরে রাখতেও পারেন নি! কলকাতার এই বিশেষ ব্যবসায়ী সমাজ পেছিয়ে গেছেন নিজেদের আসন মারোয়াড়ীদের ছেড়ে দিয়ে।

সে যাই হোক—উমাকে একটু দূরে-দূরেও যেতে হয়। সদর রাস্তা পার হয়ে ওধারের দু-একটা গলিতেও। কিন্তু উমা আর ভয় পায় না। সে কেমন ক'রে বুঝেছে যে ভয় পেলেই ভয় চেপে ধরে। সে কারও নিষেধ বা সতর্কবাণীও শুনতে রাজী নয়। আজ যারা সতর্ক করতে আসছে তারা চরম দুর্দিনে কেউই এসে দেখবে না, অন্ধকার ঘরে বসে শুকিয়ে মরতে হবে সেদিন। তাই কি ঘরে বসেই মরতে পারবে? বাড়িটাও ত নিজেদের নয়। ভাড়া না দিলেই তাড়িয়ে দেবে। এক উপায় আছে সোজাসুজি গলায় দড়ি দেওয়া কিন্তু সে পথ ত খোলা রইলই। শেষ পর্যন্ত না দেখে, অদৃষ্টের সঙ্গে শেষ যোঝা না যুঝে ও-পথে যাবে না উমা। মহাভারতে সে পড়েছে আত্মহত্যা মহাপাপ—মহাপাপ সে আর করবে না। গতজন্মে কি মহাপাপ করেছিল, কি চরম বঞ্চনা করেছিল আর কাউকে, তাই এ জন্মে এমন ভাবে বঞ্চিত হ'ল। সধবা মেয়ে রূপ-যৌবনের ভরা ডালি সাজিয়ে বসে রইল অথচ সে ডালি কারও পায়ে সঁপে দিতে পারলে না। এ জীবন রইল অস্পৃশিত—এ কুসুম রইল চিরদিনের জন্য অনাঘ্রাত। আবার এ জন্মে মহাপাপ করতে রাজী নয় সে—যত কিছু পাপ এ জন্মেই ধুয়ে মুছে যাক।

ন'টি ছেলেমেয়ে পড়ায় কিন্তু মোট তাকে যেতে হয় ২'টি বাড়িতে। এক বাড়িতে দু'টি, আর এক বাড়িতে তিনটি পড়ে একসঙ্গে। দুটি পড়ে এক ডাক্তারের ছেলেমেয়ে, তিনি দেন সোজাসুজি চার টাকাই। তিনটি পড়ে যেখানে—দুটি মেয়ে একটি ছেলে—সে ভদ্রলোক কায়স্থ, কোন এক বড় বিলিতী

কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দি, মোটা টাকা আয়—কিন্তু অত্যন্ত কৃপণ—তিনি ঐ তিনটি মিলিয়ে দেন চার টাকা। আর চারটি মেয়েকে আলাদা আলাদা পড়াতে হয়, দুজন দেয় দু'টাকা হিসেবে, বাকী দুজন দেয় এক টাকা ক'রে। এরা ঐ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে। সাহস ক'রে লক্ষ্মীকে অগ্রাহ্য করেছেন এঁদের অভিভাবকরা, সেজন্যে কিছু সুবিধা যেন দাবীই করেন।

এত হাঙ্গামা করতে হ'ত না সাদিক মিয়াদের বাড়ি পড়াতে রাজী হ'লে। ওঁদের বাড়িতেই মোট আট-নটি ছেলেমেয়ে—বৃদ্ধ সাদিক আজও বেঁচে আছেন, তিনি এমনও প্রস্তাব করেছিলেন যে উমাদিদির যদি ওখানে যেতে বাধা থাকে, তিনি তাঁর নাতি-নাতনীদের এ বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন, কিন্তু রাসমণি তাতে রাজী হন নি। তিনি সাদিকের কাছে হাত জোড় ক'রে বলেছিলেন, 'আপনার নাতি-নাতনীকে পড়িয়ে তার জন্য যদি হাত পেতে টাকা নিতে হয় ওকে, ত তার চেয়ে লজ্জার কথা আর কিছু নেই, তার আগে ওর গলায় দড়ি দেওয়াই ভাল। তার ওপর সবই ত বোঝেন বাবা আপনি, ব্রাহ্মণের মেয়ে আপনাদের কাছে চাকরি করলে জাতে ঠেলবে শেষ পর্যন্ত। ওর আর ভয় কি—আমার অন্য মেয়ে ত আছে, তাদের সমাজও আছে, তাদের বিপন্ন করা কি ওর উচিত হবে?'

এর পর আর সাদিক পীড়াপীড়ি করতে পারেন নি। নসিবনের বিয়ে হয়েছে টেরিটিবাজারে এক ধনী দিল্লীওয়ালার ঘরে—ওর স্বামীর ইচ্ছা তার ছোট বোনকে ও ভাইকে অর্থাৎ নসিবনের দেওর ও ননদকে বাংলা শেখায়। নসিবনদের গাড়িও আছে, সে বলেছিল উমাকে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবে এবং পৌঁছে দেবে কিন্তু তাও হয়ে ওঠে নি —ঐ একই কারণে। রাসমণি নসিবনের পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ব্যাপারটা। তাছাড়া অপরিচিত মুসলমান পরিবারের মধ্যে যাওয়ার অন্য বিপদ আছে। বিপদ না ঘটলেও দুর্নাম রটতে পারে।

অগত্যা উমাকে এই ছটি বাড়িতে ঘুরে ঘুরে পড়াতে হয়। নিজের বাড়িতে পড়ানো সম্ভব নয়—ঐটুকু-টুকু মেয়ে কেউই বাড়ির বাইরে যেতে দিতে রাজী নন। সব চেয়ে মুশকিল হয় সময় পাওয়া নিয়ে। বেলা বারোটা-একটা নাগাদ সংসারের কাজ সেরে বেরিয়ে পড়ে—ফিরতে ফিরতে পাঁচটা ছ'টা বেজে যায়। গরমের দিনে একটু দেরি করলেও চলে, কারণ সন্ধ্যা হয় বহু বিলম্বে, শীতকালে যেন ঝপ্ ক'রে অন্ধকার হয়ে আসে চারদিকে, নিঃশ্বাস ফেলতেও অবকাশ পাওয়া যায় না। অন্ধকার হবার পর আর রাস্তায় থাকতে সাহস হয় না—থাকবার উপায়ও নেই। মধুলুব্ধ মধুকরের দল সর্বকালেই আছে। বেকার যুবকের সংখ্যা তখনও কম ছিল না। এখন বেকার থাকে বাধ্য হয়ে, কাজ পায় না বলে, তখন বেকার থাকত—

থাকলে চলত বলে। সে একটানা নিশ্চিন্ত বেকারী, যৌবন যতদিন থাকত ততদিন দুর্বৃত্ততা ও দুশ্চরিত্রতায় ভাঁটা পড়ত না। দিনের বেলাতেও তাদের সাহস খুব কম হবার কথা নয়—তবে এক্ষেত্রে উমার কিছু জোরও ছিল। রাসমণিকে এ পাড়ার অনেকেই সমীহ করতেন, তাঁর ইতিহাস সবাই জানতেন—তাঁর চরিত্রের মাধুর্যের সঙ্গে দৃঢ়তার যে অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল তার পরিচয়ও কিছু কিছু পেয়েছেন অনেক। সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা দুইই তিনি আকর্ষণ করেছেন সমানে। সুতরাং বেশী কিছু ধৃষ্টতা করলে অভিভাবকদের কাছ থেকে চাপ আসবে তা সকলেই জানত। আর ভয় ছিল সাদিক মিয়ার বলিষ্ঠ ছেলে ও নাতিগুলিকে। সেজন্যে দিনের বেলায় রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করায় অতটা ভয় ছিল না। কিন্তু রাত্রির কথা আলাদা। দিনের বেলা যা শুধু সাহস, রাত্রে সেইটাই দুঃসাহস।

অথচ মাইনে যাঁরা দেন তাঁরা দু টাকাই দিন আর এক টাকাই দিন—ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেন সবাই। এক ঘণ্টা পড়াতেই হয়—বড়জোর তা থেকে দু-পাঁচ মিনিট চুরি করা যায়। সুতরাং এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি সে যায় ঊর্ধ্বশ্বাসে—আস্তে চলার অভ্যাস তার এই ক-মাসের মধ্যেই যেন কোথায় চলে গেছে। তবু এক-একদিন শেষ বাড়ি থেকে বেরোতে (যদিও শেষের জন্যে সে ডাক্তারের বাড়িটাই রেখে দেয়, কারণ ঐটেই সব চেয়ে কাছে, তাছাড়া ওঁরা মানুষ খুব ভদ্র, তেমন দেরি হ'লে সঙ্গে ঝি দিয়ে বাড়িতে পৌঁছেও দেন) বেশ ঘোর হয়ে আসে চারিদিকে।

একদিন এমনি তাড়াতাড়ি সারবার চেষ্টা সত্ত্বেও দেরি হয়ে গেছে। ঝি সেদিন গেছে কুটুম-বাড়ি তত্ত্ব নিয়ে, ডাক্তারের গৃহিণী প্রস্তাব করলেন, 'আমার খোকাই না হয় এগিয়ে দিক তোমাকে। কী বলো গো মেয়ে ?'

খোকা অর্থাৎ তাঁর তেইশ-চব্বিশ বছরের ছেলেটি। ওর চাউনিটা উমার ভাল লাগে না কোন দিনই—বিশেষ ক'রে তার সঙ্গে অন্ধকারে একা পথ চলার চেয়ে অদৃষ্টদেবতাকে বিশ্বাস করাই ভাল। উমা ঘাড় নেড়ে বললে, 'না না কাকীমা-আমি এমনিই চলে যাবো, এইটুকু ত পথ।'

সে ওঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একরকম দৌড়তেই শুরু করলে। পথ খুব বেশি না হ'লেও দুটো গলি পেরোতে হয়। প্রথম গলি যেটা বেশী নির্জন, সেখানে একটা বাড়িতে এই সময় একদল বৃদ্ধ বসে আড্ডা দেন, সেইটাই উমার ভরসা কিন্তু গলিতে ঢুকে অনেকটা এগিয়ে এসে দেখল আজ সে রক খালি, বৃদ্ধের দল কোন অজ্ঞাত কারণে অন্যত্র কোথাও আড্ডা বসিয়েছেন কিংবা কেউই বাড়ি থেকে বেরোন নি। তখন আর ফেরা সম্ভব নয়—মনে মনে দুর্গা নাম জপ করতে করতে এগিয়ে চলল সে, কিন্তু ঠিক এই সময়েই মনে হ'ল তার পেছনে আ-

একটা পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—কে যেন তার পেছনে পেছনে আসছে। হয়ত সবটাই ভয়, নিছক ভয়—তবু পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখাও সম্ভব নয়। সে আরও জোরে, প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল—আর তারই ফলে একেবারে মোড়ের কাছাকাছি এসে সজোরে ধাক্কা লাগল একটি পুরুষের সঙ্গে—অপরিচিত এবং পরপুরুষ ত অবশ্যই! দোষ লোকটিরও নয় কারণ সে ওপাশ থেকে আসছিল, তার পক্ষেও আগে থাকতে উমাকে দেখে সতর্ক হওয়া সম্ভব ছিল না। আতঙ্কে, আশঙ্কায়, লজ্জায়, ক্ষোভে—উমা হয়ত অজ্ঞানই হয়ে পড়ত যদি না অত্যন্ত সুপরিচিত একটি কণ্ঠের বিস্ময়সূচক ধ্বনি কানে এসে বাজত—'এ কি, তুমি!'

আর একটু থেমে—মুহূর্ত কতক মাত্র—বাকী প্রশ্নগুলোও শেষ করলে সে, 'এখানে, এমন একা?'

লোকটি শরৎ—তার স্বামী।

এই লোকটির সঙ্গে তার পরিচয় খুবই অল্পকালের, তাকে ভরসা করার মত, তাকে অবলম্বন করার মত নির্ভরতা বোধ করে এমন কোন কারণই নেই—তবু উমার তখনকার নিশ্চিন্ততা কল্পনা করার নয়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজে সে দাঁড়িয়ে দম নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু দাঁড়াতে পারলে না কোনমতেই, এতগুলি পরস্পরবিরোধী প্রবল অনুভূতির সংঘাতে তার সমস্ত স্নায়ু যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল—সে প্রাণপণে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা ক'রেও শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারলে না—টলে ঠিক নয়, এলিয়েই পড়ল শরতের বুকের মধ্যে।

'এই ছাখো—এ কি কাণ্ড? কী হ'ল তোমার?'

আনাড়ীর মত অপ্রস্তুতভাবে শরৎ ওকে ধরে ফেললে এবং পরস্ত্রীর মতই আড়ষ্ট ভাবে ধরে রইল।

উমা অবশ্য অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলে। স্বামীর এই সামান্য আড়ষ্টতার মধ্যে যে তীব্র অপমান ছিল সেটাও ওর অবসন্ন স্নায়ুকে সক্রিয় ক'রে তুলতে কতকটা সাহায্য করলে হয়ত। সমস্ত পরিচিত ইতিহাস মনের মধ্যে লেপে মুছে গিয়ে, সব কিছু যুক্তি-তর্ক ছাপিয়েও যে আশ্বাস ও আশা স্ত্রীর মনে জাগা স্বাভাবিক সেইটাই হয়ত স্বামীর বুকে এলিয়ে পড়বার সময় উমার মনেও জেগেছিল, ভাত ক্লান্ত স্ত্রীর অবস্থা দেখে সস্নেহেই বুকে আশ্রয় দেবে শরৎ—অন্তত কিছুকালের জন্য। পর হলেও মানুষ এমন সময় আশ্বাস দেয়, আশ্রয় দেয়।

কণ্ঠস্বরে কোন দুর্বলতা না ফুটে ওঠে—হে ভগবান!

উমা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে সহজভাবেই উত্তর দিলে, 'বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম!'

'তা ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কেন? এমন সময় এই নির্জন গলি দিয়ে যাচ্ছিলেই বা কোথায়—অত দৌড়ে।'

'বাড়ি যাচ্ছিলুম। সরো, পথ ছাড়—একেবারে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, আর দেরি করার সময় নেই।'

'থাক—অমন ক'রে আর দৌড়তে হবে না, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

চরম বিপদের দিনে লোকটার সঙ্গে দেখাও হয়ে যায় ত ঠিক! এত দুঃখের মধ্যেও কথাটা মনে ক'রে হাসি পায় ওর। আহা—কি সম্পর্ক!

পাশাপাশি চলতে লজ্জাই করে। শরৎ একটু আগে আগে যায়—উমা পিছু পিছু।

শরৎ আবারও প্রশ্ন করে, 'কোথা থেকে আসছিলে?'

'মেয়ে পড়িয়ে।'

'কী—কী ক'রে?' চমকে দাঁড়িয়ে যায় শরৎ।

'পথের মধ্যে অমন ক'রে দাঁড়াতে হবে না। চলো। কেউ দেখলে কি মনে করবে। তোমাকে ত এ পাড়ায় কেউ চেনে না।'

কণ্ঠস্বরে সামান্য একটু ব্যঙ্গই ফুটে ওঠে ওর।

শরৎ চলতে শুরু করে বটে কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যায়।

'কিন্তু কী করছিলে তাই যে বুঝতে পারলুম না!'

'মেয়ে পড়াচ্ছিলুম, ছেলেমেয়ে পড়ানোর কাজ করি আমি এখন। এক টাকা দু টাকা মাইনে—নটা ছেলেমেয়ে পড়াই। এই ছ ঘণ্ট খেটে ফিরছি। বুঝেছ—শরীর আর মনের কি অবস্থা? অন্য-দিন এর চেয়ে আলো থাকতে থাকতে ফিরি, আজ দেরি হয়ে গেছে বলেই ভয় পেয়ে ছুটছিলুম।'

গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে উমার।

তবু শরতের অবিশ্বাস যেন যায় না।

'তুমি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছেলেমেয়ে পড়াচ্ছ? এই বয়সে? একা? সে কি!'

'কেন, তাতে অবাক্ হবার কি আছে?'

'তোমার—তোমার এত পয়সার দরকার হয়েছিল?'

'হওয়াটা কি অন্যায়?' ততক্ষণে নিজেদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁচেছে উমা। সদরের চৌকাঠে একটা পা দিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'যার স্বামী ভরণপোষণ করার প্রতিজ্ঞা ক'রেও সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে না, তার আর কি উপায় আছে বলতে পারো? কী আশা করেছিলে তুমি, আমার বিধবা মা

আজীবন বসে খাওয়াবে, আর এত টাকা রেখে যাবে যে মা মরবার পরও বসে খেতে পারব ? নাকি সোজাসুজি বেশ্যাবৃত্তি করলেই ভাল হ'ত ?…অবাক হয়ে গাছ থেকে পড়লে যে একেবারে ! যে প্রশ্নগুলো আমাকে করছিলে সেগুলো আমার স্বামীকে ক'রে ভাখো না, তিনি কি বলেন !'

উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে উমা—কথা কইতে কইতে।

'চলো চলো, ভেতরে চলো,—তোমার গলার আওয়াজ যা চড়ছে, এখনই আশেপাশের বাড়ির জানলায় লোক এসে দাঁড়াবে, অপ্রতিভভাবে বলে শরৎ।

উমাও একটু লজ্জিত হয়ে দালানের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পিছু পিছু শরৎও কয়েক পা এগিয়ে আসে।

'বারোটায় বেরিয়েছি, ছটা বাড়ি ঘুরতে হয়েছে—আর সমানে বকতে হয়েছে কতগুলো ছেলেমেয়ের সঙ্গে। তার ওপর এই আতঙ্ক। দিনরাত দুটো শত্রু সঙ্গেই আছে—রূপ আর যৌবন ! এ যে আমি আর পারি না !'

উত্তর দেওয়া শরতের পক্ষে কঠিন হ'ত—কিন্তু দিতে তাকে হ'ল না।

'কার সঙ্গে কথা কইছিস রে উমি ?'

আলো হাতে ক'রে অবাক হয়েই নিচে নেমে আসে কমলা।

'ওমা, এ যে শরৎ জামাই। এসো এসো। ওপরে এসো। কি ভাগ্যি !'

'না দিদি—আজ যাক। হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে—তাই-আমি বরং—'

কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে পড়ে শরতের।

কমলা এসে একেবারে হাত ধরে ওর, 'আমি তোমার দিদি হই ভাই—একদিন একটা কথা শোন। দু মিনিট স্ত্রীর কাছে বসে গেলে কেউ তোমার নিন্দে করবে না। এসো—ওপরে এসো।'

যাকে বলে যন্ত্রচালিতের মতই শরৎ ওপরে গিয়ে বসে। এবার আলোয় ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে উমা, বড়ই রোগা হয়ে গেছে শরৎ, কেমন যেন বুড়িয়ে গেছে এই বয়সেই। অমন সুন্দর মুখ—গাল চড়িয়ে চামড়া কুঁচকে বিশ্রী হয়ে গেছে। কমলা ওদের বসিয়ে রেখেই 'আসছি' বলে বেরিয়ে গিয়েছিল। দুজনে একা। নিজের অজ্ঞাতসারেই কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, 'এমন চেহারা হয়েছে কেন তোমার ? অসুখ করেছিল নাকি ?'

'আমার ? কৈ না ত !' তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'খাটুনি বেড়েছে বেজায় ! নিজে একটা ছোটোখাটো প্রেস করেছি কিনা। বড্ড খাটতে হচ্ছে। পুঁজি ত অল্প।'

তারপর দুজনেই চুপচাপ—

খানিক পরে মাথা হেঁট ক'রে মেঝেতে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে শরৎ বললে, 'চারদিকে দেনা—নইলে তোমার খরচপত্র ত—কতই বা—তা অল্প দু-এক টাকার দরকার আছে তোমার ?'

'না। নিজেই রোজগার করছি এইমাত্র ত শুনলে। স্বামীর কাছ থেকে ভিক্ষেটা আর নাই নিলুম। তাতে ত আর আমার অভাব ঘুচবে না।'

'আচ্ছা, তাহ'লে উঠি এখন।' শরৎ সত্যিই উঠে দাঁড়ায়।

'এখনই !' চাপা আর্তস্বরে বলে ওঠে উমা, 'বহু লোকে ত বিয়ে করা বৌ রেখে বেশ্যাবাড়ি যায়,—তুমি, তুমি বেশ্যাকে ফেলে বিয়ে-করা বৌয়ের কাছে দু দণ্ডও থাকতে পারো না !'

শরতের মাথাটা হেঁটই ছিল, আরও হেঁট হয়ে এল, অনেক ইতস্তত ক'রে যেন প্রাণপণ চেষ্টায় সে উত্তর দিলে, 'স্ত্রী বলেই তোমার কাছে থাকতে চাই না। ভাল না বেসে মেয়েমানুষের কাছে যাওয়া যায়—স্ত্রীর কাছে যাওয়া যায় না। তার সঙ্গে ঘর ক'রে, তার হাতে ভাত খেয়ে, তোমার কাছে আসাটা তোমাকে কি আরও অপমান করা হ'ত না ? আমি তোমার স্বামী হবার যোগ্য নই—স্বামী নইও—তা বলে তোমার মর্যাদা আমি জানি না এটা মনে করো না। যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, মনে মনে অহরহ ভগবানকে ডাকি, আমি যেন শীঘ্র যেতে পারি। তুমি বিধবা হ'লে তবু এই অপমানের হাত থেকে বাঁচবে।'

শেষের দিকে শরতের গলা কেঁপে গিয়েছিল, সেই কাঁপন-লাগা গলার স্বর আর শেষের কথাগুলো তন্ময় হয়ে উপভোগ, হ্যাঁ উপভোগই করছিল উমা—স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রদীপটার দিকে তাকিয়ে ছিল সে —কেমন একটা বিহ্বল ভাবে। তাই কখন যে শরৎ বেরিয়ে গেছে তাও যেমন টের পায় নি, কমলা ভগ্নীপতির জন্যে জল-খাবারের থালা সাজিয়ে যখন ঘরে ঢুকল তখন সেটাও তেমনি টের পেলে না।

'এ কি, জামাই চলে গেল ! মুখপড়ি দুটো মিনিটও ধরে রাখতে পারলি নি !'

উমার কানে বোধ হয় এ অনুযোগও পৌঁছল না। সে তেমনি পাথরের মতই দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে।

দুই

উমার সে অভিভূত অবস্থা সারারাতের মধ্যেও কাটল না। সমস্ত রাত সে ঠায় জেগে কাটিয়ে দিল। অবশ্য সেটা এখন তার প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাল ক'রে ঘুম তার একদিনও হয় না। তবে আজকের ব্যাপারটার

মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল—সে ঘুমোবার চেষ্টাও করে নি। সারারাত বসেই ছিল। কমলা মধ্যে মধ্যে ঘুমের ঘোরে একটু বিস্ময় প্রকাশ করেছে, 'ওমা উমি, তুই এখনও বসে আছিস্?' আর প্রতিবারই উমা তাকে আশ্বাস দিয়েছে, 'এই যে শুই দিদি!' কিন্তু শোবার চেষ্টাও করে নি। আজকের রাত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

শরতের শেষের কথাগুলোও—কথাগুলোও ততটা নয় যতটা তার গলার আওয়াজ - ওর সমস্ত মর্মমূলকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। শেষের কথাগুলো বলার সময় তার গলা কেঁপেছিল, কণ্ঠস্বর হয়ত বা একটু গাঢ় হয়েই এসেছিল—সে যে কতটা, বা কী, তখন ভাল ক'রে শোনা বা বিচার করার অবসর মেলে নি, এতই আকস্মিকভাবে অতর্কিতে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছিল শরতের মুখ দিয়ে - শুধু ওর চেতনার ওপর সেই কথাগুলোর এবং স্বরের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেই স্মৃতিটুকুই এক অপূর্ব মাধুর্যের ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে রেখেছে উমার মনের মধ্যে। মরুভূমির মধ্যে যে তৃষ্ণার্ত পথিক পথ হারিয়েছে সে পয়ঃপ্রণালীর জল পঙ্কিল কিনা বিচার করে না। উমা জীবনে স্বামীর ভালবাসা কি সে স্বাদ পায় নি—অপরের মুখে তার একটা ঝাপ্‌সা আভাস পেয়েছে মাত্র—তবু তৃষ্ণা যে সহজাত,—তৃষ্ণার উগ্রতা ত কিছুমাত্র কম নেই তার জন্য! ঐ সামান্য গলা ভার হয়ে আসা, ঐ সামান্য কাঁপনটুকুকেই তাই ওর অন্তরের সমস্ত তৃষ্ণা আঁকড়ে ধরেছে। গাঢ় অন্ধকারে আলোকরেখাকে অনেক সময় মানুষ সত্যি সত্যিই হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়, দৈহিক স্পর্শ করতে চায়—ক্ষণকাল পূর্বের একটি কণ্ঠস্বরকেও তেমনি উমা শুধু সমস্ত মন দিয়ে নয়—বিভ্রান্ত বিমূঢ় অবস্থায় যেন মধ্যে মধ্যে হাত বাড়িয়েও ধরবার চেষ্টা করছিল।...

অবশেষে একসময় দূরে টেগোর ক্যাসেলের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে তিনটে বেজে যেতে উমা যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে দোর খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। রাত-বিরেতে একা সোমথ মেয়ের ছাদে বেরনো নিষেধ ছিল, কমলা বার বার ব'লে রেখেছিল বাইরে বেরোতে হলে যেন ডেকে বেরোয়। কিন্তু আজ যেমন কমলাকে ডাকাও সম্ভব নয়, তেমনি ঘরের এই ক্ষীণ সেজ্-এর আলোতে চুপ ক'রে বিছানায় বসে থাকাও অসম্ভব। কি বলবে কমলাকে, অসময়ে ডাকার কি কৈফিয়ত দেবে? তার চেয়ে ভরসা ক'রে একা বেরিয়ে পড়া ঢের সহজ। কি আর হবে, চোর ডাকাত কি আর রোজই সব সময় ওৎ পেতে বসে আছে বাইরে? তাছাড়া মনের এ অবস্থায় কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা কি কণ্ঠস্বর সে শুনতে প্রস্তুত নয়। কি এক অপূর্ব অনাহত সঙ্গীত যেন মনের তন্ত্রীতে বেজে চলেছে, সেদিকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই

দিয়ে কান পেতে আছে সে—অন্য কোন পরিচিত কণ্ঠস্বরের আঘাত লাগলেই যেন সে তন্ত্রী ছিঁড়ে যাবে—সে সুর কেটে যাবে!

ছাদের ঠাণ্ডা বাতাসে তার রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট দেহ জুড়িয়ে গেল। ওর মুখে চোখে যেন কে একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দিলে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ নতুন বাজারের আড়ালে তখনও ঢলে পড়ে নি কিন্তু তার আলোও বিশেষ নেই। তা না থাক, অন্ধকারও তেমন জমাট নয়—রাস্তায় আলোর দুটো তিনটে রেখা যে পড়েছে বোসেদের তিনতলা বাড়ির দেওয়ালে, তারই আভায় বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ছাদটা।

উমা এগিয়ে এসে আলসেয় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

নিস্তব্ধতা ও শান্তি! বিরাট শহর ঘুমোচ্ছে। নিজের মনের দিকে কান পেতে থাকার অপূর্ব অবসর।

মল্লিকদের বাড়িতে কুক সর্দার হাঁক দিয়ে যাচ্ছে একটানা ভয়াবহ একটা আওয়াজ ক'রে—ওদের চিড়িয়াখানার সারস দুটোও শেষ প্রহর ঘোষণা ক'রে ডেকে উঠল বিশ্রী কর্কশ কণ্ঠে। আগে আগে এসব আওয়াজে ভয় করত উমার। বিশেষত ঐ কুক সর্দারের একটানা গম্ভীর ডাকে—কিন্তু আজকাল আর করে না। এমন কি আজ সে শব্দে ওর চিন্তারও ব্যাঘাত হ'ল না। তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে একমনে উপভোগ করতে লাগল ওর নবলব্ধ অভিজ্ঞতার অপরূপ অভিনবত্ব। নিশীথ রাত্রির শান্ত নীরবতা ও স্নিগ্ধ অন্ধকার ওর সে জাগ্রত স্বপ্নের বরং যেন সহায়তাই করল খানিকটা।

সকালে উঠে উমার আরক্ত চোখের দিক চেয়ে কমলা বিস্মিত হ'ল না। হতভাগিনীর মনের অবস্থা সে বোঝে বৈকি। রাতে ঘুম না হওয়াই ত স্বাভাবিক। বিধবা হবার পর কত রাত সে নিজেও ত চোখে-পাতায় করতে পারে নি। তাই সে প্রশ্নও করলে না।

কিন্তু সে সত্যিই বিস্মিত হ'ল আর একটু পরে। উমির হ'ল কি! ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! লক্ষ্য করতে করতে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল কমলা!

উমা বরাবরই ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। ওর মধ্যে কোন চপলতা কখনও লক্ষ্য করে নি কমলা। কিন্তু আজ ও অকস্মাৎ এমন লঘু হয়ে উঠল কেন?

সিঁড়ি উঠছে সে লাফিয়ে লাফিয়ে, কাজ-কর্ম করছে অন্য দিনের অর্ধেক সময়ে—সে-কাজে যে অনেক ভুল ঘটছে তা বলাই বাহুল্য—আর সব চেয়ে

আশ্চর্য কথা, রান্নাঘরে কাজ করতে করতে—সেদিকে কেউ নেই ভেবে গুনগুন ক'রে কি একটা গানও গাইছে।

উদ্বিগ্ন হবারই কথা—বিশেষত এই দীর্ঘকাল যে দেখেছে উমাকে—তার পক্ষে এই একেবারে অস্বাভাবিক আচরণে! কিন্তু একটু পরেই মনের মধ্যে দুই আর দুইয়ে চার মিলিয়ে পেয়ে কমলার মুখ সকৌতুক স্মিতহাস্যে সহজ হয়ে আসে। কাল বোন এবং ভগ্নীপতির মধ্যে কি কথা হয়েছে সে জানে না। স্বাভাবিক সঙ্কোচে সে প্রশ্নও করে নি। কি দরবার ব্যথার স্থানে ঘা দিয়ে? তবে একটা কি কথা হয়েছে ওদের মধ্যে এটা ঠিক, যার ফলে উমার অমন স্তম্ভিত ভাব, অপলক দৃষ্টি কাল সে দেখেছে। ভেবেছিল আরও দুঃখের, আরও বেদনা-দায়ক কিছু ঘটেছে—শরতের মধ্যে আরও বেশি হতাশার আভাসই পেয়েছে উমা।

আজ প্রথম মনে হ'ল যে তা হয়ত নয়। হয়ত বা শরৎ তার ব্যবহারে একটু সহানুভূতি বা একটু স্নেহের ভাবই দেখিয়েছে। হয়ত বা—

আজও প্রশ্ন করতে সঙ্কোচে বাধল কিন্তু আড়ে আড়ে যতই লক্ষ্য করলে কমলা ততই তার এই বিশ্বাসই দৃঢ় হ'ল। মনের মধ্যে দক্ষিণা বাতাস বয়েছে ওর—তাই বাইরে ওর এই লঘু চপলতা। কোন্ বসন্তের স্পর্শ লাগল তা অনুমান করাও ত শক্ত নয়!

উমা আজ টেনে টেনে অনেক কাজ করল। বেশি ও বাড়তি কাজ। সর-ময়দা নিয়ে মাখাতে বসল কমলাকে। কোন নিষেধই শুনল না। বললে, 'বিধবা হয়েছ ব'লে কি গায়ের ময়লা জমিয়ে রাখতে হবে নাকি?' গোবিন্দকে অকারণ আদর করতে লাগল যখন-তখন। কথায় কথায় হাসিতে ফেটে পড়তে লাগল। ওর পক্ষে এটা এতই অস্বাভাবিক যে বুড়ী ঝিটা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে কমলার দিকে চাইতে লাগল বার বার। তার দৃষ্টিতে নীরব প্রশ্ন—ব্যাপার কি?

ফলে কমলাও খুশী রইল সারাদিন।

কিন্তু সেদিন আরও অঘটন ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যের দিকে একটি ঝি-গোছের স্ত্রীলোক কড়া নেড়ে ফরসা ন্যাকড়ায় জড়ানো একটু পুলিন্দা দিয়ে বলে গেল, 'আমাদের বাবু—শরৎবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন বৌদির জন্যে—তেনার দিদির হাতে দিতে বলেছেন।'

ওদের ঝি গিরিবালা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল লাফাতে লাফাতে। কথাটা এতই অবিশ্বাস্য যে বুঝতে কমলার বেশ খানিকটা সময় লাগল। তারপর যখন সত্যিই শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল তখন সে ব্যাকুল হয়ে বললে, 'ওরে তাকে ডাক ডাক—

সবটা শুনি। ওকৈ একটু জল খাওয়াতে হবে যে, কিছু পয়সা—'

কিন্তু ততক্ষণে সে মানুষটি উধাও হয়েছে। বোধ হয় সেই রকমই নির্দেশ ছিল শরতের। কমলা বিলাপ করতে লাগল, ওদের ঝি গিরিও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, 'আমি ত তাকে চলে যেতে বলি নি বড়দি, দাঁড়াতেই ত বন্নু। বন্নু যে, এখানে তুমি খাড়া থাকো, আমি বড়দিকে খবরটা দিয়ে আসতিছি—তা সেই বা কেমনতরো মানুষ, বলা নেই কওয়া নেই—যার জিনিস তার হাতে পঁওছাল কি না তার খবর নেই—অমনি ছুট ক'রে হাওয়া?'

কমলা ওপরের ন্যাকড়াটা খুলতেই দেখলে একজোড়া কালোপাড় ভাল ফরাস-ডাঙার শাড়ি। খেলো হাটুরে কাপড় নয়—বেশ দামী শাড়ি। অন্তত ছ-সাত টাকা জোড়া হবে। শরৎ পাঠিয়েছে তার স্ত্রীর জন্য। আনন্দে চোখ ছল-ছল করতে লাগল কমলার।

তখন উমা ছিল না, পড়াতে গিয়েছিল। পড়িয়ে সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরতে কমলা প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে খবরটা দিলে, 'উমি উমি, শরৎ জামাই তোর জন্যে একজোড়া কাপড় পাঠিয়েছে। বিলিতি কাপড় নয়, হেটো শাড়িও নয়—আসল ফরাসডাঙার বেশ দামী শাড়ি!'

'কে, কে পাঠিয়েছে?'

প্রায় আর্তনাদের মতই শোনায় উমার প্রশ্নটা।

'শরৎ জামাই। কে একটি মেয়েছেলে এসে দিয়ে গেল।'

আঘাত সয়েছিল উমা এতকাল অনায়াসেই। কিন্তু স্নেহের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত নিদর্শনে ওর মনে বহু বিপরীতমুখী ভাবের যে প্রতিক্রিয়া হ'ল—সেটা সইতে পারলে না। বিশেষত গতকাল সন্ধ্যা থেকে এই চব্বিশ ঘণ্টা ওর মনের ওপর দিয়ে একটা অবর্ণনীয় ঝড় বয়ে গেছে, তার ফলে ওর স্নায়ু হয়ে পড়েছে আরও অবসন্ন, আরও ক্লান্ত। এই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করার শক্তি আর তার নেই।

কী যেন একটা বলতে চেষ্টা করল উমা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হ'ল না, সামান্য একটা অস্ফুট শব্দ হ'ল মাত্র, ঠোঁট দুটো কাঁপল থরথর ক'রে—তারপরই দিদির বুকের ওপর ওর মূর্ছিত দেহটা এলিয়ে পড়ল।

তিন

কাশীতে আসার দিন পনরোর মধ্যেই রাসমণি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। এর আগে কখনও তিনি এদিকে আসেন নি, তাছাড়া বহুদিন ধরেই কলকাতার ঐ

সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে বিশেষ চারটে দেওয়ালে আটকে ছিলেন, কাজেই তাঁর উন্নতি দ্রুত হবারই কথা। তাছাড়া জল-হাওয়ার গুণ ত আছেই। ঘি-দুধ-আনাজ সবই সস্তা এবং সুস্বাদু। তার ওপর—গঙ্গা এবং বিশ্বনাথ। অনেক দিন পরে যেন মনটাও তাঁর হালকা আর সহজ হয়ে ওঠে।

একটু সুস্থ হয়ে ওঠার পর থেকেই রাসমণি পায়ে হেঁটে বিশ্বনাথ দর্শনে যেতে শুরু করলেন। আরও দিন পাঁচেক পরে বিকেলে রাণীভবানীর গোপাল-বাড়িতে কথকতা আর দশাশ্বমেধ ঘাটে রামায়ণ গান শোনা আরম্ভ হ'ল। এ এক নতুন জীবন। অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ আছে এতে। রাসমণি এত আনন্দ কল্পনা করেন নি বহুকাল। কলকাতার বাড়িতে যে দুটি-তিনটি প্রাণী আছে তাদের চিন্তা যেন সেই বাড়িতেই সীমাবদ্ধ আছে, এতদূরে এসে পৌঁছয় নি।

কিন্তু শ্যামা ছট্‌ফট করে। হেম আছে সেখানে পড়ে। কে তাকে রেঁধে খাওয়াচ্ছে? নরেন এল কিনা কে জানে! এসে যদি হেমকে মারধোর করে—সে দুশ্চিন্তা ত আছেই। দু-একটা যা ঘটিবাটি আছে তাও হয়ত বেচে খাবে সে। তাকে ব'লে আসাও হয় নি। হাজার হোক স্বামী ত! বহুদিন তার দেখা পায় নি—সে কথাটাও মনে আছে বৈকি। একবার যদি এসে ফিরে যায়—আবার হয়ত কত দিন আসবে না! বিচিত্র কারণে তার অভাববোধটাও মধ্যে মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে।

তাছাড়া--রাসমণি সম্বন্ধেও শ্যামা একটু হতাশ হয়েছে মনে মনে। সে কথা অস্বীকার ক'রে কোন লাভ নেই।

এই এক মাস সেবার সুযোগ, সহস্র অন্য প্রসঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে বার বার ঐ কথাটাই পেড়েছে শ্যামা। রাসমণির হাতে ঠিক কতটা আছে, কতখানি ভরসা করা যেতে পারে তাঁর ওপর! কিন্তু প্রতিবারেই ঐ এক উত্তর পেয়েছে, বেশী নেই, তলা চুঁয়ে এসেছে এবার। বড়জোর আর তিন-চার বছর। তারও বেশী যদি বাঁচেন ত সিন্দুকের বাসন বেচতে হবে হয়ত।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা। শোনে আর মনের মধ্যে একটা হিম-শীতল হতাশা অনুভব করে শ্যামা। রাসমণি মিছে কথা বিশেষ বলেন না তা সে জানে। টাকার কথায় এতকাল পরে মিছে বলবেন সেটা বিশ্বাস্য নয়। আর এই এত বার এত ভাবে জেরা ক'রে যখন একই উত্তর মিলছে, তখন সামান্য মাত্র সংশয়েরও অবকাশ কোথায়! পাকা মিথ্যেবাদীরাও এত জেরায় মিথ্যাকে জিইয়ে রাখতে পারে না।

অর্থাৎ আশা-ভরসা আর কোথাও বিশেষ রইল না। যা করতে হবে তাকেই

করতে হবে।

এই সত্যটাই যেমন একটু একটু ক'রে মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়, তেমনি এই প্রবাসের ওপর বিতৃষ্ণা বাড়ে। বাড়ি ফেরবার জন্য ছটফট করে সে।

ঠিক সতরো দিনের মাথাতেই কথাটা পাড়ে সে, 'মা, তাহ'লে ফেরার কথাটা কি ভাবছেন?'

রাসমণি যেন চমকে ওঠেন। ফেরার কথা এরই মধ্যে? তিনি যে একেবারেই না ফিরতে পারলে বাঁচেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাঘবের দিকে চান।

'এরই মধ্যে কি গো মেজদি! এই ত সবে দু হপ্তা হ'ল। শরীরটা মার সারুক একটু। এত তাড়াহুড়ো ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে এত পয়সা খরচ সব বরবাদ হয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে আবার পড়বেন। তার চেয়ে আর কটা দিন থাকো কাদায় গুন ফেলে।'

তারপর একটু থেমে বলেন, 'আর দুদিন পরেই নাকি রামনগরের বেগুন উঠবে, শুনেছি একোটা বেগুন সাত-আট সের পর্যন্ত ওজন হয় আর তেমনি নাকি মিষ্টি। এখানে আবার সের দরে বিক্কিরি হয়-- এক পয়সা সের। সে বেগুন না খেলে জীবনই বৃথা! বড় কপিও উঠবে শীগ্‌গিরি -- এলে কত কাণ্ড ক'রে, খেয়ে যাবে না?'

শ্যামা বেশ একটু বিঁধিয়েই জবাব দেয়, 'তোমার কি বলো না বামুনদাদা, তুমি দিব্যি পরের পয়সায় বসে বসে ভালমন্দ খাচ্ছ, তোমার কি আর যেতে মন সরবে? কিন্তু আমি যে ছেলেমেয়ে ছেড়ে এসেছি সেখানে। দুধের বালক একা পড়ে রয়েছে—দু-দুটো নিত্য-সেবা, তার ওপর পড়াশুনো—কী করছে কে জানে! যদি অসুখেই পড়ে?...এখানে ঐ এক ফোঁটা মেয়ে নিয়ে দিদিও হয়ত হয়রান হচ্ছে।

রাঘব ঘোষালের বয়স হয়েছে, তার ওপর এদের বহুকাল দেখছেন। তিনি চটলেন না, বরং বেশ প্রশান্ত মুখেই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ গো শ্যামা ঠাকরুন, তা সত্যি—পরের পয়সায় এসেছি, ভালমন্দ খাচ্ছি—এমন কি আর এ কাঠামোয় জুটবে আবার? সে লোভ ত আছেই। তা তোমারও ত সেই কথাই ভাই। পরের পয়সা না হলে তোমারই কি আর আসা হত? তাছাড়া এটাও ভেবে ত্যাখো—যার পয়সা আর যার জন্যে এত খরচা, তার দিকটাও ত দেখতে হবে। আর কটা দিন অন্তত না থাকলে এসে আর লাভ কি হ'ল এত কাণ্ড ক'রে?'

শ্যামা গুম্ খেয়ে যায়।

রাঘব ঘোষাল বলেন, 'মেয়ে তোমার ভালই আছে। এক যা ছেলে—তা ছেলের কথা যদি বলো, দুঃখীর ঘরে জন্মেছে, দুঃখ ত ভোগ করতেই হবে। এই

বয়সে ছেলে তোমার কী না করলে ! এই কি আর ওর খেটে খাবার বয়স ?'

শ্যামা সেদিন চুপ ক'রে গেলেও বেশীদিন চুপ ক'রে থাকে না, মধ্যে মধ্যেই তাগাদা—'মা, বাড়ি ফেরার কথা কি ভাবছেন ?'

রাসমণি শেষ পর্যন্ত উত্যক্ত হয়েই ওঠেন। কিন্তু তবু যেতেও মন সরে না। বহুদিন পরে একটু শান্তির মুখ দেখেছেন। নীল স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা—আর বিশ্বনাথ। জ্বালা জুড়োবার এই ত জায়গা। গঙ্গার জলে চোখের জল মিশে বিশ্বনাথের মাথায় পড়ে যখন, তখন সত্যিই প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

'এক মাসের ভাড়া দেওয়া আছে যখন, তখন এ কটা দিন অন্তত থেকে যাই। আর না হয় বেশী দিন ভাড়া না-ই দিলুম।'

অগত্যা শ্যামাকে বিরস বদনে চুপ ক'রে থাকতে হয়।

অবশেষে একদিন আঁধারে একটুখানি আলো দেখতে পায় শ্যামা।

রাঘব ঘোষালই একদিন খাওয়াদাওয়ার পর তামাক ধরাতে ধরাতে প্রশ্ন করেন, 'তোর মেজ মেয়েটাকে একটু লেখাপড়া শোখাবি না মেজদি ? বয়স কত হ'ল ? চার না পাঁচ ? নাকি ওকেও অমনি মুখ্যু ক'রে রেখে বিয়ে দিয়ে সেরে দিবি ?'

'লেখাপড়া কোথায় শেখাব বামুনদাদা ? ও বন-গাঁয়ে ওসব কথা কি কেউ শুনেছে ? এক ঘরে পড়াতে পারি—নিজে যতটুকু জানি, কিন্তু তাই বা সময় কোথায় বলো ?...দুঃখের পেছনে দড়ি দেব না ঐ করব ?'

'তা বটে !'

হঠাৎ শ্যামা বলে বসে, 'আচ্ছা, ঐন্দ্রিলা উমির কাছেই দিনকতক থাক না মা —ও ত কত পরের মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, নিজের বোনঝিকে একটু পড়াতে পারবে না ?'

রাসমণি চমকে ওঠেন।

'উমির কাছে ? ওর সময় কোথায় ? বারোটায় যায় সন্ধ্যেয় ফেরে।'

'সে ত আরও ভালো মা—ঐ সময় আপনি একা থাকেন তবু হাত-নুড়কুৎ একটু কাছে থাকতে পারে। মেয়ের আমার বয়স কম বটে—কিন্তু দুঃখীর ঘরের মেয়ে, শান্ত আছে—অন্তত বায়না নিয়ে কাঁদবে না। তাছাড়া কাজকর্মও কিছু কিছু শিখেছে—আদর দেবার মত ত আমার অবস্থা নয়। আমার কাছে দু বছর বয়স থেকেই খাটতে শেখে।'

রাসমণি তবু চুপ ক'রে থাকেন। নতুন ক'রে ঝঞ্ঝাটে জড়াতে যেন ইচ্ছা করে না। আবার ভাবেন, সত্যিই উমাটা বড় একা, তবু একটা ছোট ছেলেমেয়ে কাছে থাকলে তাকে নিয়েও দু দণ্ড কাটে।

'কী বলেন মা ?'

'তোমার বাছা সব তাইতে তাড়া।' একটু বিরক্ত হয়ে ওঠেন রাসমণি, 'ভেবে দেখি। গিয়ে উমাকে বলি। তার মতামত নিয়ে হবে ত। ঝুঁকি ত তারই।'

শ্যামা নিশ্চিন্ত হয়। উমাকে রাজী করানো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার হবে না। ঐন্দ্রিলা তার সুন্দরী মেয়ে—গর্ভের সেরা। কোনমতে আর তিনটে বছর কাটলেই বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে ফেলতে হবে। ততদিন এঁদের মায়া পড়ে যাবে। এঁরাই কি আর ফেলতে পারবেন! বিয়ের খরচটা যেমন ক'রেই হোক টানবেন।

মনে মনে হিসাব করতে বসে সে · আরও কি কি সুবিধা হবে।

এখানে থাকা তার ফলে ক্রমে বেশী অসহ্য হয়ে ওঠে।

কমলার চিঠি এসেছে কদিন আগে। তাতে নরেনের খবর আছে, আর আছে শরতের খবর। শরৎ নাকি একজোড়া কাপড় পাঠিয়েছে উমার জন্যে। হয়তো এতদিনে উমার দিকে মন টেনেছে।...তা যদি হয়—উমা যদি স্বামীর ঘর করতে চলে যায় কোন অদূর ভবিষ্যতে—তার নিজেরই ছেলে-পুলে হ'তে শুরু হয়—তখন কি আর ঐন্দ্রিলাকে দেখবে সে! না শরৎ ওকে নিয়ে যেতেই দেবে!...নিজের অজ্ঞাতসারেই শঙ্কিত হয়ে ওঠে শ্যামা। তারই কপাল, নইলে এতদিন পরে ঠিক এই সময়েই শরৎ—

না না—ছিঃ ছিঃ! এ কি কথা ভাবছে সে! একসময় চমক ভেঙে দারুণ লজ্জিত হয়ে পড়ে নিজের স্বার্থপরতার জন্যে। উমা সুখী হোক। তার জন্যে কিছু নয়। তার কপালে যা আছে তা আছেই। তা ছাড়া এখনই কিছু সব হয়ে যাচ্ছে না। শরতের ন্যাওটোপনা করতে করতেও কোন্ না দু-একটা মাস কাটবে। ততদিনে উমার ত মায়া পড়ে যাবেই—চাই কি মায়েরও পড়তে পারে।

নরেন এসেছিল! কোথায় গেল কে জানে! আবার কবে আসবে '...জানলা দিয়ে ওপারে রামনগরের দিগন্ত-প্রসারিত ধু-ধু মাঠের দিকে চেয়ে স্বামীর কথা ভাবে শ্যামা।

চার

উমাকে রাজী করানোটা যত সহজ হবে ভেবেছিল শ্যামা, কলকাতায় ফিরে তার কাছে প্রস্তাবটা করতে দেখা গেল—কাজটা মোটেই তত সহজ নয়। উমা প্রথমটা বুঝতে পারে নি, শ্যামার মুখের দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে ছিল। দ্বিতীয়বার কথাটা বুঝিয়ে বলতে সে একবার ঘাড় তুলে মার মুখের দিকে তাকাল। সে মুখ ভাবলেশহীন—জপের মালা হাতে তিনি স্থির শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন

জানলাটার দিকে—অর্থাৎ কোন দিকেই মেয়েকে প্রভাবিত করতে চান না।
সেদিক থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দিদির দিকেও তাকাল উমা, তারপর মাথা নিচু ক'রে আস্তে আস্তে বললে, 'তুমি আমাকে মাপ করো ভাই, সে আমি পারব না।'

শ্যামা আর যাই হোক এখন সাফ জবাব আশঙ্কা করে নি। সে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বোনের দিকে।

'পারবি না? সে কি? কেন? ভালই ত হ'ত থাকলে'—বেশ কিছু সময় নিয়ে আস্তে আস্তে থেমে থেমে—কতকটা যেন অসংলগ্নভাবেই প্রশ্ন করে শ্যামা।

'আমার ভালটা আমাকেই দেখতে দাও তোমরা। সে আর কারুর পক্ষেই কোন দিন দেখা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু কেন—তোর কি অসুবিধা হবে শুনি?' এতদিনেব সমস্ত জল্পনা-কল্পনা এই ভাবে হঠাৎ তাসের বাড়ির মত ভেঙে পড়বে! আশাভঙ্গের ক্ষোভে তীক্ষ্ণ শোনায় শ্যামার কণ্ঠস্বর।

উমা বোধ হয় একটু কঠিন জবাবই দিতে যাচ্ছিল, হয়ত বলতে যাচ্ছিল যে 'সুবিধাই বা কি হবে?' কিংবা হয়ত বলতে যাচ্ছিল, 'আমার সুবিধা-অসুবিধা আমি বুঝব, তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?' কিন্তু মুখ ফাঁক ক'রেও থেমে গেল সে। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে, 'কি দরকার, ভগবান যখন ও ঝঞ্ঝাট আমাকে দেন নি, তখন মিছিমিছি পরের হাঙ্গামায় জড়িয়ে কি হবে?'

'ও কি তোর পর?' কমলাও যেন একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে উমার এই রূঢ় প্রত্যাখ্যানে।

'নিজের সন্তান ত নয় দিদি। যত যত্নই করি সে ওরই সন্তান হয়ে থাকবে, তার ওপর আমার সত্যিকার অধিকার কোন কারণে কোনদিনই জন্মাবে না।'

'বেশ ত, তুই পুষ্যি নে ওকে।' শ্যামা সাগ্রহে বলে।

'তাতেও ঐ পুষ্যি শব্দটা লেগেই থাকবে চিরকাল। ওটা শুনলেই আমার ঘেন্না করে। না ছোড়দি, অশ্বত্থামার মত পিটুলি-গোলা খেয়ে দুধের স্বাদ আন্দাজ করার দরকার নেই আমার। সংসারের জন্যে ভগবান আমাকে পাঠান নি।'

এরপর সকলেই কিছুকাল চুপচাপ বসে থাকেন।

রাসমণির জপের মালা তেমনিই ঘোরে। তাঁর মুখ দেখে বোঝবার জো নেই তিনি কি চান।

খানিক পরে শ্যামা তার কৌশল বদলায়। ঈষৎ ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, 'আর কিছু নয়—লেখাপড়াটা একটু শিখত। মার কাছে থাকলে আদব-কায়দাগুলোও রপ্ত

হ'ত। সুন্দর মেয়ে, একটু লেখাপড়া শেখালে ভাল ঘরে পড়তে পারত—এই আর কি!'

কমলা এবার সোজাসুজি মাকে আক্রমণ করে, 'মা কি বলেন?'

রাসমণি শান্তভাবেই জবাব দেন, 'আমি কি বলব বাছা, আমার ত ও ধকল সহ্য করার শক্তি নেই যে আমি জোর ক'রে বলব রেখে যাও। যাকে করতে হবে সে নিজের সুবিধে-অসুবিধে বুঝবে—ওর মধ্যে আমার কথা বলা ঠিক নয়।'

কমলার মন ইতিমধ্যে গলেছে, সে একটু জেদ করার মতই বললে, 'কিন্তু মার কথাটাও তোর ভাবা উচিত উমি, তুই ত চার-পাঁচ ঘণ্টা বাইরে থাকিস্—সে সময় এত বড় বাড়িতে উনি একা থাকেন। ওঁর ত ঐ শরীর। তবু মেয়েটা কাছে থাকলে একটু মাথায় বাতাস করতে পারে, এক ঘটি জল গড়িয়ে দিতে পারে!'

উমা উঠে দাঁড়ায় একেবারে, 'তোমাদের সকলের যখন ইচ্ছে তখন আর আমার মত নিচ্ছ কেন! বেশ, থাক ও। কিন্তু দিদি, মা নিজেই কতদিন বলেছেন, পরের বাছা নাচাবে হাসাবে, কাঁদাবে না। শাসন করার অধিকার না থাকলে ছেলেমেয়ে মানুষ করা যায় না।'

শ্যামা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'শাসন তুই যা খুশি কর না। ওমা সে কি কথা—তুই ওকে কেটে দু'খানা ক'রে ফেললেও আমি কিছু বলব না।'

'তা হয় না ছোড়দি', দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জবাব দেয় উমা, 'সে তুমিও জানো, আমিও জানি। বাজে কথা বলে লাভ কি! যত যত্নই করি সে কথা কেউ মনে রাখবে না, সামান্য যদি শাসন করি সেই দুর্নাম চিরকাল থাকবে। পরের সন্তান মানুষ করার ঐটুকু পুরস্কার! মা ত সামনেই বসে আছেন—ওঁরই মুখে এসব আমার শোনা। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করো না।'

সে আর দাঁড়ায় না, ঘর থেকে বেরিয়ে যায় একেবারে।

এর পর হয়ত মেয়েকে নিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল শ্যামার কিন্তু এতদিনের দারিদ্র্য তাকে যে সব মহৎ শিক্ষা দিয়েছে তার মধ্যে এইটি প্রধান: স্বার্থসিদ্ধি যেখানে উদ্দেশ্য—সেখানে চক্ষুলজ্জা করার কোন অবসর নেই। সে উমার সমস্ত খোঁচা নীরবে হজম ক'রে ঐন্দ্রিলাকে এখানেই রেখে গেল।

পাঁচ

একটানা দারিদ্র্যের মধ্যে শ্যামার দিন তেমনি একঘেয়ে ভাবেই কাটে। তেমনি প্রতিদিনের যুদ্ধ। পরের দিনের কথা ভেবে প্রায় প্রতি রাত্রেই তেমনি দুশ্চিন্তায়

কণ্টকিত থাকা।

হেম পড়াশুনো করে—নিয়মিত পুরুতগিরি করলে তার ইস্কুলে কামাই হয় অর্ধেক দিন। তাছাড়া সে ছেলেমানুষ, দশকর্মের কাজে অর্থাৎ বিয়ে-পৈতেতে তার ডাক পড়ে না। দুটো নিত্য সেবা আর লক্ষ্মীপুজো—ভরসা ত এই। ষষ্ঠীপুজো মনসাপুজোতেও ইদানীং ডাকছে কেউ কেউ। হয়ত আর দু-এক বছর গেলে সরস্বতী পুজোতেও ডাকবে। কিন্তু সে দূরের কথা। খন্দ লক্ষ্মীপুজো কি মনসা-পুজোতে কেউ কাপড় দেয় না। ষষ্ঠীপুজোতেও তাই—বড়জোর দেড়হাতি লাল গামছা। শুধু নৈবিদ্যির চাল, কাটা ফল, বাতাসা এই ত পাওনা। আর চার পয়সা, বড়জোর দুআনা দক্ষিণে। তাও পৌষ ভাদ্র চৈত্র—এ ছাড়া নয়। ষষ্ঠীপুজোটাই নিয়মিত ছাড়া আকস্মিকও হয় ছেলেপুলে হ'লে, তবে তাতে হেমকে কেউ ডাকে না। লক্ষ্মীপুজো মনসাপুজোটাই ভদ্রপাড়ায় প্রায় ঘর-ঘর হয়, এবং সেই সময়ই পড়ে পুরুতের টানাটানি।

সুতরাং দীর্ঘকালব্যাপী টানা উপবাসগুলো বন্ধ হয়েছে মাত্র, আর কিছুই হয় নি। উঞ্ছবৃত্তি তেমনিই চলেছে। তেমনি পাতা কুড়োনো, ফল চুরি। পিঁটকী প্রকাশ্যেই বলে, 'বাব্‌বা, বামুনদিদি এক মাস ছিল না—বাগানের দুটো ফলের মুখ দেখেছিলুম। আবার তোমার কাশী যাওয়ার দরকার হয় না—হ্যাঁ, বামুনদি?'

এসব কথায় কান দিতে গেলে চলে না—স্মিত-প্রসন্ন মুখে ও সপ্রতিভ ভাবেই 'তাই ত? তা আর নয়!' বলে, আর কথাটা পিঁটকীর তরফে নিছক ঠাট্টা এই ভাবে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

এর ভেতর আর একটি সন্তানও হয়েছে শ্যামার। সেই সময়টা কয়েকবার ঘন ঘন এসেছিল নরেন—মঙ্গলা ঠাকরুণ বলেন, ফল-টানে। কারণ শ্যামা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সংবাদটা শুনেই সেই যে সে অন্তর্হিত হয়েছে আর আসে নি। শুধু তাই নয়, বাসন-কোসন বেচেও হয়ত আঁতুড়টা তোলা যেত—কিন্তু সে উপায়ও রেখে যায় নি। শেষবার যাবার সময়—যা দু-একটা দানে বা সামাজিকে পাওয়া পেতলের বাসন ছিল—সমস্ত নিঃশেষ ক'রে নিয়ে গেছে! কতকগুলো পুরনো বাসন শিবপুর বাজারে ঝালাতে দেবার নাম ক'রে আগের দিন সরিয়েছিল, বাকী অর্ধেক অর্থাৎ নতুনগুলো শ্যামার স্নানে ও হেমের নিত্যসেবায় বেরিয়ে যাওয়ার অবসরে কখন নিয়ে সরে পড়েছে তা কেউই টের পায় নি। সে যে এই সামান্য পেতলের বাসন চুরি করবে, তা শ্যামা কল্পনাও করে নি, নইলে হয়ত সাবধান হ'ত।

তাও—সবই যে গেছে, এতটা বুঝতে পারে নি। কিন্তু মঙ্গলা এসব ব্যাপারে পাকা মানুষ, তিনি চোখের পলকে সবটা অনুমান ক'রে নিলেন, 'অ বামুনি, তোর

সেদিনের ফুটো বাসনগুলোর ঐ এক দুগ্‌গতি হয়েছে দেখ্‌গে যা। একদিনে অত হাড়ি কলসী সরাতে পারবে না ব'লেই সেদিন ঐসব কথা ব'লে অদ্ধেক সরিয়েছে। ফন্দিটা কেমন খেলেছে! মিন্‌সে কম ফন্দবাজ! তা নইলে যে মানুষ সংসারের কুটি ভেঙে দুখানা করে না, সে এখান থেকে দেড়কোশ দুকোশ রাস্তা ভেঙে শিবপুর যাবে তোর ফাটা বাসন ঘাড়ে ক'রে সারাতে! ক্ষেপেছিস তুই!'

কথাটা ঠিকই। এখন সেটা শ্যামাও বুঝতে পারে। তখনই কথাটা বিশ্বাস করা বাতুলতা হয়েছে। এত গরজ নরেনের হবে সংসারের জন্যে যে ভাঙা ফুটো বাসন ঘাড়ে ক'রে যাবে শিবপুরের বাজারে। অথচ সেদিন যখন সে প্রস্তাবটা করেছিল তখন একটুও অসম্ভব শোনায় নি কথাটা, 'কবে রাং-ঝাল-ও'লা দয়া ক'রে আসবে সেই ভরসায় বসে থাকবি? তাছাড়া ও বেটারা ত গলাকাটা! দে বরং শিবপুরের বাজার থেকেই সারিয়ে আনি। কতক্ষণ আর লাগবে—যাবো আর আসবো।'

পয়সা বেশি চায় নি, 'গণ্ডা চার পসয়া দে এখন। বাকিটা পৈতে দেখিয়ে সেরে নেব।'

'পৈতে দেখিয়ে মানে—?'

'বেশি পয়সা চাইলে প্রথমটা বলব বামুনের ছেলের কাছ থেকে বেশি নিস নি বাবা, যা দিচ্ছি তাই নে। তাতে যদি না শোনে ত পৈতে ছিঁড়ে শাপ দেবার ভয় দেখাবো। তারপর পয়সা চাইবে এমন কার বুকের পাটা আছে ও বাজারে তাই শুনি! হিন্দু ত হিন্দু—পৈতে ছিঁড়ে মন্যি দেবে শুনলে মুসলমানরা সুদ্ধ ভয় পাবে!'

হা-হা ক'রে হেসেছিল নরেন—নিজের চতুরতায়।

শ্যামা আজও স্বামীকে বিশ্বাস করে, আশ্চর্য! বিশ্বাস ক'রেই চার আনা পয়সা খুঁজে-পেতে বার ক'রে দিয়েছিল। বড় ঘড়াটার জন্যে সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছিল—একেবারে একঘড়া জল আনলে নিশ্চিন্ত! নইল ছোট ঘড়ায় বার বাব জল আনতে কষ্ট হয়। যাওয়া-আসার মেহনত ত সমানই। একবারের কাজ তিনবারে করার সময়ই বা কৈ ওর!

এমন কি সন্ধ্যেবেলা যখন খালি হাতে ফিরে এল নরেন—তখনও এতটা সন্দেহ করে নি শ্যামা। ওকে ফিরে আসতে দেখেই সমস্ত সংশয় চলে গিয়েছিল মন থেকে। মুখেই বলেছিল, 'কৈ গো আমার বাসন কৈ? বেচে খেয়ে এলে নাকি?'

হা-হা ক'রে হেসেছিল নরেন তাতেও, 'বেড়ে বলেছিস ত! তোর ঐ ফুটো-ফাটা পেতলের বাসন গোচ্ছার—কে কিনবে তাই শুনি? কিনলেই বা ক পয়সা

হবে ? তা নয়, আজ যে শিবপুর বাজারে বারোয়ারী—আজ কাল কেউ হাপর জ্বালবে না পরশু সক্কালবেলা ক'রে রাখবে বলেছে - যখন হোক গিয়ে নিয়ে আসব।'

শ্যামা আশ্বস্ত হয়েছিল।

সত্যিই ত, ঐ ত কটা চাদরের ঘড়া আর হাঁড়ি—কীই বা তার দাম! আর বেচে দিলে ফিরে আসবেই বা কেন, তাহলে ত ঐখান থেকেই পালাত!

তাই—পরের দিনের চুরিটা যখন একটু একটু ক'রে ধরা পড়ল তখনও তার সঙ্গে আগের দিনের ঘটনার কোন যোগযোগ দেখতে পায় নি শ্যামা। এখন মঙ্গলার কথাতেই সবটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

'এখন আঁতুড় তুলবি না বাসন কিনবি, কী করবি কর্!' এই বলে আর এক এক দলা দোক্তা মুখ-গহ্বরে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে যান মঙ্গলা।

কিন্তু শ্যামা ঘুমোতে পারে না। চেয়েচিন্তে সামান্য হয়—পুরো খরচা ওঠে কি ক'রে?

অবশেষে মাকেই চিঠি লিখতে হয়েছিল। মা চিঠির উত্তর দেন নি, শুধু পাঁচটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আর কমলা বোধ হয় মার কাছ থেকে শুনেই—গোপনে আর দুটি টাকা পাঠিয়েছিল।

'আহা—দিদিটারও যদি অবস্থা ভাল থাকত!' মনে মনে আক্ষেপ করে তাই শ্যামা —'বলে,আঁটকুড়ো যে হয় তার পৌত্তুরটি আগে মরে! আমারও হয়েছে তাই, যে দয়া করতে পারত তার সর্বনাশ আগেই হয়ে ব'সে রইল। শুধু আমাকে দুঃখ দেবেন ব'লেই ভগবান এই কাণ্ড করলেন।'

জীবনে সমস্ত দিক যখন এমনি দিক্‌চিহ্নহীন নৈরাশ্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, ভবিষ্যতের কোন পথরেখা যখন কোন দিকে নেই, তখন অকস্মাৎ একটি সংবাদ শ্যামার কানে এসে পৌঁছল। ওর মনে হ'ল রাত্রির শেষ হয়েছে এবার, উষার স্বর্ণ-রেখা কুয়াশার ধূসর অনিশ্চিয়তাকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে উজ্জ্বল পথের ইঙ্গিত দেবে।

শোনা গেল বার-দুই থার্ড ক্লাসে ফেল করবার ফলে অম্বিকাপদর ইস্কুলে যাওয়ার পর্ব শেষ হয়েছে, জামাই অভয়পদ ভাইকে নিজের অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ অম্বিকাপদ এখন রোজগেরে অফিসার বাবু!

এই ত পথ, সামনেই প্রসারিত। যে পথের শেষে প্রাচুর্য এবং নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা।

অম্বিকাপদ অবশ্য হেমের চেয়ে তিন-চার বছরের বড়ই। কিন্তু তাতে কি, হেমও

ত ফোর্থ ক্লাসে পড়ছে। আর ক-টা মাস পরেই থার্ড ক্লাসে উঠবে। বিদ্যেতে ত এমন কোন তফাত নেই। অম্বিকাপদ যদি পারে সাহেবদের কাজ করতে হেম কেন পারবে না? হেম বরং বুদ্ধিমান আর চট্‌পটে ঢের বেশী—অম্বিকাপদর চেয়ে।

জামাইকে একদিন ডেকে পাঠায় শ্যামা হেমকে দিয়েই। আজকাল বড় একটা জামাইকে সে ডাকে না, কারণ—জামাই এলেই একটা কিছু হাতে ক'রে আসে। সব রকমের জিনিসই, কখনও বা একটা লণ্ঠন (অফিস থেকে সরানো), কখনও বা দুটো আনাজ, কখনও বা খানিকটা কেরোসিন তেল। জিনিস যাই আসুক না কেন, সবটাই প্রয়োজনে লাগে—প্রয়োজন বুঝেই আনে জামাই—কিন্তু শ্যামার যেন কেমন লজ্জা করে। অভাব বুঝে জামাই সাহায্য করবে আর তাই হাত পেতে নিতে হবে, ছি! এখনও এটুকু আত্মসম্মানবোধ তার আছে।

জামাই এসে রান্নাঘরের দাওয়াতে পা ঝুলিয়ে বসল। হাতে একটা পুঁটুলি, তাতে দুটো নারকোল, খানিকটা ডেলা-পাকানো কেমন শক্ত গুড় (এ নাকি বড়বাজার অঞ্চলে পাওয়া যায়, আখের গুড়, গুড়ও ভালো—তবে একেবারে শুকনো ডেলা-পাকানো, এই যা। এ ওরা গোরুকে খেতে দেয়—এক পয়সা দু পয়সা সের) —তার সঙ্গে খানিকটা মোটা তার। হেমাকে উপলক্ষ ক'রে সংক্ষেপে শুধু বললে, 'তোমাদের কাপড় শুকুতে দেওয়ার অসুবিধে হয়—এই তার টাঙিয়ে দিয়ে যাবো বলে এনেছি—শোবার ঘরের জানলার সঙ্গে রান্নাঘরের চালের বাতায় দিব্যি টাঙানো যাবে।'

জামাইকে ডেকে পাঠিয়েছে—শ্যামা একটু জলখাবারের আয়োজনও ক'রে রেখেছিল; চারখানা চন্দ্রপুলি আর দুটো পাকা কলা জামাইয়ের সামনে দিয়ে একটু দূরে ঘোমটা টেনে বসল শ্যামা। এত বড় জামাইয়ের সঙ্গে মাথার কাপড় খুলে ভাল ক'রে কথা বলা যায় না, বড্ডই লজ্জা করে।

জামাই অভ্যাস-মত একটা কলা আর দুটো মিষ্টি খেয়ে বাকিটা সরিয়ে রাখলে। যাই কেন দাও না - অর্ধেকের বেশী সে খায় না। সেইটে হিসেব ক'রেই বেশী দিতে হয়।

অদ্ভুত মানুষটি। আজও যেন শ্যামা জামাইকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অমন রূপ—কখনও মাথা আঁচড়ায় না, কখনও দাড়ি কামায় না। গায়ে সেই এক জিনের কোট—হপ্তা অন্তর নিজে ক্ষারে কেচে নেয়। দশহাতি কাপড় পরলেও সর্বদা হাঁটুর ওপর গোটানো থাকে। বিয়ের পর দু-এক মাস অপেক্ষাকৃত একটু ভদ্র ভাবে আসা-যাওয়া করেছিল—তারপর থেকেই এই—এক বেশভূষা!

জলখাবার শেষ ক'রে অভয়পদ বার-দুই কেসে গলাটা সাফ ক'রে নিলে।

'আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মা?'

ঘোমটার মধ্যে থেকে ফিসফিস ক'রে হলেও আজ ছেলেমেয়ে কাউকে উপলক্ষ না ধ'রে সোজাসুজিই জামাইয়ের সঙ্গে কথা বললে শ্যামা, 'বলছিলুম কি, আমাদের হেমের কোথাও একটা চাকরি-বাকরি হয় না? শুনলাম অম্বিকাপদকে কোথায় যেন ঢুকিয়ে দিয়েছ!'

একটু চুপ করে থেকে অভয় উত্তর দিলে, 'অম্বিকা ত যাহোক একটু লেখাপড়া শিখেছে তাই ত ওকে কেরানার চাকরিতেই ঢোকাতে পেরেছি। আমাদের এ কুলি-কামারীর কাজে আর জানাশোনা আপনার লোককে ঢোকাতে ইচ্ছা করে না।'

'কিন্তু বাবা', বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই বললে শ্যামা, 'হেমও ত কিছু কম লেখাপড়া শেখে নি। ও-ও ফোর্থ ক্লাসে পড়ছে—ক-মাস পরেই থার্ড ক্লাসে উঠবে। এই ত আমাদের অক্ষয়বাবু খুব ভাল কি একটা চাকরি করেন উনি ত শুনেছি আরও কম পড়েছেন। অমন নাকি হয়?'

'আগে হ'ত—এখন আর অত সহজে হয় না। একটু ইংরিজি না বুঝলে সাহেবরা নিতে চায় না। এখন একটা পাস-করা ছেলেই যে গণ্ডা-গণ্ডা।—হেমের কত বয়স হ'ল?'

'তা হ'ল বৈকি। চোদ্দ চলছে।'

'সেও এক ফ্যাসাদ। অত অল্পবয়সী ছেলেকে সাহেবেরা কেরানীর টুলে বসাতে চায় না। আচ্ছা দেখি কি করতে পারি!'

সেদিন কোন আশ্বাস দিতে না পারলেও হপ্তা-তিনেক পরেই একদিন অভয়পদ এসে হাজির হ'ল। 'বাবুর চাকরি কিছু খালি নেই—আর থাকলেও এতটুকু ছেলে, যে অফিসের কাজ কাকে বলে তাই জানে না, তাকে দিতে চাইছে না। একটা কাজ আছে 'রংকলে'—লেবেল আঁটার কাজ—মাত্র দশ টাকা মাইনে। দিতে চান ত দিতে পারেন। তবে একবার ঢুকে পড়লে চাই কি ওধারে কাজও শিখতে পারে—চোখকান খোলা রেখে অফিসের কাজ ব্যাপারটা কি যদি বুঝে নেয় ত, ওদিকেও চলে যাওয়া শক্ত হবে না। ওখানে আমার জানাশোনা লোক আছে, ভেতরে ঢুকলে একটা হিল্লে হতে পারবে। কী বলেন?'

একটু ক্ষুন্নই হ'ল শ্যামা। নিজের ভাইয়ের বেলা অফিসের কাজ ঠিকই পাওয়া গেল। বিদ্যে ত সমানই, বয়সে একটু বড় এই যা। তার জন্যেই ওর ছেলের

আর অফিসের চাকরি জুটল না? এসব ব্যাপারে শ্যামা অপর স্ত্রীলোকদের মত স্বাভাবিক ভাবেই অবুঝ। সে এমনও ভাবলে, তার ভাই যে হেমের চেয়ে এক 'কেলাস' অন্তত উঁচুতে পড়ত সেইটে বোঝাবার জন্যেই জামাই ইচ্ছে ক'রে ওকে অফিসের চাকরি দিলে না।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে শ্যামা বললে, 'সে জানি। ভাল চাকরি পাবার মত কি আর বরাত করে এসেছে ও! তুয়োর কড়ি হাটে যায়—কাপাস তুলো উড়ে যায়! লোকে ত যাচ্ছে আর চাকরি পাচ্ছে বাবা—আমার হেম কি আর পাবে? তাহলে আমার পেটে আসবে কেন?'

অভয়ের ভ্রূ দুটো একবার যেন নিমেষের জন্য কুঁচকে উঠল—কিন্তু সে সেই এক নিমেষই। শ্যামা তার আভাসও পেলে না।

সে-ও একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তবে এটা থাক। আর একটু বেয়েচেয়ে দেখি না হয়।'

শ্যামা যেন একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'না না বাবা—তুমি ও বৃথা চেষ্টা করো না। সে কপাল ওর নয়। শেষে এটাও যাবে। যা পেয়েছ তুমি এখন তাইতেই ঢুকিয়ে দাও। আমি যে এধারে আর টানতে পারছি না!'

অভয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলে না। শাশুড়ীর মন্দভাগ্যজনিত আক্ষেপের কোন গূঢ়ার্থ সে বুঝল কি না, তাও তার আচরণের কোথাও প্রকাশ পেল না। কোনদিন কারও অভিমানে বিচলিত হবার মত স্বভাব ভগবান তাকে দেন নি। সে তার স্বাভাবিক শান্তকণ্ঠে শুধু বললে, 'কাল সকাল সাড়ে ছটার মধ্যে খাইয়ে ওকে তৈরী করে রাখবেন, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।'

'সাড়ে ছটায় তৈরী থাকবে?—কিন্তু তাহলে নিত্য-সেবা?

'তার আগেই সেরে ফেলতে হবে। আটটায় হাজ্‌রে···পাকা দেড় ক্রোশ পথ—প্রথম দিন একটু আগে না গেলে চলবেও না। শুধু পৌছে দিলেই ত হবে না—কাজ শুরু হবার আগে সাহেবের সঙ্গে দেখা করাতে হবে। তাছাড়া আমার অফিস আছে—কাল বলে-কয়ে এক ঘণ্টা ছুটি করিয়ে এনেছি, নটার মধ্যে আমাকেও পৌছতে হবে।'

অভয়পদ আর দাঁড়াল না।

দেড় ক্রোশ পথ ভেঙে রোজ যাওয়া-আসা! আটটায় হাজ্‌রে—মোটে দশ টাকা মাইনে! মাত্র চোদ্দ বছরের ছেলে তার!

একবার মনটা কেমন করল শ্যামার। ভাবলে জামাইকে ডেকে বলে—দরকার নেই; কিন্তু পারলে না। আর পারে না সে—আর একা এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া

সম্ভব নয়।

মঙ্গলা শুনে বললেন, 'এ ত সুখবর লো বামনি। চাকরিতে একবার কোথাও ঢুকে পড়তে পারলেই হ'ল, যেমন-তেমন চাকরি দুধভাত। আজ দশ আছে, কুড়ি হতে কদ্দিন? এইবার তোর বরাত খুলল, আর কি দেখছিস? সওয়া পাঁচ আনা পুজো মানসিক ক'রে রাখ, আঁতুল সিদ্ধেশ্বরী-তলায় দিয়ে আসিস প্রথম মাসের মাইনে পেলে। আর আমাদেরও ঠাকুরের কিছু পুজো দিস—বলতে গেলে ওঁর সেবা ক'রেই তোর হেমের এই উন্নতি।'

নিশ্চয়ই দেবে। ওরই মধ্যে থেকে একটা টাকা সরিয়ে সে সত্যনারায়ণও দেবে। দেবে বৈ কি! ওঁদের দয়াতেই ত—

সারারাত সেদিন ঘুম হ'ল না শ্যামার। মন কত কি আশা করে—আবার আশঙ্কাও হয়, ওর যা কপাল, হয়ত কিছুই হবে না, কোন উন্নতিই হবে না হেমের। মনকে শাসন করে, অত স্বপ্ন দেখবার এখন থেকে দরকার নেই। ওর যা কপাল, পোড়া শোলমাছ ধুতে গেলেও পালিয়ে যাবে—শ্রীবৎস রাজার মত।

কিন্তু মন সে শাসন মানে না। এক সময় লক্ষ্য করে মন আবার কখন নিজেরই অজ্ঞাতে স্বর্ণ-স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তারও বাড়ি হবে, নিজস্ব বাড়ি—জমি বাগান পুকুর। কারও লাঞ্ছনা, কারও মুখনাড়া সইতে হবে না। নিজের বাড়িতে নিজের সংসারে নিজে সর্বময়ী কর্ত্রী। বৌ নাতি নাতনী—ভরপুর সংসার।

আবার যখন চমক ভাঙে, নিজেরই কল্পনার বহরে নিজে লজ্জিত হয়। কোথায় কি তার নেই—এখন থেকে অত আশা ভাল নয়। কী আছে তার অদৃষ্টে কে জানে!

এমনি আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে সারারাত বসে কেটে যায় ওর। চারটের ভোঁ কানে যেতেই উঠে পড়ে ধড়মড়িয়ে। ছেলের অফিসের ভাত চাই, এখুনি রাঁধতে বসতে হবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক

মহাশ্বেতা স্বামীকে প্রায়ই তাগাদা দেয়, 'মেজঠাকুরপোর বিয়ের কি করছ, হ্যাঁ গা?'

অভয়পদ নিদ্রালু অন্যমনস্কতার সঙ্গে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ—এই যে, এবার হবে।'

'রোজই ত বলো এবার হবে। কবে হবে? এই ত প্রায় বছর দেড়েক চাকরি করছে, আর কি? আমি যে আর পারি না। খেটে খেটে কি দশা হচ্ছে দ্যাখো দিকি!'

ও পক্ষ থেকে উত্তর আসে না। অভয়পদ ততক্ষণে গাঢ় ঘুমে অচেতন। প্রত্যহই এই রকম চলে। মহাশ্বেতার বিরক্তির অন্ত থাকে না, অথচ উপায়ই বা কি? দিনের বেলা টিকি দেখবার উপায় নেই লোকটার। অফিসে বেরোয় ত বলতে গেলে রাত থাকতে। শীতকালে সত্যিই রাত থাকে। একই অফিসে ত কাজ করে দু ভাই, কিন্তু হ'লে কি হবে—অম্বিকাপদ নাকি 'বাবু' তাই তার ন'টায় হাজ্‌রে আর অভয়পদ মিস্ত্রী তাই তার আটটায়। আবার অম্বিকাপদর আস্পদ্দা কত! বলে কি না, 'নেহাত কানে খারাপ শোনায় ব'লে বলি মিস্ত্রী, সাহেবরা ত কুলীই বলে! খাতায়-পত্তরে কুলীই লেখা আছে।' বাবু! আঠারো টাকা মাইনের বাবু! গা জ্বালা করে মহাশ্বেতার ওর বাবু-বাবু ভাব দেখলে। বাবুর ফরসা কামিজ চাই রোজ— আবার বলে চাদর নেব। যত জুলুম মহাশ্বেতার ওপরই ত—ক্ষার কেচে কেচে পাল্‌কা কন্‌কন্ করে, হাত তুলতে পারে না এক-একদিন। 'তাও ঐ এক বেয়াড়া মানুষ ছাখো না! উনস্থনি ইস্টিশান থেকে গাড়ি হয়েছে আজকাল—এই পোন্ কোশ (পৌনে এক ক্রোশ) রাস্তা হেঁটে রেলগাড়ি চেপে গেলেই হয় · যেমন মেজ্‌ঠাকুরপো যায়—তা যাবে না। ঐ এক জেদ। হেঁটে যাবেন। এই কটা পয়সা না বাঁচালে আর চলে না। তাও যেদিন সাহেবরা দয়া ক'রে গাড়ি থামিয়ে তুলে নেয় সেদিন বাঁচোয়া—নইলে পুরো চারটি কোশ পথ হেঁটে যাওয়া আর ফেরা!'

গজগজ করে মহাশ্বেতা আপন মনেই।

কিন্তু অভয়পদর কানে তা পৌঁছয় না। রাত থাকতে যায় আর রাত্রে ফেরে। ছুটি বলতে এক রবিবার, কিন্তু সেদিনও কি মানুষটাকে হাতের কাছে পাবার জো আছে ছাই! কোথা থেকে যে যত রাজ্যের বাজে বাজে কাজ খুঁজে বার করে! কোথায় হয়ত বনবাদাড় সাফ করছে, নয়ত দেখ গে কাঠকুটো পাতালতা কুড়িয়ে পাহাড় করছে—মাটি-কাটা, বাগান করা ত আছেই। আজকাল আবার মাথায় ঢুকেছে রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখে নিজের বাড়ি নিজেই করবে, সেইজন্যে ছুটি পেলেই কোথায় নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে।...তাহলে মহাশ্বেতা তার কথাগুলো শোনায় কখন?

এমনি দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে কথা কওয়ার হুকুম নেই যে গিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলবে। আড়ালে-আব্‌ডালে পেলেও না হয় চট্ ক'রে দু-একটা কথা কয়ে নিতে পারে। 'তা-ও পোড়ার মানুষ কি সেই পাত্তর?'

এক সময় রাত্রিতে! কিন্তু যত তাড়াতাড়িই করুক না কেন, অভয়পদর শুতে আসবার অন্তত দেড়টি ঘণ্টা পরে না হ'লে মহাশ্বেতার ছুটি মেলে না। ওরা দু'ভাই একসঙ্গেই প্রায় খেতে বসে, সে ত পাঁচ মিনিট—তারপর সেই পাতে বসবে কুঁচোরা

— ছোট দেওর আর ননদ। তারা ফেলে-ছড়িয়ে ঝগড়া ক'রে খাবে প্রায় আধঘণ্টা ধরে। তারপর খাবে মহাশ্বেতা। যত রাজ্যের পাতে-পড়েথাকা ভাত কুড়িয়ে জড়ো ক'রে খেতে হয় ওকে। ভাত ফেলার হুকুম নেই। এর ওপর পান্তাভাত খাওয়া আছে। শাশুড়ীর হুকুম, 'গেরস্তবাড়িতে মাপ মতো ভাত নিতে নেই মা। কে কখন আসে ভিখিরী অতিথ,—তা কি বলা যায়? দুপুরবেলা এসে দুটো ভাত পাবে না, সে ভারি লজ্জার কথা। একেবারে পেট মেপে চাল নেয় যারা—তাদের হ'ল গে ডেয়ো-ডোক্‌লার ঘরকন্না। ওতে গেরস্তর ইজ্জত থাকে না—লক্ষ্মীও থাকে না।...নাও না দু মুঠো ভাত বেশী, ফেলা ত যাবে না। না হয় জল দেওয়া থাকবে—তুমি আমি ত আছিই।'

অবশ্য ভিখিরী আসে প্রায়ই। আর এ বাড়ির এক অদ্ভুত নিয়ম, মুঠো ক'রে চাল দেওয়ার রেওয়াজ নেই—একেবারে পাত পেতে ভাত ঢেলে দিতে হবে তাদের সামনে। তারাও জেনে গেছে, যার যেদিন ভাত খাবার দরকার ঠিক দুপুরবেলা এসে হাজির হয়। যেদিন আসে কেউ সেদিনটাই বাঁচোয়া—নইলে সেই বাড়তি ভাতে জল দেওয়া থাকে, রাত্রে সেইগুলি খেতে হয় মহাশ্বেতাকে। অবশ্য বাড়তি থাকলে শাশুড়ীও খান, কিন্তু তিনি ত খান একবেলা, দুপুরবেলা মাত্র—তাতে আর কত ভাত খাবেন তিনি? তবে আউতি-জাউতিও আছে। পাড়াগাঁয়ে ভাত রাঁধার সময় হিসেব ক'রে কেউ কুটুমবাড়ি যায় না। উঠোনে ঢুকেই হাঁক দেয়, 'দাও গো—কাঠের উনুনটায় চারটি ভাতেভাত চড়িয়ে।' পাতা-লতা সব বাড়িতেই আছে, উনুনেরও অভাব নেই। কাউকে বিব্রত করা হবে একথা ভাবে না কেউ। আর সেইটেই রক্ষা—মহাশ্বেতার কাছে।

সে যাই হোক, পাতকুড়োনো পান্তা—যাই জুটুক, মহাশ্বেতার আজকাল গা সওয়া হয়ে গেছে—শুধু যদি একটু আগে ছুটি পেত! সবাইকার খাওয়া যখন শেষ হবে তখন শাশুড়ী হুকুম করবেন, 'আমাকে অম্‌নি মুঠো-খানেক মুড়ি দিও গো বৌমা।'

কিছুতেই আগে বলবেন না। কতদিন মহাশ্বেতা সেধে বলেছে—নিজে খেতে বসবার আগেই—'ও মা, আপনাকে খেতে দিই কিছু?'

'দাঁড়াও বাছা, খাবো কি না তাই এখনও বুঝতে পাচ্ছি না। পোড়ার পেটে কিছু না দিলে নয় তাই। মুখে কি কিছু যেতে চায়?'

অথচ প্রত্যহই খান তিনি। সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ ক'রে সেই যে থুম্ হয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসেন—একবারও নড়েন না। হাতে একটা জপের মালা থাকে ঠিকই কিন্তু ইষ্টনামের চেয়ে রসনায় সুখাদ্যের তালিকাই বেশি উচ্চারিত হ'তে

থাকে। তাঁর বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল, প্রথম বয়সে তিনি অনেক ভাল ভাল খাবার খেয়েছেন—সেই সব গল্প প্রত্যহই তাঁর করা চাই। এর ভেতর ছেলেরা এসে শেতল দেয়, একে একে খেতে বসে। তাদের সঙ্গে চলে গল্প, তারা করে তাদের অফিসের গল্প, উনি কিছু বোঝেন কিনা বোঝা না গেলেও—শোনেন খুব মন দিয়ে। কিন্তু তখনও উনি বুঝতে পারেন না, তাঁর রাত্রে কিছু খাবার দরকার হবে কি না।

একেবারে মহাশ্বেতার খাওয়া হয়ে গেলে তবে ফরমাশ হবে। তখন মুড়ি মেখে দিতে হবে তেল-নুন দিয়ে, তার সঙ্গে উঠোনের শসা থাকলে তা কুঁচিয়ে দিতে হবে—নইলে বসতে হবে নারকোল কুরতে। মুড়ি থাকে কম দিনই—যত রাজ্যের ক্ষুদ ভেজে রাখেন, ওরই মধ্যে বড় গোছের ক্ষুদ ভাজা তেল-নুন মেখে খাওয়া চলে, ছোটগুলো আবার গুঁড়িয়ে গুড় দিয়ে মেখে দিতে হয়। তা হোক—তাতে মহাশ্বেতার আপত্তি নেই। কিন্তু সে শুধু ভাবে—একটু আগে বললে কি হয়? এঁটো বাসন বড়ঘরের তক্তাপোশের নিচে জড়ো করা থাকে, সেখানে রেখে এসে রান্নাঘর ধুয়ে মুছে, পরের দিনের ভাত চড়াবার সব যোগাড় ক'রে রেখে মায় চাল পর্যন্ত ধুয়ে সব কাজ শেষ ক'রে সে এসে বসে শাশুড়ীর সামনে। তখনও চলে তাঁর মুড়ি খাওয়া কুড়ুর কুড়ুর ক'রে। তাও শুধু খেতে আর কত সময় লাগত? গল্পই বেশি। সেই তাঁর শৈশব ও কৈশোরের কাহিনী, তাঁর জগৎ যেখানে থেমে আছে চিরকালের মত।

'কলকাতা বৌমা, শুনতেই শহর। বলি ঐ ত শ্যামপুকুরে—ওখানে এখনও বাঘ বেরোয়!'

'কৈ, তেমন ত কখনও শুনি নি মা।'

'কে জানে বাছা কেন শোন নি, আমার আইবুড়ো বেলায় দু-দুটো বাঘ মারা হয়েছিল।'

'সে ত অনেক দিনের কথা মা।'

'এমন কি আর অনেকদিন বাছা, আমি কি আর আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী!' বিরক্ত কণ্ঠেই উত্তর দেন শাশুড়ী।

ভয়ে ভয়ে চুপ ক'রে যায় মহাশ্বেতা। হয়ত কোনদিন বলেন, 'ডাক বৌমা ঘোড়ার গাড়িতে যায়। ছ' কোশ সাত কোশ দূরে দূরে আস্তাবল আছে, তাকেই বলে ডাকখানা, সেইখানেই ঘোড়া বদল হয়, নতুন ঘোড়া জুড়ে আবার গাড়ি চলে। ওকে বলে ডাক বদল করা। ঐ ডাকখানাতেই চিঠি-পত্তর ওঠে নামে। বড় বড় লোক রাজা-মহারাজারাও অমনি ঘোড়ার ডাক বদল ক'রে দেশ-বিদেশে ঘোরে।'

তন্দ্রালু চোখ্ দুটি যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত ক'রে তাকিয়ে থাকে মহাশ্বেতা। হয়ত কোনদিন প্রতিবাদ ক'রে বলে, 'কিন্তু আমি ত শুনেছি মা ডাক এখন রেল-গাড়িতে যায়।'

দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন শাশুড়ী, 'আমি বাবার মুখে কতদিন এ গল্প শুনেছি! তিনি মিছে কথা বলতেন?'

'ওমা, সে অনেক দিন আগে বোধ হয়—তাই যেতো।'

'অ বৌমা—কি তোমার বুদ্ধি বাছা! সরকারী নিয়ম বুঝি ক্ষ্যাণে ক্ষ্যাণে বদলায়! তখন এক রকম যেতো আর এখন এক রকম যায়—তাই কি হয় মা? অমন কথা আর কাউকে বলো না, শুনলে লোকে হাসবে'

এই চলে বহু রাত্রি পর্যন্ত, কত রাত্রি তা জানে না মহাশ্বেতা—শুধু এইটুকু জানে যে শাশুড়ীর খাওয়া যখন শেষ হয়—তখন নিষুতি রাত থম্‌থম্ করে। পাড়া ঘরে জনপ্রাণীর সাড়া নেই, হয়ত কেউ জেগে থাকে কিন্তু তাদের অস্তিত্ব বোঝবার কোন উপায় নেই—না সাড়ায় না আলোয়। কেবল যেদিন টগরের বাবা মদ খেয়ে এসে চেঁচামেচি করে আর ওর মা কাঁদে—সেদিন যা পাড়া সরগরম থাকে। কিন্তু মাতাল শব্দটা শুনলেই চিরদিন মহাশ্বেতার হাত-পা পাথর হয়ে আসে ভয়ে—এখানে এই এত কাছে মাতলামির শব্দে বুকের মধ্যে গুরগুর করতে থাকে। তার চেয়ে মনে হয় ওর, অন্ধকার ঝিঁঝিঁ-ডাকা জোনাকি-জ্বলা নিস্তব্ধ রাত ঢের ভাল।

শাশুড়ীর খাওয়া হ'লে তাকে সব পেড়ে-ঝেড়ে রান্নাঘরে তালা দিয়ে গিয়ে নিয়ম মত শাশুড়ীর শয়নকক্ষে বসতে হয়। শাশুড়ী পিদিমের আলোয় হাতড়ে হাতড়ে পান সাজেন, ছেলেমেয়েরা কে কি ভাবে শুয়েছে দেখে তাদের সরিয়ে শোয়ান, তারপর বধূর দিকে ফিরে সস্নেহে বলেন, 'যাও বৌমা, তুমি শুয়ে পড় গে—আর রাত করছ কেন মা? ছেলেমানুষ ঢুলে ঢুলে পড়ছ। যাও—আমার এখন আর ত কিছু দরকার নেই।'

তবে ছুটি পায় মহাশ্বেতা। কিন্তু ততক্ষণে অভয়পদ অন্য এক রাজ্যে চলে যায়। তাকে বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। ভোরে যে বিছানা ছাড়ে সে, একেবারে রাত্রে শুতে যায়, এর ভিতর বিশ্রাম ব'লে কোন শব্দ ওর জানা নেই। শোওয়া ত দূরের কথা, বসতেই পায় না।

মহাশ্বেতার কিন্তু প্রতিদিনই এই সময়টায় রাগ ধরে। এক-একদিন দুঃখে কান্না আসে ওর। শাশুড়ীর মুণ্ডুপাত করে মনে মনে, 'রাক্ষুসী ডাইনি! পিণ্ডি গিলবে ঠিক জানে, তবু আগে গিলবে না!'

দড়াম্ ক'রে কপাট বন্ধ করে সে। ও ঘর থেকে শাশুড়ী প্রত্যহই বলেন, আস্তে,

বৌমা, আস্তে। ভয় পেলে নাকি?…অমন করলে কাঠের দোর আর ক'দিন টিকবে বাছা?' কিন্তু সেওঘর থেকেই—পরের দিন সকালে আর তাঁর মনে কিছু থাকে না। মহাশ্বেতাও তাই ভয় করে না। দুম্ দুম্ ক'রে চলে সে, অকারণে বাক্স-পেঁটরার আওয়াজ তোলে, তাতেও যখন অভয়ের ঘুম ভাঙে না, তখন বিছানায় শুয়ে পা টিপতে বসে।

এইবার একটু হয়ত চৈতন্য হয়। জড়িত কণ্ঠে বলে, 'কে ও? ও—বড় বৌ! এসো এসো, শুয়ে পড়ো। আমার পা-টিপতে হবে না—রাত ঢের হয়েছে।'

এইটুকু চেতনার অবকাশ নিয়েই মহাশ্বেতা দুটো একটা কথা বলতে যায়—নিতান্ত থাকতে পারে না তাই, কিন্তু একটু পরেই নিজের নির্বুদ্ধিতা নিজের কাছে ধরা পড়ে, তখন চুপ ক'রে যায়। যেদিন খুব রাগ হয় সেদিন অভয়ের কাঁধে এক ধাক্কা দেয়, 'আচ্ছা মানুষ বটে, শুলো তো আর সাড় নেই! এর চেয়ে পাথরের সঙ্গে ঘর করাও ভাল!'

তখন হয়ত চোখ মেলে চায়। দুটো-একটা কথাও বলে, একটু বা আদরও করে। সেইদিন হয়ত নিজের বক্তব্য শোনানোও যায়, সংক্ষেপে তার উত্তরও মেলে। তবে সে দৈবাৎ। বেশির ভাগ দিনই নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আপনমনে আপ্‌সায় সে। তারও পরিশ্রম কম হয় না সারাদিন, তবু যেন ঘুম আসতে চায় না সহজে। অন্তরের ক্ষোভ-রোষ-অভিমান আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি ব্যর্থ রাত্রির বেদনায় তাকে উত্তেজিত ও উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলে। কেবল যখন নিশীথ রাত্রের স্তব্ধতার মধ্যে বিনা বাতাসেই বাঁশঝাড়ের মধ্যে পাকা বাঁশের গা-নাড়বার শব্দ ওঠে কট্‌কট্ ক'রে, তখন ভয় পেয়ে শিউরে উঠে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার দেহের খাঁজে মুখটা চেপে ধরে। দেখতে দেখতে দু'চোখে তন্দ্রাও নেমে আসতে তখন দেরি হয় না। স্বামীর দেহের সংস্পর্শে ও গন্ধে—সমস্ত বেদনা-অভিমান ধুয়ে-মুছে গিয়ে আশা ও আশ্বাসে ওর নবীন বয়সের কোরক-প্রাণ যেন নতুন ক'রে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

এমনিই একদিন দুর্লভ মুহূর্তে, অভয়পদর পূর্ণ চেতনার অবকাশে উত্তর মিলল মহাশ্বেতার প্রশ্নের, 'দাঁড়াও আর একটা ঘর করি—নইলে খোকা শোবে কোথায়?'

ভাইকে এখনও অভয় মধ্যে মধ্যে খোকা বলে ডাকে।

উৎসাহের দীপশিখা যেন এক ফুঁয়ে নিভে যায় মহাশ্বেতার, 'ওমা—ঘর করবে, তবে বিয়ে দেবে মেজ্‌ঠাকুরপোর! সে ত ঢের দেরি! তা'হলেই বিয়ে হয়েছে!'

'না, দেরি আর নেই। দ্যাখো না, শীগ্‌গিরই আরম্ভ করছি। খোকার টাকায় ত আমি হাত দিই না, ওটা ওর কাছেই জমছে। ঐতেই ঘরটা ক'রে নেব।'

মহাশ্বেতার অগাধ বিশ্বাস ওর স্বামীর ওপর, তবু সে একটু হতাশ হয়, আপন মনেই বলে, 'দূর! সে ঢের দেরি।'

সত্যিই কিন্তু লোকটা মাস-কতকের মধ্যেই আরম্ভ করলে। আর সবই কি অদ্ভুত মানুষটার! লোকে মিস্ত্রী ডাকে, যোগাড়ে ডাকে, বাড়ি করায়। অভয়পদ সে ধার দিয়েও গেল না। জন বা মজুর লাগল ওর দিন-কতক মাত্র, ভিত্‌ খোঁড়া এবং ভিতে খোয়া-পেটার জন্যে,—তাও রবিবার দেখেই করাতো, যাতে নিজেও তাদের সঙ্গে লাগতে পারে—তারপর যা কাজ, করত সম্পূর্ণ একা। অফিস থেকে ফিরেই পাঁচি-ধুতি একখানা পরে লাগত দেওয়াল গাঁথতে। মশলার তাগাড় ক'রে রাখত নিজেই, ইটও আগে থাকতে বয়ে এনে সাজিয়ে রাখত হাতের কাছে, তারপর লেগে যেত গাঁথুনির কাজে। শুধু মশলা ফুরোলে অম্বিকা খালি কড়াটা নিয়ে গিয়ে তাগাড় থেকে খানিকটা তুলে এনে দিত।

প্রথমটা মহাশ্বেতার হাসি পেয়েছিল, লোকটা কি পাগল! অবশ্য অনেক কিছু জানে মানুষটা, কিন্তু তাই বলে ঘর গাঁথবে মিস্ত্রীদের মত!

'হি-হি, তুমি যেন কি! মিছিমিছি পয়সা অপ্‌চ!'

খুব হেসেছিল সে।

কিন্তু তারপরই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখল দেওয়াল ত বেশ উঠছে একটু একটু ক'রে! যেমন অন্যদের বাড়িতে ওঠে প্রায় তেমনি!

একদিন কাজের ফাঁকেই স্বামীর কাছে গিয়ে ফিসফিস ক'রে বললে, 'হ্যাঁগো —এ ত ঠিক দ্যালের মতই দেখতে লাগছে!'

কর্ণিকটা একটু থামিয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে অভয়পদ মুচকি হেসে বলেছিল, 'তবে তুমি কি ভেবেছিলে ইটের গাঁথুনিটা বাঁশের বেড়ার মত হবে?'

অপ্রতিভ ভাবে মহাশ্বেতা উত্তর দিয়েছিল, 'না, তাই বলচি।'

অফিস থেকে 'না-ব'লে-আনা' ভারি ভারি কর্নিক, সাবল, কোদাল—কেমন অনায়াসেই না চলে ওর হাতে! অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মহাশ্বেতা। পিছন থেকে ঘোমটার আড়াল দিয়ে লক্ষ্য করে, সেই সব ভারি ভারি জিনিস চালানোর সময় ওর প্রশান্ত সুগৌর পিঠের পরিপুষ্ট পেশীগুলো কেমন ফুলে ফুলে উঠছে, আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সুন্দর কপালে ও গলায় ঘামগুলোও যেন কেমন ভাল দেখায়।

না, লোকটা সুন্দর দেখতে তাতে কোন সন্দেহই নেই! আপন মনেই স্বীকার করে মহাশ্বেতা। মাঝে মাঝে ভাবে দাড়িটা না থাকলে হয়ত আরও ভাল হ'ত—আবার এক এক সময় মনে হয় অত ফরসা রঙের সঙ্গে কালো কুচকুচে দাড়ি ভালই মানিয়েছে!

ঘুমন্ত স্বামীকে পিঠে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁ গা, গা-হাত-পা একটু টিপে দেব? যা খাটুনি—গা-গতরে ব্যথা হচ্ছে ত খুব?'

জড়িত কণ্ঠে অভয়পদ বলে, 'না না, তোমাকে আর এই এত রাত্তিরে গা টিপতে বসতে হবে না। তুমি শুয়ে পড়ো!'

কতকটা লজ্জায়, কতকটা ভয়ে ভয়ে পিছন থেকে খুব সন্তর্পণে আলতো ভাবে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে মহাশ্বেতা।

'ওর কাছে আমি কতটুকু! মাগো!'

শেষের দিকে দিন-কয়েকের জন্যে একটা মিস্ত্রীও ডাকতে হ'ল, জনও লাগল গোটা-দুই। কিন্তু ঘর সত্যিই এক সময় শেষ হয়ে গেল। পাড়ার লোকে বলাবলি করতে লাগল, 'এদের আবার বরাত ফিরল! যাই বলো বাপু, বৌটারও পয় আছে।'

কথাটা শুনে মহাশ্বেতার বুক ফুলে ওঠে গর্বে।

ঘরে যেদিন কলি ফেরানো পর্যন্ত শেষ হয়ে গেল, সেদিন মহাশ্বেতা এদিক-ওদিক দেখে টিপ্ ক'রে এক প্রণাম করে স্বামীকে।

'ও আবার কি?'

'না বাপু, তোমার ক্ষ্যামতা আছে।'

কিন্তু রাগও কম হয় না। শাশুড়ী নিজেই বললেন, 'এত করে খেটেখুটে ঘরটা করলি, ওটাতে তুই থাক। অম্বিকে বরং এই ছোট ঘরটায় শুক এখন—'

উনি বাবু উদারভাবে বললেন, 'না না—আমি বেশ আছি, অম্বিকেই শুক ও ঘরে। আমার কিছু দরকার নেই।'

'কেন রে বাপু, এত আদিখ্যেতার দরকার কি? বলি সন্ন্যিসী ত নই। আমিই ত বড়, আমারই ত আগে পাওনা—। যার বিচ্ছিরি হয়, তার সব বিচ্ছিরি!'

পুকুরঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে বোধ হয় নির্জন পুকুরে মাছগুলোকেই শোনায় সে।

আবার, এতদিন টাকা এনে শাশুড়ীর হাতেই দিত, ক-মাস থেকে আদর করে ভাইয়ের হাতে এনে দেওয়া হচ্ছে—'তুই-ই সংসার চালা। ওসব ঝঞ্ঝাটে আমি

থাকতে চাই না। তোর ত শেখা দরকার। মা আর কদিন এসব ঝামেলা পোয়াবে?'

'কেন? মার পরে ত আমিই বাড়ির গিন্নী, আমাকে দাও না?'

বলেও ছিল একদিন মুখ ফুটে। তার জবাব এল, 'তবেই হয়েছে! একে ছেলে-মানুষ, তায় লেখাপড়া জানো না, তুমি কি হিসেব রাখবে?'

সর্বাঙ্গ জ্বালা করে না কথাগুলো শুনলে? ওঁর মা-ই বড় লেখাপড়া জানেন! তিনি কি ক'রে এতকাল সংসার চালিয়ে এলেন?

কিন্তু রাগ করাও বৃথা। যাকে দরকারী কথাই শোনানো যায় না, তার সঙ্গে ঝগড়া করার ফুরসুত কোথা? তারপর এই ধরনের কথা বলতে গেলেই যে কুলুপ এঁটে মুখ বন্ধ করে, আর মাথা খুঁড়লেও মুখ খোলানো যায় না। যেন পাথরের মানুষ।

মনের জ্বালা ক্রমশ জুড়িয়ে যায় মহাশ্বেতার। কেবল সে ঐ নতুন ঘরখানার দিকে কিছুতেই ভাল ক'রে তাকাতে পারে না।

তিন

অম্বিকার বিয়ে ঠিক হ'ল ওদেরই এক বন্ধু দূর-সম্পর্কের ভাগ্নীর সঙ্গে। সম্পর্ক থাকলেও এত দূর যে তাতে বিয়ে আটকায় না। এখন ত নয়ই—তখনও আটকাত না।

এগারো-বছরের ফুটফুটে মেয়ে—নাম প্রমীলা। একশ এক টাকা নগদ, দানের বাসন আর চেলির জোড় এই পাওনা হ'ল ছেলের। উলুবেড়ে থেকে নেমে দেড় ক্রোশ গেলে তবে ওদের বাড়ি। অম্বিকা একটু গজগজ করলে আড়ালে, 'খুব বে হচ্ছে বাবা, শ্বশুরবাড়ি যেতে গেলে চালচিঁড়ে বেঁধে যেতে হবে! ঠ্যাঙের ওপর কাপড় তুলে আল্ ধরে আগে তিন কোশ হাঁটো—তবে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছবে! দাদাটা যেন কি—একটু যদি বুদ্ধি-বিবেচনা আছে!'

প্রায় মহাশ্বেতারই বয়সী কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী সাহস প্রমীলার। অত ছেলেবেলা থেকে আসার জন্যেই হোক আর বরাবরই একটু ভীরুপ্রকৃতির বলেই হোক, এখনও মহাশ্বেতা শাশুড়ীর সামনে ভরসা করে যেসব কথা বলতে পারে না, প্রমীলা তা বলে দেয় অনায়াসে। একটু ডানপিটেও আছে। বিয়ের কনে এসেই একদিন গাছে চড়েছিল। সাঁতার কাটতেও ওস্তাদ। জায়ের অকর্মণ্যতায় সে হেসেই খুন, 'ওমা দিদি, তুমি সাঁতার জানো না! এসো তোমাকে শিখিয়ে দিই,

না না—ভয় কি, আচ্ছা এই ঘড়াটা উপুড় করো—এই ত্থাখো, ভাসছে ত, এবার এর ওপর বুক দিয়ে হাত-পা ছেড়ে দাও। ভয় কি, আমি ত আছি!'

কিন্তু মহাশ্বেতা ভয়ে কাঁদো-কাঁদো, 'না ভাই, ও আমি পারব না। না-না, তোমার পায়ে পড়ি—আমার বড্ড ভয় করছে।'

হেসে চপল লঘু হাতে এক ঝলক জল ওর চোখে ছুঁড়ে মেরে প্রমীলা বলেছিল, 'আলগোছ-লতা একেবার! আচ্ছা থাক—আজ প্রথম দিনটা। তোমায় কিন্তু আমি সাঁতার শিখিয়ে তবে ছাড়বো। দেখে নিও।'

উৎসব-বাড়ির সমারোহ শেষ হয়ে আসতেই এ বাড়ির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যখন একটু একটু প্রকাশিত হল, তখন প্রমীলা গেল অবাক হয়ে!

'ও দিদি, এই পুঁইয়ের খাড়া দিয়ে ভাত ঠেলতে হবে তুবেলা? ওমা, এরা কি তরকারি-পাতি খায় না? মাছ কৈ?'

'তবেই হয়েছে! মাছ? একটু আনাজ পেলে বেঁচে যেতুম! এ বাড়ির ধারা ঐ। আনাজ যা, তা পুরুষের পাতে পড়ে, আমাদের বেলা ঢু-ঢু। ত্থাখো ত্থাখো—এই ত সবে শুরু, দিনকতক যাক—বুঝতে পারবে!'

বিজ্ঞের মত ঘাড় তুলিয়ে তুলিয়ে বলে মহাশ্বেতা।

'বয়ে গেছে! আমি এই দিয়ে খাচ্ছি! আমাকে তুমি তাই পেয়েছ কিনা? এসব আমি ঢিট ক'রে দিচ্ছি ত্থাখো না!'

পরের দিনই পুকুরে নাইতে নেমে প্রমীলা প্রস্তাব করলে, 'ও দিদি, গামছার ঐ খুঁটটা ধরো ত ভাল ক'রে!'

'কি হবে মেজ-বৌ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মহাশ্বেতা।

'মাছ ধরবো। দেখছ না কত মৌরলা মাছ ঝাঁক বেঁধে বেড়াচ্ছে?'

'ওমা, গামছা দিয়ে মাছ ধরবি! দূর, তাই কখনও হয়?'

'তুমি ত্থাখো না ধরতে পারি কি না। তুটো-চারটে ঠিক ধরব। ওদের ত গেলা শেষ হয়ে গেছে। বাকী তুমি আর আমি! তুটো-চারটে মাছ ধরতে পারলেই তুলে নিয়ে গিয়ে বাটি-চচ্চড়ি বসিয়ে দেব। নইলে কি না খেয়ে মরব নাকি? তোমার মত ভাই আঙ্গুল ঠেলে ভাত খেতে আমি পারব না!'

সত্যি-সত্যিই বার-কতক চেষ্টা করতে করতে মুঠোখানেক মাছ ধরলে প্রমীলা। মাছগুলো কচুপাতায় মুড়ে পুকুরপাড়ে একটা ইঁট চাপা দিয়ে রেখে প্রমীলা নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান করতে নামে। তার স্নান করাও কম নয়—অন্তত পক্ষে বার-চারেক এপার ওপার। তুঃসাহসিনীর অসমসাহসিকতার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে মহাশ্বেতা আর ভেতরে ভেতরে ভয়ে শুকিয়ে ওঠে।

'বাটি ক'রে মাছ চাপাবে মেজ-বৌ, মা যদি কিছু বলেন!'

'ওমা—কী বলবেন? আচ্ছা, সে আমি দেখছি—'

বাড়িতে ঢুকে প্রমীলা নিজেই গিয়ে শাশুড়ীকে বললে, 'আজ গোটাকতক মাছ পেয়েছি মা গামছা-ছাঁকায়—সামান্যই। আর রান্নার হাঙ্গাম না ক'রে একটু বাটিচচ্চড়ি মত চাপিয়ে দিই!'

'দাও না মা।' শাশুড়ী বলতে বাধ্য হন, 'কি মাছ? মৌরলা? কটা মাছ? পারো ত দু-একটা বুড়ী দুগ্‌গার জন্যে রেখো—বিকেলে ভাতের সঙ্গে খাবে—'

মাছ বেছে বাটিচচ্চড়ি চড়াতে চড়াতে প্রমীলা বলে, 'এবার যখন ঘর করতে আসব একটা বঁড়শি আর হাত-কতক সুতো আনব, তাহ'লে আর মাছের দুঃখু থাকবে না।'

'ওমা, মেয়েছেলে হয়ে বঁড়শিতে মাছ ধরবি! লোকে কিছু বলবে না!'

'কী বলবে লোকে? বলার কি ধার ধারি? তাছাড়া দুপুরে দুপুরে ধরব—লোকে জানতে পারবে না। ছিপ হ'লে লোকে বুঝতে পারে। ক'হাত মাত্তর মুগা সুতো, দেখতে পেলে ত।'

·

মাস-কতক পরে যখন ঘর-বসত করতে এল প্রমীলা, তখন সত্যিই তার প্যাটরার তলায় দেখা গেল গোটা কতক বঁড়শি আর খানিকটা সুতো।

মহাশ্বেতা বাঁচল। অবশ্য সব দিন মাছ ধরবার সময় হয় না।—কিন্তু আরও অনেক কিছু জানে মেজ-বৌ। ঝিনুক গুগ্‌লি তোলে এক-একদিন, মাথার কাঁটা দিয়ে ভেতর থেকে মাংসটা বার ক'রে কচুপাতায় সংগ্রহ করে, তারপর চুপিচুপি একটা পিঁয়াজ কুঁচিয়ে নিয়ে চাপিয়ে দেয় উনুনে। প্রথম প্রথম মহাশ্বেতার ঘেন্না করত এসব খেতে—কিন্তু প্রমীলার পীড়াপীড়িতে খেতে হ'ল—সয়েও গেল ক্রমশ। পিঁয়াজ আগে আসত না এ বাড়িতে, সেটাও প্রমীলা তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া এখন ডাঁটার গায়ে একটু আনাজও লেগে থাকে—নইলে প্রমীলা কটকট ক'রে শাশুড়ীকে শুনিয়ে দেয়, 'ও ডাঁটা ক'গাছাই বা রাখেন কেন মা, আমরা বৌ বই ত নয়—আমরা শুধু-ভাতই বেশ খেতে পারব।'

শাশুড়ী অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'ওমা তা কেন—কাল থেকে আর একটু ক'রে আনাজপত্তর কুটে দিও বড় বৌমা, তোমার বাপু বড্ড দিষ্টিকিপ্পনতা।'

প্রমীলার কাছে আর একটি শিক্ষাও পেলে মহাশ্বেতা, এ সম্বন্ধে ওর কোন জ্ঞানই ছিল না এতদিন।

হঠাৎ একদিন পুকুরঘাটে গিয়ে ওর গলা জড়িয়ে প্রমীলা প্রশ্ন করলে, 'তোর কাছে দুটো টাকা হবে দিদি? তাহলে এই রাসের মেলায় একটা জিনিস কিনব!'

আকাশ থেকে পড়ে মহাশ্বেতা, 'টাকা! টাকা কোথায় পাবো ভাই?'

'আহা ঢং! বলে, "ন্যাকা ঢং হলসে কানা, জল ব'লে খায় চিনির পানা!" মেয়েমানুষের টাকা কোথা থেকে আসে?'

এবার বুঝতে পারে মহাশ্বেতা, 'হ্যাঁ, সেই মানুষই তোর ভাশুর কিনা! মাইনের পাই-পয়সাটি ত ফি-মাসে তোর বরের হাতেই তুলে দেয়, তুই জানিস না?'

'ওমা, সে ত গেল সংসার-খরচের টাকা! তা বলে দু'চার পয়সা তোর হাতে দেয় না?'

'এক পয়সাও না।'

'মিছে কথা।'

'এই তোকে ছুঁয়ে বলছি মেজ-বৌ। যা ব'লে দিব্যি করতে বলবি করব।'

খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে প্রমীলা। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে যায়।

'তুই ভাই একটা আকাট বোকা। সত্যি তোকে দেখলে মায়া হয়।'

'ওমা, তা আমি কি করব না দিলে—'

'ওরে হাঁদারাম, এমনি কি কেউ দেয়? আদায় করতে হয়। ঝগড়াঝাঁটি করবি, রাগারাগি করবি, তবে ত দেবে! দু'এক পয়সা মধ্যে মধ্যে না রাখলে তোর হাতে কি থাকবে? মানুষের জন্ম নিয়েছি, হ'লেই বা মেয়েমানুষ, আমাদের কি সাধ-আহ্লাদ কিছু নেই? সংসার খরচের টাকা থেকে জমিয়ে ওরা করে সাধ-আহ্লাদ মেটাবে—সেই ভরসাতে থাকবি তুই? তবেই হয়েছে!'

আবারও হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে প্রমীলা।

মহাশ্বেতা কাঠ হয়ে বসে থাকে। এ যেন এক নতুন জগৎ নতুন এক চেহারা নিয়ে ওর চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে একটু একটু ক'রে। একে দেখে ভয় করে!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

এক

ঐটুকু মেয়ে—কিন্তু বয়সের তুলনায় যেন ঢের বেশী পাকা। এরই মধ্যে ওর মতামত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। বালিকার দেহ থেকে কচি গলাতে যখন পাকা পাকা ভারী কথাগুলো বেরিয়ে আসে তখন রাসমণি স্বদ্ধ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। ওঁদের ঝি গিয়ে বলে, 'মাগো, ওর ওপর বোধ হয় কোন গিন্নীবান্নীর ভর হয়! কথা বলে দেখেছো—যেন তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! ওর যেন কোথাও গণ্ডা গণ্ডা ছেলেপিলে নাতি-নাতনী আছে, এমনিধারা কথাবাত্রা!'

প্রথম প্রথম ভাল লাগত সকলকারই—সেই যখন চার-পাঁচ বছরেরটি ছিল। এখন একটু বেশী এঁচোড়ে পাকা মনে হয় ঐন্দ্রিলাকে।

কালো রংটা দুচক্ষে দেখতে পারে না সে। যে গয়লা দুধ দেয় তার রং কালো ব'লে দুধ খেতে চাইত না আগে।

'মাগো, কি বিচ্ছিরি কালো! ঘামলে মনে হয় আলকাতরা গড়িয়ে পড়ছে!' বলেছিল তার সামনেই। উমা ত অপ্রস্তুত।

রাসমণি খুব বকে দিয়েছিলেন সেদিন, তার পর থেকে একটু সতর্ক হয়েছে এই মাত্র—কিন্তু রংটার ওপর থেকে বিদ্বেষ যায় নি। কালো মাছ খাবে না মেয়ে—কই, শোল, মাগুর, সিঙ্গি—কিচ্ছু না। যে তিজেলটাতে ওদের মাছ রান্না হয়, সেটা কাঠের জালে কালো হয়ে যায় ব'লে প্রায়ই খুঁতখুঁত করে—কিন্তু বেশী আপত্তি করতে সাহস করে না—শুধু রাসমণি যখন থাকেন না তখন উমাকে শোনায়, 'মাসিমা, তোমরা এখনও তিজেলে রাঁধো কেন? সে ত ঐ পাড়াগাঁয়ের লোকেরা রাঁধে, কয়লা পাওয়া যায় না ব'লে। তোমাদের ত কয়লার এলঢেল—তবু কাঠ পোড়াও কেন?'

কমলা যখন এখানে আসে—তখন মধ্যে মধ্যে মুখ টিপে হেসে বলে (অবশ্য অনুচ্চ কণ্ঠেই—রাসমণির সামনে বলা সম্ভব নয়), 'মুখপুড়ী, দেখিস্ ঠিক তোর একটা কালো বর হবে!'

ঐন্দ্রিলা তার পাতলা পাতলা দুটি রক্তিম ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'ঈস্! আমি তার সঙ্গে ঘর করলে ত! সেই দিনই তার কপালে মুড়ি খ্যাংরা মেরে চলে আসব না!'

'ওলো, তোর কপালেও খ্যাংরা পড়বে তাহ'লে!'

'কেন?'

'খেতে পরতে দেবে কে?'

'কেন—', তীক্ষ্ণকণ্ঠেই উত্তর দেয় ঐন্দ্রিলা, 'মাসিমার মত মেয়ে পড়িয়ে খাবো। মাসিমাকেও ত তার বর নেয় না, সে কি উপোস ক'রে আছে? খাচ্ছে পরছে না?'

'চুপ চুপ!' অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে কমলা। এঁচোড়ে-পাকা মেয়েকে ঘাঁটানোই ভুল হয়েছে ওর। উমা যদি শুনতে পায়, ছি ছি!

গলা নামিয়ে বলে, 'ওসব কথা তোমাকে বলতে নেই মা, ছি! ছোট মুখে বড় কথা শুনলে দিদিমা বড় রাগ করবেন।'

মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দেয় ঐন্দ্রিলা, 'দিদিমার কথা ছেড়ে দাও, সব তাইতেই রাগ!'

কমলা যে কথাটা বলতে পারত সেটা হচ্ছে এই যে, মাসিমার মত মেয়ে পড়িয়ে খেতে গেলে নিজের কিছু লেখাপড়া শেখার দরকার। অথচ ওটাতে কিছুতেই ঐন্দ্রিলা কোন উৎসাহ বোধ করে না। উমা হার মেনে গেছে—দু'বছর ধরে দ্বিতীয় ভাগের গণ্ডী আর পার হ'তে পারছে না মেয়ে কোনমতেই। অথচ সংসারের কাজে-কর্মে দ্বিগুণ উৎসাহ। প্রায়ই ভোর চারটেয় উঠে দিদিমার সঙ্গে গঙ্গা স্নান করতে যায়। যেদিন হয়ে ওঠে না, সেদিন ফেরার আগেই স্নান সেরে পুজোর আয়োজন ক'রে রাখে—নইলে তাঁর সঙ্গে ফিরেই তাড়াতাড়ি চন্দন ঘষে ফুল বেল-পাতা সাজিয়ে ঠিক করে দেয়। রাসমণি প্রত্যহ শিবপূজা করেন—তারই যোগাড়। তারপর উমার সঙ্গে রান্নার কাজে লেগে যায়। কুটনো কোটা, দুধ জ্বাল দেওয়া ত বটেই—এখন রান্নাও করতে বসে এক-একদিন! উমা ওকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে—পরের মেয়ে তায় আইবুড়ো, কিসে কি হয়ে যাবে, পুড়ে-ঝুড়ে যাবে হয়ত—তখন সারা জীবন তাকেই কথা শুনতে হবে। কি দরকার বাপু! কিন্তু ঐন্দ্রিলা শোনে না কোনমতেই। রাগ করে, ঝগড়া করে, অভিমান করে। রাসমণিও বলেন, 'দে দে—রাঁধতে চায় ত রাঁধতে দে। কোন্ দুঃখীর সংসারে গিয়ে পড়বে, সেখানে শুধু ত হাঁড়ি ঠেলা নয়—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে হবে হয়ত। যেমন মহাটার হচ্ছে। একটু অভ্যাস থাকা ভাল।'

ঘর-সংসারের সব কাজেই ওর সমান মন। 'সেজ'-এর আলো জ্বলে সারারাত—সে সব সাজানো, আজকাল কেরোসিনের আলো হয়েছে, তা ঝাড়ামোছা করা—বিছানা পাতা—উমা যখন থাকে না তখন সব গেছে ক'রে সাজিয়ে রেখে দেয়। এসবগুলো যে ক্লান্ত উমাকে ফিরে এসে করতে হয় না, সেজন্য উমা বরং কৃতজ্ঞ। এমন কি বিকেলের খাবারের আয়োজনও সে ঠিক ক'রে রেখে দেয়—কুটনো কুটে

উনুন সাজিয়ে ময়দা মেখে—উমা এসে কাপড় কেচে আহ্নিক করতে গেলে উনুনে আঁচও সে দিয়ে দেয়। তারপর যাহোক তরকারি আর রুটি, ওদের দুজনের মত একটু রান্না—কতক্ষণই বা লাগে!

রাসমণি রাত্রে একটু দুধ ছাড়া কিছু খান না। আজকাল দিন রাতের ঝি রাখা হয় না—প্রধানত ক্ষমতার অভাব—গিরিবালা এসে কাজকর্ম ক'রে দিয়ে চলে যায়। মাসিক দু'টাকা মাইনে তার—খাওয়াপরার কোন দায়িত্ব নেই। শীতকাল হ'লে এক-একদিন উমা দুপুরেই রান্না ক'রে রেখে দেয়, বিকেলে কাঠের জ্বালে ঐন্দ্রিলা শুধু দুধ জ্বাল দেয় আর সকালের তরকারিটা গরম ক'রে রাখে।

শ্যামা মধ্যে মধ্যে চিঠি লেখে মাকে, 'ঐন্দ্রিলার জন্য শহরের দিকে একটা পাত্র দেখুন মা। ও আমার গর্ভের সব চেয়ে সুন্দর ফল, এই সব বন-গাঁয়ে ধান সিদ্ধ করা আর গোয়াল সাফ করবার জন্যে বিয়ে দিতে মন চায় না। উমার চিঠিতে যা পড়ি তাতে মনে হয় ওর লেখাপড়া আর হবে না! তাহ'লে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভাল।'

রাসমণি চিঠি পড়ে কঠিনভাবে হাসেন। চিঠি নিয়ে আসে হেম। ওর অফিসে নানা ধরনের শিশি আসে, বিলিতী শিশি—হেম সেইগুলো রোজই দুটো-একটা ক'রে সরায় আজকাল। কতকগুলো জমলে এক-এক রবিবার পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে সটান হেঁটে কলকাতায় চলে আসে—এখানে নাকি শিশি-বোতলের খুব দর, বেচলে ভাল দাম পাওয়া যায়। সেই টাকা নিয়ে দিদিমার বাড়ি আসে, খাওয়াদাওয়া ক'রে আবার সন্ধ্যের পর হাঁটা দেয় বাড়ির দিকে।

রাসমণি অবশ্য এ খবর জানেন না। হেমের বয়স অল্প হলেও এটুকু সে চিনে নিয়েছিল দিদিমাকে, চোরাই মালের কারবার করা কখনও তিনি বরদাস্ত করবেন না। তিনি ভাবেন হেম বুঝি এমনি—ওর বোনের খবর নিতে আসে। তিনি খুশীই হন মনে মনে। ভাই-বোনে টান থাকা ভাল।

কিন্তু সে অন্য কথা। শ্যামার চিঠি পড়ে হেমকেই উত্তর দেন, 'তোর মায়ের দেখছি দুঃখে-কষ্টে মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। আমি এখান থেকে পাত্র দেখব কি ক'রে? আমার কি কোন পুরুষ অভিভাবক আছে, না আমি নিজে কারও বাড়ি যাওয়া-আসা করি? আমাকে পাত্র দেখতে গেলে ঘটক-ঘটকী ডাকা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু ঘটকের সাধ নিজেকে দিয়ে, উমাকে দিয়েও কি তার মেটে নি? বরং বলগে যা জানাশোনার মধ্যে পাড়া-ঘরে ভাল ছেলে দেখতে। মেয়ে কি তার রঙের রাধা যে গোয়াল কাড়তে গিয়ে মরে যাবে!'

হেম মাথা হেঁট ক'রে সব শোনে। উত্তর বয়ে নিয়ে যায় মায়ের কাছে।

শ্যামা রাগ করে, 'মায়ের যত সব অনাছিষ্টি কথা! ঘটক-ঘটকী কি আর কোথাও চাল বে দিচ্ছে না? আমাদের বরাতে যা ছিল তাই হয়েছে। ওদের কি দোষ?'

হেম মুচকি হেসে উত্তর দেয়, 'তোমার মেয়ের বরাতেও যা আছে তাই হবে। এখানেই বিয়ের পাত্তর ছাখো না।'

'তুই থাম্।' শ্যামা ধমক দেয়।

'হ্যাঁ—দিদিমা আরও একটা কথা ব'লে দিয়েছেন, বলেছেন ঘটক-ঘটকী যে সম্বন্ধ আনবে তাতে শুধু-ভাত মুখে উঠবে না—পাওনা-থোওনা চাই। কত টাকা তোর মা খরচ করতে পারবে তাই শুনি!'

মুখ গোঁজ ক'রে শ্যামা বলে, 'টাকা যদি আমিই খরচ করব ত ঝিয়ের মত খাটতে মেয়েকে আমার সেখানে ফেলে রেখেছি কেন?'

মায়ের অকৃতজ্ঞতায় হেম সুদ্ধ যেন চমকে ওঠে, একটু থেমে বলে, 'তাহ'লে ওকে আনিয়েই নাও না মা! কি দরকার ফেলে রাখবার?'

'দেখি একটু বেয়ে-চেয়ে। মা কালী কি মুখ তুলে চাইবেন না!'

দুই

সেদিন দুপুরবেলাই কালো ক'রে মেঘ ঘনিয়ে এল। উমা সব কাজ ফেলে ছুটল ছাদে। ওর এই অসময়ের কালো মেঘ দেখতে খুব ভাল লাগে। কেমন চারদিক অন্ধকার ক'রে আসে, মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়, আর অন্ধকারের মধ্যেও সেই দিকচক্র-রেখার দিকে কেমন একটা অদ্ভুত আলো দেখা যায়। মেঘগুলোও যেন ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মত গড়িয়ে এসে একসময় আকাশ ছেয়ে ফেলে, মধ্যে মধ্যে গুম্ গুম্ শব্দ হ'তে থাকে। উমার মনে হয় মহাপ্রলয় বুঝি ঘনিয়ে আসছে—আর দেরি নেই। ঐ রাশি রাশি কালো পাথরের মত মেঘগুলো বুঝি এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে, সব ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে চাপা দিয়ে দেবে।

'ছোট মাসিমা!' ঐন্দ্রিলা উমাকে খুঁজতে খুঁজতে ছাদে আসে। 'ঐ! শুরু হয়েছে! কি যে বাপু তোমার এক মেঘ দেখা তা বুঝি না। মেঘ হ'ল ত কাজ-কম্ম ফেলে ছুটলে ছাদে! কী আছে মেঘে? কালো কালো বিচ্ছিরি মেঘগুলো, দেখলেই ত ভয় করে!'

উমা কিন্তু চোখ নামায় না। ওর তৃষ্ণার্ত হৃদয় বুঝি সজল মেঘের মধ্যেই শান্তি খোঁজে। দুই চোখ ভ'রে পান করে সেই শ্যামল শোভা।

অসহিষ্ণু ঐন্দ্রিলা আবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'এখন আমার কথাটা শুনবে, না কি? মেঘ ত আর পালাচ্ছে না। ও ত রোজই আছে।'

চোখ না ফিরিয়েই উমা হেসে বলে, 'তোর ও-করাও ত রোজ আছে। দিন-রাত আছে। মেঘই বরং পালাবে। ভাখ না, ঐ বৃষ্টি নেমে গেছে—ঐ যে নতুন বাজারের ওধারে ঐ পশ্চিম দিকের আকাশের কাছটা ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে—তার মানে গঙ্গার ওপর জল নেমেছে। এখানে এসে গেল বলে—'

'তোমার বাপু সব তাইতে বাড়াবাড়ি !'

'চুপ চুপ। ঐ শোন্, রাজেন মল্লিকের চিড়িয়াখানার ময়ূর ডাকছে। কান পেতে শোন্ দিকি !'

অর্ধস্বগতোক্তি করে ঐন্দ্রিলা, 'ভারি শোনবার জিনিস কি না ! ক্যাঁ ক্যাঁ—কি আমার মিষ্টি ডাক গো !'

বেশীক্ষণ অবশ্য তাকে অপেক্ষা করতে হয় না। চটপট শব্দ ক'রে বড় বড ফোঁটায় জল নেমে পড়ে। 'ও মা গো' ব'লে তিন লাফে রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল ঐন্দ্রিলা। উমা কিন্তু তবুও যেন কিসের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে দেখতে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে যায়—উমার গা-মাথার কাপড়—দৌড়ে আসতে আসতেও ভিজে লেপ্‌টে যায় গায়ের সঙ্গে।

'হ'ল ত !' ঐন্দ্রিলা রাগ করে, 'কি যে আদিখ্যেতা তোমার তা বুঝি না। সেই থেকে বলছি ! কাপড়টি ত বেশ ক'রে ভেজালে, এখন কি করবে ? কাপড় আনতে যাবে কে নিচে ?—যে যাবে সে-ই ত ভিজবে।'

গায়ের কাপড় খুলে নেংড়াতে নেংড়াতে উমা উত্তর দেয়, 'কাপড় আর আনতে হবে না—এ এখনই শুকিয়ে যাবে আগুন-তাতে।'

'হ্যাঁ, তা যাবে বৈকি। ভিজে কাপড়ে সারাবেলা থেকে তারপর জ্বরে পড়ো। দেখি, আমারই আবার পোড়ার ভোগ আছে আর কি !'

বলতে বলতে, উমা বাধা দেবার আগেই, বড় একখানা গামছা গায়ে-মাথায় জড়িয়ে ছুটে চলে যায় সিঁড়ির দিকে, তারপর তেমনি ভাবেই বুকের মধ্যে ক'রে একখানা শুকনো শাড়ি নিয়ে ছুটে আসে আবার।

'নাও ধরো। আমার হয়েছে এক জ্বালা !'

বকতে গিয়েও ওর কথা বলার ধরনে হেসে ফেলে উমা, 'তারপর, তুইও ত ঐ ক'রে ভেজালি কাপড়—এখন আবার আমি আনতে যাই ?'

'না না—এ আমার কিছু ভেজে নি, দু-পুরু গামছা ছিল।'

'কি বলছিলি তখন ? কি এমন জরুরী কথা ?' কাপড় ছাড়তে ছাড়তে উমা প্রশ্ন করে।

'শোন নি ? গিরি মাসি নুন কিনতে গিয়েছিল—নুন পায় নি !'

'নুন পায় নি ? সে আবার কি কথা ?'

'দোকানী বলেছে—বিলিতী নুন নাকি আর সে বেচবে না। পাড়ার ছোকরা বুরা সব স্বদেশী হয়েছে, বিলিতী নুন আর কাউকে পাড়ায় বেচতে দেবে না। দ্ধব নুন কিনতে হবে, তা বেশী পয়সা চাই। তাও নাকি লাল লাল বিচ্ছিরি নুন—মাটির ডেলা !'

'তা অন্য দোকানে দেখলে না কেন ? গিরিকে বললি না ? নগদ পয়সা দেবে যখন—'

'সে সব দোকান ঘুরে দেখেছে। ছাতুবাবুর বাজারে কেউ বিলিতী নুন বেচবে না। আছে সবার কাছেই—কিন্তু সাহস নেই কারও। বিলিতী নুন বিলিতী কাপড় কিচ্ছু বেচা চলবে না।'

কথাটা আজ নয়—ক'দিন আগেই শুনেছে উমা। ছাত্রীদের বাড়িতে প্রবল আলোচনা হয়—কানে না এসে উপায় নেই। বড়লাট সাহেব নাকি বাংলাকে দুখানা ক'রে দিয়েছেন—তাতে বাঙালীর সর্বনাশ হয়ে যাবে। বাঙালীকে জব্দ করার জন্যেই নাকি এই সব ব্যবস্থা। তাই সবাই ক্ষেপে উঠেছে। বিলিতী জিনিস কেনা বন্ধ করেছে সবাই—তাতেই নাকি ইংরেজ ঠাণ্ডা হবে সব চেয়ে। তাতে ওদের ভাতে হাত পড়বে।...বিলিতী কাপড়ের কথাটাই শুনেছে সে বেশি ক'রে—নুনের কথা ত কৈ শোনে নি !

ওর মনের কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে যেন ঐন্দ্রিলা ব'লে উঠল, 'কাপড়ও ত কিনতে দেবে না ! তবেই ত চিত্তির !'

'তাতে আর আর আমাদের কি ? আমরা ত তাঁতের কাপড় পরি।'

একরত্তি ঐন্দ্রিলা হাত-পা নেড়ে বলে, 'সবাইয়েরই ত আর তোমার মত ফরাসডাঙার কাপড় পরার ক্ষ্যামতা নেই। আমাদের মত গরীবগুর্বোর কি হবে ?'

একটু অপ্রতিভ হয়ে উমা বলে, 'সেও ত শুনছি বোম্বাইয়ের ওধারে কোথায় কাপড়ের কল বসেছে। সে ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—রেখে বসো ! ঐ ত গিরি মাসি শুনে এসেছে—সে যা কাপড় আসবে—থলের মত বিচ্ছিরি মোটা—তাও ডবল দাম ! এমন চোদ্দ আনায় বারো আনায় এত ভাল কাপড পাবে না' !'

উমা কথাটা উড়িয়ে দেয়, 'ভেবে কি আর হবে বল্ ! যা সবার অদৃষ্টে আছে আমাদেরও তাই হবে—বেশি ত আর নয়।'

'মার কানে যদি কথাটা যায়—মা লাফাবে একেবারে !'

আরও খানিক গজ্ গজ্ করে ঐন্দ্রিলা আপন মনেই, কিন্তু উমার কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে খানিকটা পরে আপনিই থেমে যায়।

সত্যিই শ্যামা লাফাতে থাকে একেবারে।

মঙ্গলা ঠাকরুন হাত-পা নেড়ে এসে গল্প করেন, 'শুনেছিস্ বামনি—স্বদেশী-ওলাদের হুজুগ ?'

'কৈ না ত মা! কী-ওলা বললেন ?'

'ঐ যে বাপু স্বদেশী না কি এক ফ্যাচাঙ উঠেচে! দেশের ছোকরা বাবুরা উঠে পড়ে লেগেছেন—ইংরেজ নাকি এদেশে আর রাখবেন না, তাড়িয়ে তবে জলগেরণ করবেন। যত সব বাউণ্ডুলে উন্‌পাজুরে বরাখুরে ছোঁড়ারা জুটেছে—একটা না-একটা হুজুগ লেগে আছেই!'

'তা তারা কি চায় ?' শ্যামা তখনও সংবাদটার সমস্ত অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ বুঝতে পারে না।

'ওলো, কেউ নাকি বিলিতী কাপড় পরবে না, বিলিতী নুন চিনি কিচ্ছু খাবে না—সব নাকি বয়কট করবে। ওকে নাকি বয়কট করা বলে!'

নিশ্চিন্ত অবিশ্বাসের হাসি হেসে শ্যামা বলে, 'না কিনে করবে কী ? আপনিও যেমন ক্ষেপেছেন!'

'ওলো না—আমাদের কত্তা কাল চিনি কিনে আনছিলেন, হাত থেকে কেড়ে নিতে গেছল। অনেক ধমক্-টমক্ ক'রে তবে পার পেয়েছেন।'

'তবে ? চিনি না হ'লে চা খাবেন কি ক'রে ? ওঁর ত আবার চা খাবার অভ্যেস!'

'তাই ত বলছি। বলে কিনা গুড় দিয়ে চা খেতে হবে।'

খানিকটা চুপ ক'রে থাকে শ্যামা, বলে, 'ও দুদিনের হুজুগ মা—দুদিনেই থেমে যাবে। আপনিও যেমন!'

'হ্যা—আমিও তাই বলছিলুম ওঁকে। বিলিতী কাপড় না কিনলে পরবে কি! কটা লোকের ফরাসডাঙা শান্তিপুর পরার ক্ষ্যামতা আছে তাই শুনি ? কিন্তু—' গলাটা নামিয়ে এবার একটু চিন্তিত ভাবে বলেন মঙ্গলা, 'উনি যেন কেমন ভরসা পাচ্ছেন না। বলছেন তোমরা যা ভাবছ তা নয়—এ নিয়ে রীতিমত গোলমাল বেধে উঠবে। চাকরি নিয়ে না টানাটানি পড়ে!'

কথাটা শুনে শিউরে ওঠে শ্যামা। অক্ষয়বাবুর চাকরির জন্যে তার ভাবনা নয়—চাকরি গেলেও তাঁর চলবে, তার ভাবনা হেমের চাকরির জন্যে। গত মা

থেকে বারো টাকা হয়েছে মাইনে। আরও বাড়বে—সাহেবের সুনজরেও চাই কি পড়ে যেতে পারে কোন রকমে। (কেমন ক'রে সেটা পড়া যায় তা শ্যামা জানে না—তবে ঝাপ্সা রকম একটা ধারণা আছে যে এ রকম অঘটন ঘটলে আর কোন ভাবনা নেই।) এই সময় এসব আবার কি বিঘ্ন!

সে গজ্‌রাতে আর গাল পাড়তে থাকে।

স্বদেশী কী তা সে জানে না, কেন এদের এ বিক্ষোভ তাও জানতে চায় না, কোথা দিয়ে কী ক্ষতি হ'তে পারে, ওর এবং জাতির,—জাতির সুবিধার জন্যে যে কোন কোন মানুষের সামান্য ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করতেই হয় মধ্যে মধ্যে—এ সব কোন কথাই শ্যামার জানা নেই। শুধু হেমের চাকরি এই আন্দোলনের ফলে কোন দিন যেতে পারে এই সম্ভাবনাতেই—সে যেন ক্ষেপে ওঠে একেবারে।

'মুখে আগুন মড়াদের! মরুক, মরুক সব। ওলাউঠো হোক। একধার থেকে নির্বংশ হোক্। স-পুরী এক গাড়ে যাক, হুজুগ করবার আর সময় পেলেন না সব! গরীবকে কেবল জব্দ করা বই নয়!'

হেম বরং মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনা দেয়—'যাক না মা, ভারি তো বারো টাকা মাইনের চাকরি, যজমানী ক'রে ওর চেয়ে ঢের বেশি এনে দেবো।'

'তুই থাম্। ভারি ত বুঝিস্ তুই!' ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয় শ্যামা।

কিন্তু ওর গালাগাল সে বিপুল জনসমুদ্রের কোলাহল ভেদ করতে পারে না। তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে আন্দোলন। অবশেষে শোনা গেল একদিন অক্ষয়-বাবুর হাত থেকে বিলাতি কাপড় কেড়ে নিয়ে ছেলেরা পুড়িয়ে দিয়েছে।

উড়ো উড়ো নানা খবর আসে। কলকাতাতে নাকি ভীষণ গোলমাল চলেছে, কবে যে আগুন জ্বলে উঠবে তার ঠিক নেই। অক্ষয়বাবুর অফিসে চার-পাঁচজন ছোকরার চাকরি নাকি এরই মধ্যে চ'লে গেছে—এই সব হুজুগ করার জন্যে!

অবশেষে একদিন অফিস থেকে হেম শুনে এল—সাহেব সবাইকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন, এসব হাঙ্গামে তাঁর কলের কেউ যেন জড়িয়ে না পড়ে—তাহ'লে কিন্তু কোনক্রমেই চাকরি থাকবে না।

শিউরে উঠে শ্যামা তাকে সাবধান করে, 'দেখিস্ ঐ সব হাড়হাবাতে বজ্জাত ছোঁড়াদের ত্রিসীমানায় থাকিস নি কোনদিন। খবরদার—এই পই পই ক'রে বারণ ক'রে দিচ্ছি! দুর্গা দুর্গা—রক্ষে করো মা বাছাকে।'

অনেকদিন পরে একদিন নরেন এসে হাজির হ'ল। গামছার পুঁটুলিতে অনেক-খানি দামী বিলিতী চিনি।

গজগজ করতে করতেই বাড়ি ঢুকল, 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার! ওঁরা তাড়াবেন ইংরেজ! শুধু যদি বক্তিমে ক'রে ইংরেজ তাড়ানো যেত তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। কাজের মধ্যে ত কেবল কথা—কথার ধুকড়ি এক-একটি!'

শ্যামা অবাক হয়ে বলে, 'কিন্তু এত চিনি পেলে কোত্থেকে, তবে যে শুনছিলুম বিলিতি চিনি কাউকে কিনতে দিচ্ছে না?'

'হু হুঁ, তাই ত! সেই ত সুবিধে হ'ল, বুঝলি না? কি জানিস্ গিন্নী, বুদ্ধি চাই! বুদ্ধি থাকলে কি আর কেউ মাগের শ্বশুরবাড়ি খেটে খায়?...উঁ-উঁহু— ওতে হাত দেওয়া চলবে না! এ আমি সরকারকে বিক্কিরি করব। চা খাওয়ার নেশা বাবুর, চিনি ত পাচ্ছেন না, চড়া দাম নেব!

'কিন্তু পেলে কি ক'রে তাই শুনি না?'

'ঐ এক সাহেবের চাপরাসী কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। ছোঁড়ারা রে-রে ক'রে গিয়ে পড়ল। আমি দেখলুম—জিনিসটা ত নষ্ট হবেই—সাহেবের ভোগে আর হচ্ছে না। আমিও ঐ দলে মিশে গিয়ে সব্বার আগে ছিনিয়ে নিলুম। তারপর হৈ-চৈ চেঁচামেচির মধ্যে এক ফাঁকে সরে পড়তে কতক্ষণ, বুঝবি না!—তা মাল আছে ঢের, পাঁচ সেরের কম নয়। হেঁ-হেঁ!'

আত্মতৃপ্তির হাসিতে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

তারপর পা ছড়িয়ে বসে শ্যামাকে তামাক সাজবার হুকুম ক'রে আবার একচোট গালাগাল দিতে বসে আহাম্মক ছোঁড়াদের।

'তুমিও যেমন! স্বদিশী হচ্ছে না গুষ্টির পিণ্ডি হচ্ছে! ছাই হবে! লাভে হ'তে এই অপ্‌চ।...বোকা বোকা! ঝাড়ে-বংশে সব বোকা!'

বহুদিন পরে স্বামীর সঙ্গে একমত হতে পেরে শ্যামাও খুশী হয়ে ওঠে। দুজনে মিলে মনের সাধ মিটিয়ে গাল দেয় এই অস্পষ্ট, অপরিচিত—স্বদেশীওলাদের।

তিন

কেবল কোন উত্তেজনা দেখা যায় না রাসমণিরই। তিনি সবই শোনেন, কোন কথা বলেন না। উমা বুঝতে পারে না মায়ের ভাবটা। এমন ত ছিলেন না মা যেন কোন কিছুতেই আর কোন কৌতূহল নেই, আসক্তি নেই, নিস্পৃহ উদাসীন হয়ে গেছেন তিনি। কেমন যেন ভয়-ভয় করে ওর রাসমণির এই ধরণের ভাব দেখে। উমা কমলাকেও তার আশঙ্কার কথাটা জানিয়েছিল একবার কিন্তু কমলা সেটা গায়ে মাখে নি! উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'ও কিছু নয়—বুড়ো বয়সে শরীর

খারাপ হ'লে অমনিই হয়।'

অবশ্য শরীরটা খারাপই যাচ্ছে ওঁর—সেটাও ঠিক। কাশী থেকে এসে বছর-খানেক বেশ ভাল ছিলেন, তারপরই আবার খারাপ হ'তে শুরু করেছে। বিশেষত ইদানীং যেন একটু বেশী রকম কাবু হয়ে পড়েছেন। জ্বর হয় প্রায়ই, ডাক্তার বলেন পুরোনো ম্যালেরিয়া। কুইনাইন দিতে চান—রাসমণি তা খাবেন না। রাগ করে বলেন, 'হ্যাঁ, কুইনাইনে শুনেছি মাথা ঘোরে, কানে কালা হয়ে যায়! বুড়ো বয়সে ঐ খেয়ে মরি আর কি!···দূর! দূর!'

কবিরাজীও করতে চান না। কেবল অনুপান আর পাঁচন—করে কে ওসব? ঘাড় নেড়ে বলেন, 'অত হাঙ্গামা আর পোষাবে না। তাছাড়া দরকারই বা কি? রোগে ধরলে ওষুধে ছাড়ে—যমে ধরলে কি আর ছাড়ে! এবার আমায় যমে ধরেছে, বুঝছিস্ না? সময়ও ত হ'ল, আর কতকাল বাঁচব! কিছুদিন ধরে জ্বর হলেই তোদের গুষ্টিকে স্বপ্ন দেখছি। এতদিনে বোধ হয় মনে পড়ছে!'

স্বামীর প্রসঙ্গ রাসমণির মুখে কেউ কখনও শোনে নি। এ-ও এক ব্যতিক্রম। 'তোদের বাবা' এ তিনি বলেন না। স্বামীর প্রসঙ্গে 'বাবা' শব্দ, তা হোক না কেন অপরের বাবা, এ তাঁদের আমলে উল্লেখ করা নিষেধ ছিল। ওটা অসভ্যতা ব'লে গণ্য হ'ত, ঠাট্টা-তামাশা করত সবাই। সুতরাং তিনি বলেন, 'তোদের গুষ্টি'!

নতুন কি এক চিকিৎসা বেরিয়েছে হোমিওপ্যাথি বলে, পাড়ায় তারই এক ডাক্তার আছেন—কালীপদ বরাট। জ্বর যখন খুব চেপে আসে, এক-একদিন কাঁপতে কাঁপতে দাঁতি লেগে অজ্ঞান হয়ে যান রাসমণি, তখন উমা ভয় পেয়ে বরাটকেই ডাকে। ছোট একটা ছেলের মাথায় কাঠের বাক্স চাপিয়ে নিয়ে তিনি চলে আসেন। বেশ জাঁকিয়ে বসেন রোগিণীর পাশে, নানা প্রশ্ন করেন ওদের (সম্ভব হলে রোগিণীকেও), এবং প্রত্যেকটি উত্তর শুনেই একবার ক'রে বিজ্ঞভাবে টেনে টেনে বলেন 'হুঁ—।' তারপরই আবার একটি নতুন প্রশ্ন নিক্ষেপ করেন। এইভাবেই চলে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট।

অনেকক্ষণ পরে শেষ একটি 'হুঁ' ছেড়ে কাঠের বাক্স খোলেন। ঐন্দ্রিলাকে হুকুম করেন, 'একটা পরিষ্কার পাথরের বাটিতে ক'রে একটু জল এনে দাও ত খুকী-মা!'

পাথরের বাটিতে জল এসে পৌছলে সাবধানে বেছে বেছে একটি শিশি বার করেন, তারপর তা থেকে পরিষ্কার জলবৎ কি একটা ওষুধ—খুব সন্তর্পণে শিশির মুখে ছিপি লাগিয়ে একটি ফোঁটা মাত্র ঢেলে দেন।

'শ্রীবিষ্ণু ! নাও, এবার খাইয়ে দাও ত মা-ঠাকরুনকে চট্পট !'

প্রথম প্রথম রাসমণি খেতে চাইতেন না।

'এ যে কেমন কেমন গন্ধ ডাক্তারবাবু !'

'মদের মত গন্ধ—এই ত !' ডাক্তার বরাট মুখের কথা টেনে নিয়ে বলতেন, 'তা ত হবেই মা। যে জিনিসের যা। এ যে সুরাসার দিয়ে তৈরি। কিন্তু তাতে ত দোষ নেই—জানেন ত শাস্ত্রের বচন,—ঔষধার্থে সুরাপান।—তাও চলে !'

ইদানীং আর আপত্তি করেন না। কিছুতেই যেন আপত্তি নেই তাঁর। ক্লান্তভাবে হাঁ করেন—কে কি ওষুধ ঢেলে দিচ্ছে চেয়েও দেখেন না।

কিন্তু তাতেও রোগ ভাল হয় না।

তিন দিন চার দিন ভাল থাকেন আবার পাল্‌টে জ্বরে পড়েন। এই সময় আর একবার হয়তো পশ্চিমে নিয়ে গেলে হ'ত কিন্তু কে নিয়ে যাবে ? রাঘব ঘোষাল বাতে পঙ্গু—তার ছেলেই সব যজমানী দেখছে। উমার যাওয়ার উপায় নেই, তাছাড়া সব চেয়ে বড় কথা হ'ল খরচা। অত খরচ দেবে কে ? এখন যা অবস্থা—সংসার চলাই ভার।

সুতরাং কিছুই হয় না। রাসমণি রোগে ভোগেন—আর যখন ভাল থাকেন, ক্লান্ত অবসন্নভাবে দূরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে মালা জপেন।

আজকাল সব দিন আর গঙ্গাস্নানেও যেতে পারেন না। দু'তিনদিন উপরি উপরি ভাত খেয়েও যদি জ্বর না আসে ত চুপিচুপি ঐন্দ্রিলাকে সঙ্গে ক'রে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু হেঁটে যদি বা যান আসার সময় প্রায়ই আর আসতে পারেন না—পালকি ক'রে ফেরেন। যেদিন হেঁটে আসেন—সেদিনও টানা আসতে পারেন না, পথে অনেক জায়গায় বসে পড়তে হয়। খানিকটা বসে জিরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেন।

যেদিন স্নান করতে যান সেদিন গঙ্গার ঘাটেও শোনেন স্বদেশী হাঙ্গামার কথা। সুরেন বাঁড়ুয্যে বিপিন পাল আর রবি ঠাকুর নাকি ছেলেদের খেপিয়ে তুলছেন। কোন বিলিতী জিনিস্ কেনা হবে না—সাহেবদের ভাতে মারতে হবে, এই হয়েছে হুজুগ। নুন, চিনি, বিলিতী কাপড় কিছু কেনা যাবে না। কেনা সম্ভব নয়। কেউ কেউ নাকি লুকিয়ে কেনার চেষ্টা করছে কিন্তু ধরা পড়ে তেমনি লাঞ্ছনাও হচ্ছে তাদের। স্বদেশী ছেলেরা নাস্তানাবুদ ক'রে ছাড়ছে।

শোনেন, কানে যায় এই পর্যন্ত। কাথাটা তাঁকে কোনরকমে বিচলিত করতে পারে না। মন তাঁর এতটুকুও জাগে না। অথচ এককালে তিনি খবরের কাগজ

পড়তে ভালবাসতেন। বরাবর সাপ্তাহিক কাগজ একখানা ক'রে নেওয়া হ'ত। পড়ার অভ্যাস ছিল তাঁর। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, গোলেবকাওলি, চাহার দরবেশ, গোল-সনুবর, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী—এসব বই এখনও তাঁর বাক্স খুঁজলে পাওয়া যাবে। পয়ারে অনূদিত বেতাল পঞ্চবিংশতি এক কালে তাঁর মুখস্থ ছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরে যেন সবই ভুলে যেতে বসেছেন। বই পড়তেও আর ভাল লাগে না। এক-একদিন উমা নিজে থেকেই প্রস্তাব করে—'কিছু পড়ে শোনাব মা?' রাসমণি তাতেও ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানান, 'থাক গে, ভাল লাগছে না।'

কী যে ভাল লাগবে তাঁর, উমা তা বুঝতে পারে না। দিনরাতই কি যেন ভাবছেন। বসে থাকলে জানলা দিয়ে বোসেদের বাড়ির কার্নিসটার দিকে, নয়ত ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কী এত ভাবেন মা—উমা হাজার চেষ্টা ক'রেও আন্দাজ করতে পারে না! তবে কি তিনি তাঁর ফেলে-আসা দীর্ঘ জীবনের কথাই ভাবেন দিনরাত? অথবা যেদিন থাকবেন না, তাঁর এই তিনটি মেয়ের কি হবে সেই কথা কল্পনা করার চেষ্টা করেন!

কিছুই বোঝা যায় না তাঁর এই স্তম্ভিত অথচ উদাসীন ভাব দেখে। প্রশ্ন করতেও সাহস কুলোয় না। চিরদিন মাকে ভয় করা অভ্যাস তার—সে অভ্যাস স্বভাবেই দাঁড়িয়ে গেছে। ভয় কাটে নি।

ঐন্দ্রিলা মাঝে মাঝে প্রশ্ন ক'রে বসে 'আচ্ছা দিদিমা, কি ভাবেন অত?'

'য়্যাঁ' যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে ওর মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করেন রাসমণি, 'কি বললি? ভাবছি? না—ভাবছি আর কৈ!'

আবার তেমনি নৈঃশব্দ্যে ডুবে যান।

কেবল একটি দিন ওঁর ভাবান্তর দেখেছিল উমা। সেটা তিরিশে আশ্বিনের দিন। কথা ছিল সেদিন রাখীবন্ধনে সব বাঙালী সব বাঙালীকে বাঁধবে 'ভাই' বলে। নাড়ীর টান আরও নিবিড় ক'রে তুলবে।

তার আগে প্রায় তিন-চার দিন জ্বর হয় নি রাসমণির। স্নান করতে যাওয়ার পথে কথাটা শুনলেন। আজ কোন বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না, এবেলা রান্না হবে না কোথাও। গঙ্গাস্নান করবে সবাই। স্নান ক'রে খালি পায়ে এক এক দল এক এক দিকে যাত্রা করবে, রাখী পরাতে পরাতে যাবে পথের দুধারে। এই পথেই বুঝি যাবে সবাই।

বাড়ি এসেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করলেন উমাকে। তার আগে

নিষেধ করলেন উনুনে আঁচ দিতে।

উমা প্রশ্ন করল, 'কিন্তু আপনি কী খাবেন মা তাহলে? অন্তত দুখানা কাঠ জ্বেলে আপনাকে একটু দুধ গরম ক'রে দিই?'

'না না, তার দরকার নেই'—প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে বললেন রাসমণি, 'তুই কি পাগল হয়েছিস? আমার এই বয়সে দু-তিন দিন না খেলেও কিছু ক্ষেতি হবে না। বরং ঘরে যদি মিষ্টিটিষ্টি থাকে ত ঐ মেয়েটাকে একটু কিছু খাইয়ে দে। ছেলেমানুষ, নেতিয়ে পড়বে শেষে।'

স্বদেশী ব্যাপারে ঐন্দ্রিলার কোন সহানুভূতি ছিল না, থাকবার কথাও নয়। সে কিছু বুঝত না এসব। কিন্তু হুজুগে মেতে ওঠারই বয়স তার। দিদিমা কিছু খাবেন না—সে খাবে কচি খুকী ব'লে? কক্ষনো না।

সে বললে, 'আমার কিছু হবে না দিদিমা, আমি বেশ থাকব।...একটা বেলা বৈ ত নয়। এই ত গতবার আমি শিবরাত্তির করলুম।'

রাসমণির প্রশ্নের উত্তরে উমা যতটা জানত সবটাই বলে। কে নাকি বড়লাট — কার্জন ব'লে—বাঙালীকে জব্দ করবার জন্যে বাংলাটাকে দু ভাগ ক'রে দিয়েছে। বাঙালীরা নাকি এত বেশী লেখাপড়া শিখে ফেলেছে যে ইংরেজদের রাজত্ব করা দায় হবে এদেশে—তাই দেশটাকে দু'আধখানা ক'রে বাঙালীকে চিরদিনের মত দমিয়ে রাখতে চায়। সেই জন্যেই সব দেশ ক্ষেপে উঠেছে। ইংরেজদের ধনপ্রাণও নাকি নিরাপদ নয়—মুখ শুকিয়ে গেছে সকলকার।

দেশ যে ক্ষেপে উঠেছে তা রাসমণিও লক্ষ্য করেছেন। আজকাল গঙ্গাস্নান করতে গেলে পথেঘাটে নজরে পড়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য! দুজন ছোকরার যদি দেখা হয়ে গেল তবে আর রক্ষা নেই। তা কে জানে চেনা আর কে জানে অচেনা! একজন বলবে 'বন্দে—', বলে সে থামবে। আর একজন পাদপূরণ ক'রে দেবে 'মাতরম্'। এই নাকি এ যুগের সম্ভাষণ। প্রণাম নমস্কার আর কেউ করবে না। 'বন্দে মাতরম্' বললেই নাকি সব সারা হয়ে গেল।

এ নাকি এক মন্ত্র উঠেছে—সকলেরই মুখে এক কথা —'বন্দে মাতরম্'!

রাসমণি বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' বই পড়েছিলেন, 'বন্দে মাতরম্' গানও পড়ে গেছেন, কিন্তু সেই গানই যে দেশসুদ্ধ লোকের মন্ত্র হয়ে উঠেছে তা অত বুঝতে পারেন নি! সে কথাটাও আজ শুনলেন। থিয়েটারে নাকি 'আনন্দমঠ' নাটক হয়ে অভিনীত হয়েছে, তাতে সুর বসিয়ে ঐ গানটাও গাওয়া হয়েছে। আর সেই গান গেয়েই ক্ষেপে উঠেছে সারা দেশ। সাহেবরা তাই আজকাল 'বন্দে মাতরম্' শুনলেই আঁতকে ওঠে—বন্দুকের গুলির চেয়েও 'বন্দে মাতরম্' শব্দ দুটি হয়ে

উঠেছে ভয়াবহ। দু-এক জায়গায় নাকি সাহেব-মারাও চলছে।

মন দিয়ে শোনেন রাসমণি মুখে একটু তাঁর সংশয়ের ছায়াও ফুটে ওঠে। মুখে বলেন, 'শুনেছি মহারাণীর রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না—সারা পৃথিবীতে তাঁর রাজত্ব। সেই মহারাণীর লোকের সঙ্গে কি আর শুধু-হাতে লড়তে পারবে এরা? কে জানে!'

মহারাণী যে মারা গেছেন এটা কিছুতেই মনে থাকে না রাসমণির। আগে আগে উমা ভুল সংশোধনের চেষ্টা করত, এদানী হাল ছেড়ে দিয়েছে।

তবু আজ যেন কি একটা উৎসাহ বোধ করেন রাসমণি। এতকাল পরে কি এক নূতন উদ্দীপনা। মন আবার যেন কোথায় একটা কৌতূহলের কেন্দ্র খুঁজে পেয়েছে। জীবন পেয়েছে নব প্রাণরস। উত্তেজনায় চোখেমুখে নতুন আলো জেগেছে তাঁর।

তিনি নটার সময় গিয়ে সদরে বসেন। দলে দলে লোক গিয়েছে স্নান করতে. এইবার ফিরবে তারা। এই পথেই ফিরবে। রাখী পরাবে। ঐন্দ্রিলা গিয়ে তাঁর পাশটিতে চুপ ক'রে বসে।

কিন্তু বড় রাস্তা দূরে। একটা বাড়ি পেরোলে তবে বড় রাস্তা। গঙ্গার ঘাটে যাবার পথ। সেই পথেই আজ চরম উত্তেজনা। এখান থেকে নজরে পড়ছে সেখানকার অভিনব দৃশ্য। দলে দলে ছেলেরা চলেছে সব—খালি পা, রুক্ষ চুল। আজ পথে গাড়ি নেই। যারা জীবনে কখনও হাঁটে নি, তারাও আজ রাস্তায় পা দিয়েছে।

ঐন্দ্রিলা থেকে থেকে বলে, 'দিদিমা, চলুন না ঐ বোসেদের রোয়াকে গিয়ে বসি।'

'ক্ষেপেছিস তুই!' রাসমণি থামিয়ে দেন ওকে, 'গিস্‌গিস্ করছে লোক ওদের রকে, তার ভেতর আমি যে কোথায় গিসে বসব। এইখানে থেকেই বেশ দেখা যাবে।'

মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার উঠছে, 'বন্দে—মাতরম্'···বলো ভাই আবার বলো, 'বন্দে—মাতরম্'!

রাস্তায় যাবার ভিড় কমেছে। এইবার ফিরবে ওরা। ক্লান্ত দেহ অবসন্ন হয়ে আসে রাসমণির—তবু উনি ওঠেন না। জীবনের আবার নতুন ক'রে অর্থ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। ঘরে শুয়ে থাকা অসম্ভব।

দূরে যেন মেঘের গর্জনের মত কি যাচ্ছে। কান পেতে শুনলেন, 'বন্দে—মাতরম্!' কান পেতে শুনলেন গানের সুর। ঐ বুঝি সে দল এদিকেই আসছে!

রাসমণি চৌকাঠ ধরে দাঁড়ালেন।

আহা হা—কি সব রূপ! সোনার চাঁদ ছেলেরা, ধনীর দুলাল—গরম রাস্তায় পা ফেলতে পারছে না তবু সবাই চলেছে খালি পায়ে। ওদের মধ্যে একটি লোককে দেখে রাসমণি চোখ ফেরাতে পারলেন না। কন্দর্পের মত রূপ। মুখখানি যেন কে পাথর কুঁদে বার করেছে। গৌর তনু, কুঞ্চিত কেশ, ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু। অল্প বয়স, তবু একটি সুমধুর গাম্ভীর্য বিরাজ করছে তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে।

লোকটিও যেতে যেতে এদিক ফিরে তাকালেন। এক বৃদ্ধা ও এক বালিকা। বৃদ্ধটি যে রুগ্‌ণা তা মুখের দিকে চাইলে নজরে পড়ে। রোগশয্যা থেকে উঠে এসেছেন হয়ত বা মৃত্যুশয্যা থেকেই—দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে। দেশব্যাপী এই প্রাণ-মহোৎসব থেকে দূরে রাখতে পারেন নি নিজেকে সরিয়ে।

পাশের লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে কি যেন তিনি বললেন আস্তে আস্তে। বোধ করি এই সব কথাই। তারপর থমকে একটু থেমে নিজেই এগিয়ে এলেন গলির দিকে। নিজের হাতে রাখী পরিয়ে দিতে এলেন রাসমণি ও ঐন্দ্রিলার হাতে। পরানো শেষ হ'লে নিজেই হাত তুলে নমস্কার করলেন। বড় রাস্তার বিরাট দলটি চারিদিকের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন ক'রে উঠল, 'বল ভাই বন্দে মাতরম্।'

তারই মধ্যে রাসমণি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নামটি কি বাবা?'

'আমার নাম?' একটু ইতস্তত করলেন তিনি, তারপর সস্মিতমুখে মাথাটি নত ক'রে উত্তর দিলেন, 'আমার নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!'

'ও, তুমিই সেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছেলে? দ্বারিক ঠাকুরের নাতি তুমি? তোমার নাম রবি ঠাকুর? বেঁচে থাকো বাবা, দীর্ঘজীবী হও। তোমার মার জন্ম সার্থক!'

প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করেন রাসমণি।

রবীন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, মুখে তাঁর তেমনি সবিনয় মধুর হাসি। তারপর আর একবার হাত তুলে নমস্কার ক'রে আবার রাস্তায় গিয়ে দলে যোগ দিলেন। বাকী ছেলেরা অন্য বাড়ির লোকেদের রাখী পরাচ্ছিল, তারাও কাজ সেরে ফেলেছে ততক্ষণে। আবার সেই বজ্র নির্ঘোষ—'বন্দে মাতরম্!'

রাসমণির চোখে জল এসেছিল। ঐ সুন্দর ছেলেটি নিজে এসে তাঁর হাতে রাখী পরিয়ে দিয়েছে। হেসে কথা কয়েছে, নমস্কার করেছে। তিনি যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছেন। তাঁর যদি অমনি একটি ছেলে থাকত আজ! মেয়েরা শুধুই বোঝা। আজ পরপারে যাবার পথেও পায়ে বেড়ির মত এঁটে ধরেছে তাদের

দুর্ভাগ্য নিয়ে। মরেও শান্তি নেই তাঁর।

উদ্‌গত দীর্ঘনিশ্বাস দমন ক'রে আবারও সদরের চৌকাঠে বসে পড়েন তিনি।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

এক

ঐন্দ্রিলার বিয়েটা একরকম হঠাৎই ঠিক হয়ে গেল। শ্যামার জ্বর উপলক্ষে ঐন্দ্রিলা পদ্মগ্রামে এসেছিল দিন সাতেকের জন্যে। আড়গোড়ের মাধব ঘোষাল শিবপুর থেকে ফিরছিলেন হাঁটাপথে। ঐ সময়ে দেখা। দুপুর রোদে অতখানি পথ হেঁটে তৃষ্ণা পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর পিপাসা-বোধ প্রবল হওয়াতে যে তাঁর অক্ষয়বাবুর বাড়ির কথাটা মনে পড়বে এতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে? মাধব ঘোষাল আর অক্ষয়বাবু আগে একই অফিসে কাজ করতেন। তারপর এখানকার রেল অফিসটা নতুন খুলতে মাধব ঘোষাল এসে ঢুকলেন, অক্ষয়বাবু আর এলেন না। কারণ তখনই তাঁর আর বড়বাবুর মধ্যে দুটি মাত্র বাবুর ব্যবধান ছিল।

সেই থেকে অক্ষয়বাবুর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি। তবু আসা-যাওয়া আছে—ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষে ত বটেই, এমনিও দু-একবার এসেছেন। বাড়িটা তাঁর মনে ছিল। অচেনা লোকের বাড়ি জল চেয়ে খাওয়ার চেয়ে চেনা লোকের বাড়ি গিয়ে ওঠাই ভাল। চাই কি যদি রাঁধুনী বামুন থাকে ত দুটো ভাত পাওয়াও বিচিত্র নয়। যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে একটু দেরি হয়ে গেছে। এতটা দেরি হবে ভাবেন নি। এখনও আড়গোড়ে পাকা আড়াই ক্রোশ রাস্তা। ক্লান্ত ও অভুক্ত অবস্থায় হাঁটতে বেলা গড়িয়ে যাবে। অনেক ভেবেচিন্তে মাধববাবু অক্ষয়বাবুর বাড়ির পথই ধরলেন।

চেনা হ'লেও গত পাঁচ-ছ বছর এ পথে আসেন নি মাধব ঘোষাল। পথটা ঠিক করতে না পেরে ঈষৎ বেঁকে খিড়কীর দিকের বাগানে ঢুকে পড়লেন। আর করমচা গাছের ঝোপটা ছাড়াতেই তাঁর নজরে পড়ল ঐ অপরূপ দৃশ্য।

নির্জন পুকুর-ঘাটের বাঁধানো পৈঠেতে বসে আছে একটি বছর দশ-এগারোর মেয়ে। পরনে ছোট খয়েরী রঙের শাড়ি, তাতে ওর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ যেন আরও খুলেছে। একমাথা কালো চুল। চোখ দুটি খুবই ডাগর কিন্তু বেমানান নয়, চোখের পাতা এত দীর্ঘ যে ওর নিটোল সুগৌর গাল দুটির অনেকখানি পর্যন্ত তার ছায়া পড়েছে—এখান থেকেই সে ছায়া বোঝা যায়। নাকটি তেমন টিকোলো নয় কিন্তু তাতেই যেন আরও ভাল দেখাচ্ছে। বিস্ফারিত আয়ত চোখে ও অমন ফুটফুটে গৌর

বর্ণে টিকোলো নাক হয়ত তেমন মানাত না। পাশেই একরাশ বাসন রয়েছে জলে ভেজানো, বোধ করি বাসন ক-খানা মাজতেই এসেছে, কিন্তু আপাতত সে রকম কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পা দুটি জলে ডুবিয়ে বসে বসে অন্যমনস্ক ভাবে এক হাতে একটা ডাঁসা পেয়ারা খাচ্ছে মেয়েটা আর এক হাতে অলস ভাবে একটা শুকনো আমড়া-পাতা নাড়াচাড়া করছে। এত স্থির হয়ে বসে আছে যে হাত নাড়লেও পা নড়ছে না—ফলে পুকুরের জলে ঈষৎ কাঁপন মাত্র আছে, আর আছে তে-চোকো মাছের সূক্ষ্ম নিঃশ্বাসের বুদ্বুদ। তাতে পুকুরের কালো জলে এমন কোন তরঙ্গ ওঠে না যে ছবিটা নষ্ট হবে। বড় বিলিতী আমড়া গাছটার ফাঁক দিয়ে আধোছায়া-মাখা রোদ এসে পড়েছে ওর মুখে-চোখে—সেই ছবি সবটাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে পুকুরের স্থির জলের আয়নায়। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বাতাস নেই কোথাও, গাছের পাতা কখনও কখনও কাঁপছে মাত্র, তাতে যেটুকু আলোর খেলা চলে—সেটুকুরর ছবিও ধরা পড়ছে পুকুরের ছায়াতে।

অপূর্ব সে ছবি। মাধব ঘোষাল কবি নন—মাইকেল আর হেম বাঁড়ুয্যের নাম হয়ত শুনেছেন—কিন্তু তাঁদের কাব্য-কালিমার এতটুকু ছোঁয়া লাগে নি মনে। তবু তিনি চোখ ফেরাতে পারলেন না। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন সে ছবি।

পেয়ারা খেতে খেতে মেয়েটি একসময় পেয়ারাসুদ্ধ হাত নামিয়ে চুপ ক'রে কি ভাবতে লাগল। তাতে আরও সুন্দর হয়ে উঠল ছবিটি। মাধব ঘোষালও তৃষ্ণা ভুলে দাঁড়িয়ে রইলেন। জীবনে যার কখনও প্রকৃতির দিকে সৌন্দর্যের দিকে তাকাবার অবসর হয় না—প্রকৃতি তার ওপর এমনি ক'রেই শোধ নেন, একএকটি দুর্লভ মুহূর্তে অকস্মাৎ, বিস্মিত স্তম্ভিত ক'রে দেন কর্মব্যস্ত বিষয়ী মানুষকে। তার চোখে ও মনে বুলিয়ে দেন মায়ার তুলি। মাধব ঘোষালও এই মুহূর্তে শুধু যে তাঁর পিপাসার কথা ভুললেন তাই নয়—ভুলে গেলেন তাঁর জরুরী মকদ্দমার কথা, ভুলে গেলেন যে তাঁর বুড়ো ফজলি আমের গাছটা (গত চার বছর একটাও ফল দেয় নি বউল পর্যন্ত আসে না কি লাভ ও গাছ রেখে?) আজ কিনতে আসবে কথা আছে; তার দরদস্তর করা দরকার, বায়নার টাকাটাও যদি গিন্নীর আঁচলে আটক পড়ে ত বেহাত হয়ে যাবে; ভুলে গেলেন যে পগার-ধারের বাঁশঝাড়টা নিয়ে গত ছ মাস যাবৎ মল্লিকদের সঙ্গে যে বিবাদ চলছে, আজই তার আপস হবার কথা। মধ্যস্থ রিদয় (হৃদয়) বাবুর সঙ্গে দুপুরেই একটু গোপন আলাপ সেরে নিতে পারলে মীমাংসাটা তাঁর দিক ঘেঁষেই হ'তে পারে। তিনি সব কিছু ভুলে চেয়ে রইলেন এই ছবির দিকে—এবং বুঝতেও পারলেন না যে কোন দেবশিল্পীর

আঁকা এক অপরূপ ছবি দেখে তিনি সৌন্দর্য-মুগ্ধ হয়ে এমন ক'রে তাকিয়ে আছেন। বুঝতে পারলে নিজের এই কবিসুলভ দুর্বলতায় লজ্জিত হতেন কিনা—কে বলতে পারে!

কতক্ষণ তিনি এভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং থাকতেন কে জানে, হঠাৎ সেই মেয়েটির চোখ পড়ল ওঁর দিকে এবং কচি মিষ্টি গলায় অত্যন্ত পাকা ও কটু ভঙ্গীতে ব'লে উঠল সে, 'কে রে অলপ্পেয়ে মিন্‌সে, চোখের মাথা খেয়ে চেয়ে আছে অমন ক'রে? নিজের ঘরে গিয়ে চেয়ে থাকতে পারে না?'

স্বপ্নভঙ্গ হ'ল বৈকি!

তবু মাধব ঘোষালের তখনও মোহ কাটে নি সম্পূর্ণ। তিনি দু পা এগিয়ে এসে মিষ্টি ক'রেই বললেন, 'খুকী মা—অক্ষয়বাবুর বাড়ি কি এইটে? আমি তাঁকেই খুঁজছি!'

'খুকী মা' কিন্তু কিছুমাত্র নরম হ'ল না তাতে। তেমনি ঝাঁজের সঙ্গেই বললে, 'আমি তাঁকেই খুঁজছি! তা তাঁর কি সদর বাড়ি নেই? ও ধারের পথ ছেড়ে খিড়কীর বাগানে এসে অমন ক'রে দাঁড়িয়ে না থাকলে চলে না!'

'কার সঙ্গে অমন ক'রে ঝগড়া কচ্ছিস লা খেঁদি?'

মঙ্গলা ঠাকরুন ভাত খেয়ে উঠে আঁচাতে আসছিলেন, কাছাকাছি আসতেই তাঁর নজর পড়ল মাধববাবুর দিকে, তাড়াতাড়ি টানাটানি ক'রে মাথায় কাপড়টা দিতে দিতে ফিসফিসিয়ে বললেন 'ওমা, এ যে আমাদের ফাদববাবু!...তুই ওঁর সঙ্গে অমন গাছ-কোমর বেঁধে ঝগড়া করছিলি?'

মাধব বুঝি ওঁর মামাতো জ্যাঠশ্বশুরের নাম।

এতক্ষণে ঐন্দ্রিলাও একটু অপ্রস্তুত হয়েছে। তাড়াতাড়ি সে জল থেকে উঠে এসে ওপরের চাতালে দাঁড়াল। মনে পড়ে গেল যে সত্যিই কাপড়খানা তার গাছ-কোমর ক'রে বাঁধা। অপ্রতিভ ভাবে কোমরের বাঁধনটা খুলতে খুলতে বলল, 'ওমা—আমি যে—আমি ভাবলুম—কে না কে একটা মিন্‌সে—'

আর একটু এগিয়ে এসে মাধব ঘোষাল প্রশ্ন করলেন, 'বৌ-ঠাকরুন, অক্ষয় বাড়ি আছে?'

বেশ শ্রুতিগোচর ভাবেই মঙ্গলা উত্তর দিলেন, 'বল্ না খেঁদি—ঐ বাইরের রোয়াকে বসে তামাক খাচ্ছেন!'

আর কথা না বাড়িয়ে মাধব ঘোষাল এগিয়ে গেলেন।

দুই

তবু তখনও মেয়েটি সম্বন্ধে কোন আশাই পোষণ করেন নি মাধববাবু। কায়স্থর ঘরের মেয়ে—ভাল লেগেছে এই পর্যন্ত, তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব তা কল্পনাও করেন নি।

কিন্তু প্রাথমিক কুশল-বিনিময়ের পরই প্রথম প্রশ্ন করলেন তিনি ওর সম্বন্ধেই, 'হ্যাঁ হে অক্ষয়, পুকুর-ঘাটে দিব্যি ফুটফুটে একটি মেয়ে দেখলুম, কে হে? তোমার কেউ ভাগ্নী কি নাতনী—'

খোঁচাটুকু নীরবে হজম ক'রে অক্ষয় হাতের হুঁকো নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ফুটফুটে মেয়ে? আমার পুকুর-ঘাটে? সে আবার কি?'

তখন মোটামুটি একটা বর্ণনা দিলেন মাধব ঘোষাল; শুনতে শুনতেই অক্ষয় বলে উঠলেন, 'ও হো হো—আর বলতে হবে না। ও হ্যাঁ—বামুন মেয়ের মেজ মেয়েটা এসে আছে বটে ক-দিন। ও ত এখানে থাকে না, ওর কথাটা মনেই ছিল না!'

'বামুন মেয়ের মেয়ে? সে কে, তোমার রাঁধুনী?'

'না না—তার চেয়ে একটু উঁচু। আমাদের নিত্যসেবা করার জন্যে একঘর বামুন এনে বসানো হয়েছিল। তা সে বেটা ত চামারের অগ্রগণ্য—কোথায় নেশা-ভাঙ্ ক'রে পড়ে থাকে। ঐ মেয়েটির দাদাই এখন পুজোপাট সব করে।'

'ও পুজুরী বামুন? তা কি গোত্তর ওদের?'

'কেন হে? ছেলের বিয়ে দেবে নাকি, গাঁই-গোত্তর সব খবর নিচ্ছ?

'দিতেও ত পারি। মেয়েটি দেখতে বেশ।'

আবারও হুঁকো নামালেন অক্ষয়। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তোমাদের ত বাৎস্য গোত্তর? গোত্তরে আটকাবে না—তবে দেবে ওর সঙ্গে ছেলের বিয়ে? বাপটা বড় ছোট, বড় নীচ। আর ছেলেমেয়েগুলো—অবিশ্যি অভাবের সংসার ব'লেই—বড় চোর। আমার বাগানে ফল-ফুলুরি হবার যো নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে আর বেচে আসে। মেয়েটাও বড় বাচাল, ঝগড়াটি।...তবে হ্যাঁ—ওর মা বেশ ভদ্র বংশের মেয়ে বলেই মনে হয়। লেখাপড়াও জানেন -আমাদের এদিক-ঘরে যা একেবারে দুর্লভ।'

'তাহ'লে এমন পাত্তরের হাতে পড়ল কি ক'রে?'

'তখন নাকি ওদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। ঘরবাড়ি জমি-জমা—সম্পত্তি ছিল বিস্তর। গুরুবংশ ওরা। সব খুইয়েছে এরা দু'ভাই। বামুনের ঘরের গরু

হ'লে যা হয়—একেবারে নিরেট মুখ্যু ত!'

জলখাবার ইতিমধ্যে এসে পৌঁচেছে। তা ছাড়াও—চোখে চোখে মঙ্গলার সঙ্গে অক্ষয়বাবুর কথাবার্তা হয়ে গেছে। অর্থাৎ ভাতের ব্যবস্থা হয় না? মঙ্গলা ঘাড় নেড়ে জানিয়েছেন যে সে কথা তিনি ভেবেছেন—হবে।

বামুন-মেয়ের দুদিন জ্বর। মঙ্গলাদের হেঁশেলে ভাত হবে না। লুচি ভেজে দেওয়া যায়—ঘরে ময়দা আছে। কিন্তু এই দুপুরে লুচি?

তাছাড়া ওঁদের কথার টুকরো দু-একটা মঙ্গলার কানে এসে পৌঁচেছে। মতলব গেছে মাথায়। আনন্দে উত্তেজনায় তাঁর চোখে জলে উঠেছে আগুন। এই শ্রেণীর ষড়যন্ত্রে মঙ্গলার বড় উৎসাহ।

উনি হাঁপাতে হাঁপাতে শ্যামার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে সে মেঝেতে আঁচলটা বিছিয়ে শুয়েছে।

'বাম্‌নি বাম্‌নি—শীগ্‌গির ওঠ্‌! দে দিকি পাতার উনুনে একগাল আলোচাল চড়িয়ে। দুটো আলুভাতে দিয়ে ভাতটা চাপিয়ে দে—আমার হেঁশেলে আ-সগ্‌ড়ি ডাল-চচ্চড়ি আছে, এনে দিচ্ছি। আর একটু দুধ দিই—তাতেই হয়ে যাবে। নে নে—হাঁ ক'রে শুয়ে থাকিস নি, ওঠ্‌।'

'তা ত উঠছি। কিন্তু মা, আমার হেঁশেলে খাবে—বামুন বুঝি?'

'ওলো হ্যাঁ। নেকী! বামুন বামুন—তোদের পালটি ঘর! ঘোষাল বামুন—তবে বামুন ত? তোরাই বা কি এমন নৈকুষ্যি কুলীন? পুজুরী বামুন আবার বামুন! নে নে—তাকিয়ে থাকিস নি অমন জড় ভরত হয়ে। ওর বড় ছেলের বে এখনও হয় নি বোধ হয়। হ'লেও আরো দুটো বাকী। সব রেল অফিসে কাজ করে। তোর মেয়ে খেঁদিকে দেখেছে—দেখে পছন্দও হয়েছে। সেই জন্যেই ত তোর খপ্পরে এনে ফেলছি। গ্যাখ যদি খেলিয়ে তুলতে পারিস! আমার হেঁশেল থেকে ত ভাত দিতে পারবো না—বামুন ঠাকুরুনের জ্বর—আমাদের ছোঁয়া নেপায় রান্না হয়েছে। এ এক রকম শাপে বর হ'ল, কী বলিস!'

মঙ্গলা ভারি খুশী হয়ে উঠেছেন ততক্ষণে। এ এক রকম খেলা। বৈচিত্র্য-হীন জীবনে বর্ণাঢ্য বিচিত্রতা। তিনি নিজেই বিপুল দেহ নেড়ে যতটা পারেন সাহায্য করেন। পাতা এগিয়ে দেন উনুনে গোছা গোছা ক'রে।

শ্যামাও ইঙ্গিতটা বুঝে ফেলেছে বৈকি।

শুধু আলুভাতেই নয়—কদিন আগে হেম সিধে পেয়েছিল কোথায়, তাতে একটু গাওয়া ঘি পাওয়া গিয়েছিল, পাঁপরও ছিল দুখানা। এ খাবার এদেশে দুর্লভ বলে সযত্নে তুলে রেখেছিল শ্যামা, জামাই আসার অপেক্ষায়। ডাল আর

একতাল চচ্চড়ি মঙ্গলা এনে দিয়েছিলেন ওঁদের হেঁশেল থেকে ; শ্যামা তাড়াতাড়ি ক'রে দিলে বড়িভাজা, পাঁপরভাজা, বড়ির ঝাল। গরম ভাতে গাওয়া ঘি ঢেলে সযত্নে ঠাঁই ক'রে খেতে দিলে শ্যামা। ইতিমধ্যে মঙ্গলা ঠাকরুন ঐন্দ্রিলাকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়েছেন। মাধব ঘোষালের সামনে শ্যামা বেরোবে না—যা দরকার হবে ঐন্দ্রিলাই দেবে।

এদের রান্নাঘরের দাওয়ায় খেতে বসে একটু অবাকই হয়ে গেলেন মাধব ঘোষাল। বাটির মত ছোট ক'রে ভাত বাড়া, তার ওপর ছোট একটি বাটিতে গাওয়া ঘি—ভাতের চুড়োর ওপর বসানো, ভাতে ভাজা তরকারি নিখুঁত পরিপাটির সঙ্গে সাজানো, থালারই এক কোণে গোল ক'রে কলাপাতা কেটে তাতে নুন-লেবু, সবটার ভেতরই যেন একটা নাগরিক পরিপাট্য।

পরিতৃপ্তির সঙ্গেই খেলেন। ক্ষুধার অন্ন বলেই নয়, আয়োজনও ভাল। মঙ্গলা একটু দুধ এনে দিয়েছিলেন। সেই দুধের বাটিতে একটা পাকা কলা ও গুড় দিয়ে ঐন্দ্রিলা এনে পাতার কাছে নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করলে, 'আর দুটি ভাত এনে দিই আপনাকে ?'

তার সেই 'সবিনয়' ভঙ্গিমা, শুভ্র গৌর গণ্ডে লজ্জারক্ত লালিমা—সবটা জড়িয়ে বড় ভাল লাগল মাধববাবুর। তিনি বললেন, 'তা আনো মা। খুব দুটিখানি!'

তারপর ভাত খাওয়া শেষ হলে আঁচিয়ে উঠে পান নেবার সময় ওর গালটি তুলে ধরে মাধববাবু প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আমাদের বাড়ি যাবে মা-লক্ষ্মী ?'

সপ্রতিভ ঐন্দ্রিলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, 'কেন যাবো না ? আপনিই বললেই যাবো! কিন্তু আপনিও আবার আসবেন—মা বলে দিলেন। আজ খাওয়ার বড় কষ্ট হ'ল, আর একদিন খবর দিয়ে আসবেন। কেমন ?'

একটু মুচকি হেসে মাধব বললেন, 'আসব বৈ কি। ঘন-ঘনই আসব হয়ত।'

অক্ষয়বাবুর ঘরে গিয়ে বসে কিছুক্ষণ নীরবে তামাক খেয়ে মাধববাবু বললেন, 'আমি মন স্থির ক'রেই ফেললাম। তুমি ভাই ওর মার কাছে কথাটা পাড়ো!'

'কার সঙ্গে ?'

'আমার বড়ো ছেলে—হরিনাথ। তার ত এখনো বিয়ে হয় নি।'

'তার বয়স কত হ'ল ? মানাবে ? এর বড় জোর দশ।'

'বয়স ওর একটু বেশীই হয়েছে। ঠিক মনে নেই আমার, তবে তেইশ-চব্বিশের কম না। হয়ত পঁচিশ হতে পারে, তা আর কি হবে! লোকে ত দোজবরে ওর চেয়ে বেশী বয়সে বিয়ে করছে। ন দশ বছরের মেয়ে! আমাদের

পাড়ার গোকুল মুখুজ্জে চল্লিশ বছর বয়সে যে সাত বছরের মেয়ে বিয়ে করে বসল। না—না—তাতে আটকাবে না।'

অক্ষয় বললেন, 'কিন্তু পয়সাকড়ি ঢুঁ-ঢুঁ—তা বলে দিচ্ছি! শুধু ভাত মুখে উঠবে ত? বোঠানের?'

'হ্যাঁ, উনি একটু গোলমাল করবেন বটে। তবে আমি মন স্থির করে ফেলেছি। আমি ত এই, তায় আমার পরিবার একেবারে আবলুস—ছেলেমেয়ে হয়েছে, চাওয়া যায় না। আমি ভাই একটু পনটাই বদলাতে চাই।'

তারপরে, যেন মানসচক্ষে গৃহিণীর উগ্র মূর্তিটা একবার দেখে নিয়েই, কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বললেন, 'কি আর হবে—না হয় মাগী দশবাই-চণ্ডী হয়ে খানিক নাচবে ধেই ধেই ক'রে! আর ত কিছু করতে পারবে না। তুমি ত্যাখো কথাটা পেড়ে।'

হুঁকো নামিয়ে রেখে মাধব ঘোষাল আবার আড়গোড়ের পথ ধরলেন।

তিন

মঙ্গলা ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিলেন।

'দাঁড়া-হরির লুট দে লো বামুনি! হ্যাঁ—জোর বরাত বটে তোর মেয়ের। পাত্তর পক্ষ নিজে থেকে সেধে কথা পাড়ে এমন ত কখনও শুনি নি। ইস্—আবার নিজেই স্বীকার হয়ে গেল যে পয়সার কামড় করবে না!'

আনন্দের প্রথম আলোড়নটা থেমে যেতে শ্যামা ছেলের খবর নিতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মঙ্গলা জানেন না কিছুই। অক্ষয়বাবুকে বার বার জিজ্ঞাসা ক'রে আসতে হ'ল। অক্ষয়বাবুও বিশেষ কিছু জানেন না। শুধু জানেন যে, ওদের ঢের বিষয়সম্পত্তি আছে। জমি থেকে বছরের খোয়ারী ধানটা উঠে যায়। চার ভাই ছেলেরা—এইটি বড়। ইংরেজী ইস্কুলেও নাকি পড়েছিল ক-বছর। রেল অফিসে কাজ করে। সব দিক দিয়েই সুপাত্র। দোষের মধ্যে বয়স একটু বেশী আর রং নাকি কুচকুচে কালো।

'কালো! বয়স বেশীর জন্যে ভাবি না মা—মেয়ের আমার ত দেখছেন কালোতে কি ঘেন্না! শেষে জামাইয়ের সামনে বাঁকা বাঁকা কথা বলবে না ত?

'ওলো থাম্ দিকি। অমন কত ঘেন্না দেখলুম! রাখ্। সব ঠিক হয়ে যাবে। পুরুষের আবার রূপ নিয়ে ব্যাখ্যানা! নে, কলকাতায় চিঠি লেখ্। ত্যাখ্ তোর মা-মাগীর কাছ থেকে কিছু বাগাতে পারিস্ কিনা!'

শ্যামা সেই উপদেশই শোনে। রাত্রে পিদিমের আলোতে বসে দীর্ঘ পত্র লেখে উমাকে। মার শরীর খারাপ—তাছাড়া তিনি আজকাল যেন কি রকম উদাসীন

হয়ে পড়েছেন ! যা করবে উমাই ।

পাত্রের মোটামুটি বিবরণ দিয়ে, সেদিনের ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত ক'রে শ্যামা শেষ অনুচ্ছেদ লিখলে,

"এমন অযাচিত ভাবে পাত্রপক্ষ আসিয়া পড়ায় এবং নিজ হইতে প্রস্তাব করায় ঘটনাটাকে প্রজাপতির নির্বন্ধ বলিয়াই বোধ হইতেছে। এ প্রস্তাব আপত্তি করারও কিছু দেখিতেছি না। আমার মত ভিখারীর মেয়ের আর ইহা অপেক্ষা ভাল সম্বন্ধ কি হইতে পারে ? আশা করি তুমি বা মা-ও এ পাত্র পছন্দ করিবে না। একমাত্র যা পাত্রের গায়ের রং শ্যামবর্ণ। তা কি আর সব মনের মত হয় ? তবে শুনিতেছি স্বাস্থ্য খুব ভাল ।

"এক্ষণে কথা হইতেছে, এ মেয়ে তোমারই। তোমার অমতে কিছু হইতে পারে না। তোমার নিকট হইতে কথা না পাইলে কোন চেষ্টা করিব না। মার শরীর খারাপ—আমার ইচ্ছা বিবাহ কলিকাতার বাড়ি হইতেই দিই। তাহা না হইলে মা কোন নাতি-নাতনীর বিবাহ দেখিতে পাইবেন না । আশা করি ইহাতে তোমার কোন আপত্তি হইবে না।"

অনেক মুন্সিয়ানা ক'রে চিঠিটা লিখলে শ্যামা। দেনা-পাওনার কথা একবারও উল্লেখ করলে না। কলকাতার বাড়িতে বিয়ে দিলে সবই ওদের ঘাড়ে পড়বে—তখন কি আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারবে ! শ্যামা খামখানা মুড়তে মুড়তে আপন মনেই হেসে উঠল।

চিঠিটা পড়ে উমাও হাসল অনেকক্ষণ ধরে। শ্যামার চালাকি কি আজও সে ধরতে পারবে না—শ্যামা এতই বোকা ভাবে নাকি ওকে ? আশ্চর্য !

রাসমণিও চিঠিখানা পড়লেন। ঐন্দ্রিলার ওপর এই ক'বছরে ওঁরও একটা মায়া পড়ে গিয়েছে। মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হন তিনি।

সেদিন আর কিছু বললেন না। পরের দিন উমা যখন এসে প্রশ্ন করলে, 'তাহলে ছোড়দিকে কী লিখব মা ?' তখন একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমি পঞ্চাশটা টাকা দেব, আর আমার কানের কেরাপাত জোড়া। তবে ওসব ঝঞ্চাট এখানে হবে না, তাই লিখে দাও।'

উমা এই প্রস্তাব জানিয়ে নিজেরটাও জুড়ে দিলে। তার হাতে নিজস্ব পনরো-ষোল টাকা আছে, ভাল শাড়ি যেন সেই টাকায় একটা কিনে দেয় হেম। মার শরীর খারাপ, তিনি যেতে পারবেন না। এখানে ত বিয়ে দেওয়া অসম্ভব। চেঁচা-

মেচি গোলমাল রাসমণি একদম সহ্য করতে পারেন না। সুতরাং তাদের বাদ দিয়েই যেন শ্যামা মেয়ের বিয়ের আয়োজন করে। বরং যদি মেয়ে-জামাই একদিন আসে ত খুব ভাল হয়—যথাসাধ্য আদর-যত্ন সে করবে। আর তাহলে রাসমণিও নাতজামাই দেখতে পাবেন।

শ্যামা এই কঠিন চিঠির জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে আশা করেছিল ঢের—তার কিছুই পেলে না। তবে পড়ে-পাওয়া চোদ্দআনাই লাভ! মঙ্গলা কিছু ধার দেবেন হেমও তার যজমান বাড়ি থেকে চেয়ে-চিন্তে কিছু আনতে পারবে। হয়েই যাবে একরকম ক'রে।

কিছু দিতে পারবে না বলেও একেবারে অব্যাহতি পায় নি শ্যামা। শাশুড়ী বেঁচে আছেন, খুব বেশী কষাকষি করতে গেলে হয়ত বিগড়ে যাবেন। শ্বশুরও তখন পিছিয়ে যাবেন হয়ত। একশ এক টাকা নগদ। আট গাছা চুড়ি। জামাইয়ের আংটি, চেলির জোড়। দান সামিগ্‌গির ত আছেই। সব জড়িয়ে অনেক পড়ে যাবে।

কিন্তু উপায় কি?

শ্যামা একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখলে।

ঐন্দ্রিলা বিয়ের কথার পর কলকাতা চলে এসেছিল, আশীর্বাদ উপলক্ষে নিয়ে যেতে হবে। শ্যামা নিজে নিতে এল ওকে। কলকাতা থেকে কিছু বাজার ক'রে নিয়ে যাবে হেম, সেই সঙ্গেই ওরা ফিরবে।

উমা মৃদু অনুযোগ করলে, 'এত কাণ্ড ক'রে তোমার আসবার দরকার কি ছিল ছোড়দি!'

'এ ত আমি আসিই রে। বিয়ের আগে তোদের সঙ্গে একবার দেখা করব না তাই বলে?'

পথশ্রম কাটিয়ে আহারাদি ক'রে শ্যামা মার কাছে গিয়ে বসল। রাসমণি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন একেবারে। সেদিন জ্বরটা ছিল না, তবু শুয়েই ছিলেন। বিছানারই এক পাশে বসে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে পায়ে হাত বুলোবার পর শ্যামা বললে, 'মা, আপনাকে যদি একখানা গাড়ি ক'রে নিয়ে যাই এখান থেকে—সোজা! আপনি যেতে পারেন না? খেঁদির বিয়েটা দেখতেন!'

রাসমণি চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন, সেই ভাবেই রইলেন। সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'না।'

'কেন মা?' শ্যামা আবার প্রশ্ন করে।

'ইচ্ছে নেই।' সংক্ষিপ্ত উত্তর।

একটু পরে চোখ খুলে বললেন, 'জামাই-বাড়ি আমি যাব না—তা ত ভালো ক'রেই জানো মা, আমার শরীরও বইবে না। সেজন্যে তুমি আসোও নি। মতলবটা কি খুলে বলো দিকি? আমার পেটে হয়েছ মা, আমি তোমার পেটে হই নি। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।'

শ্যামা একটু ক্ষুন্নই হ'ল। সবটাই কি সত্যি-সত্যিই তার স্বার্থ?

হয়ত উমাই দিনরাত ওঁকে বোঝায় যে ছোড়দির শুধু স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা নেই।

বেশ একটা আহত ভাবই দেখাতে পারত শ্যামা, বক্তব্যটা মুহূর্ত-কয়েকের মধ্যেই মনে মনে গুছিয়ে এনেছিল, কিন্তু সব মাটি ক'রে দিল হতভাগা মেয়েটা। এখানে আসবার আগে মঙ্গলার সঙ্গে শ্যামার কথাবার্তা সে কিছু কিছু শুনেছিল। সে কুট ক'রে বলে বসল, 'মা কেন এসেছে জানেন দিদিমা, দানের বাসনগুলো বাগাতে! যদি পাওয়া যায়!'

'তুই ছোট মুখে বড় কথা বলিস কেন বল্ ত—সব তাইতে! যা, সুমুখ থেকে বেরিয়ে যা বলছি। হতচ্ছাড়ী বাঁদরী মেয়ে কোথাকার! আমি ওর ইয়ার!'

তারপর একটু থেমে ওপাশে দেওয়ালটার দিকে চেয়ে বললে, 'সত্যি কথাই ত, চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে ক'রেই যখন আমাকে বিয়ে দিতে হবে তখন আর চক্ষুলজ্জা করলে চলবে কেন?...বাসন কখানা যদি দিতে পারেন ত সত্যিই উবগার হয়!'

রাসমণি আবার সংক্ষেপে বললেন, 'সে এখন হবে না বাছা'।

শ্যামার ধৈর্যের বাঁধ এবার ভাঙল, বললে, 'আপনার এক সিন্দুক বোঝাই বাসন, আমি কি তা থেকে দুখানা পেতে পারি না?...আমারও ত ভাগ একটা আছে!'

রাসমণি এবার পূর্ণদৃষ্টিতে চাইলেন ওর দিকে, কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে কিসের ভাগ লা তোর? তাছাড়া আমি এখনও কদিন বাঁচব তার ঠিক কি? হয়ত এরপর ঐ বাসন বেচেই খেতে হবে। মানুষের জীবনমরণ কি বলা যায় কিছু! না, ও আমি এখন হাতছাড়া করতে পারব না।'

শ্যামা মাকে চিনত। ওঁর এ কণ্ঠস্বরের পর আর কিছু বলতে সাহস হ'ল না। ক্ষুন্ন মনেই নগদ পঞ্চাশটা টাকা আর কেরাপাত জোড়া আঁচলে বাঁধল। কেবল অব্যাহতি পেলে না উমা। শুধু পনেরোটা টাকা দেওয়া চলল না। টুকিটাকি দু-একটা জিনিস কিনে দিতে হ'ল—ছাত্রীদের বাড়ি থেকে আরও দু চার টাকা আগাম চেয়ে এনে দিতে হ'ল।

ঐন্দ্রিলা আশা করেছিল যে উমা শেষ অবধি যেতে রাজী হবে। উমাকে এই ক'বছরে সে একটু ভালই বেসেছিল। যাবার সময় বললে, 'তুমি সত্যিই

যাবে না নাকি ছোট মাসি? ওমা, তবে কি হবে!'

শ্যামাও বললে, 'চ না রে উমি, তোরই ত মেয়ের বিয়ে।'

উমা মাথা নিচু ক'রে ধীরে ধীরে বললে, 'আমার ছায়া যেন কোন বিয়েতে না পড়ে ছোড়দি—এ ত আপনার জন! অতি বড় শত্রুও বিয়ের সময় যেন আমার মুখ না দেখে।'

শ্যামা ঠিক এ উত্তরটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এর পর কোন অনুরোধ করতে তারও মুখে বাধল। নীরবে নতমুখে খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেমে গেল।

কী হ'ল ঐন্দ্রিলা তা বুঝল না কিন্তু উমার কণ্ঠস্বরে অকারণেই তারও বুকটা উদ্বেল হয়ে দুই চোখে জল ভরে এল। মাসির সব কথা বোঝার মত বয়স তার হয় নি, সবটা শোনেও নি সে। শুধু এইটুকু বুঝলে যে এমন একটা শোচনীয় ব্যর্থতার ইতিহাস আছে ওর—এই বাইরের হাসিখুশি প্রতিদিনকার আচরণের আড়ালে—যার এক ভগ্নাংশও কোন মেয়ের জীবন থেকে সুখ-সৌভাগ্য হরণ করার পক্ষে যথেষ্ট। তাই মাসি তার দুর্ভাগ্যের ছায়া পর্যন্ত ফেলতে চায় না ওর বিবাহে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিজের ভাবী জীবন সম্বন্ধে কেমন এক ধরনের নাম-না-জানা আশঙ্কা অনুভব লাগল সে নিজের অজ্ঞাতেই। অতটা সে বুঝল না—শুধু মনটা তার ভারী হয়ে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

চার

বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই শ্যামা একদিন মেয়ে জামাই নিয়ে এসে হাজির হ'ল। মহার বিয়ের পর এঁরা অভয়কে নিমন্ত্রণ করতে দু-একদিন সে এসেছিল বটে কিন্তু সে একাই এসেছিল এমন ঘটা ক'রে মেয়ে জামাই নিয়ে শ্যামা কখনও আসে নি। হঠাৎ এতখানি মনোযোগের কারণটা বুঝতে না পেরে উমা অনেক কিছুই আন্দাজ করতে চেষ্টা করে।

শ্যামার অবশ্য একটা কৈফিয়ত তৈরিই ছিল, 'মায়ের যে অবস্থা দেখে গেলুম, খেঁদির বর যে দেখাতে পারব এ আশা আর ছিল না। তাড়াতাড়ি তাই ছুড়তে-পুড়তে ছুটে এলুম। তা জামাইয়ের আবার ছুটি হবে তবে ত! রবিবারের সঙ্গে আর একটা দিন ছুটি পড়ল এবার, তাই আর দেরি করলুম না।'

ঐন্দ্রিলার বরের দিকে তাকিয়ে উমা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

এ যে শ্যামা-শিবের উল্টোটা! যে মেয়ে কালো হাঁড়িতে খেতে চাইত না,

কালো মাছ পাতে দিলে উঠে চলে যেত—তার এ কি বর হ'ল ?

কুচ্‌কুচে কালো হরিনাথ। এত কালো যে চোখমুখ অন্ধকারে বোঝা কঠিন। কিন্তু স্বাস্থ্যবান ছেলে। তেমনি বিনত ও ভদ্র। কথা বলতেও জানে—অভয়ের মত গম্ভীর স্বল্পভাষী নয়। বেশ হাশি-খুশি স্বভাবের। খানিক কথাবার্তা বলবার পর উমার ভালই লাগল জামাইকে।

শ্যামাও বার বার বলতে লাগল, 'এই-ই বলতে গেলে তোমার আসল শাশুড়ী বাবা, আমি ত মেয়ে পেটে ধরেই খালাস !'

ওর এই অতিশয়োক্তিতে লজ্জা করে উমার। এসব কথার সঙ্গে যে কৌতূহল জড়িয়ে থাকা স্বাভাবিক—কেন উমা বাপের বাড়ি থাকে, কেন ঐন্দ্রিলার বিবাহে যায় নি সে কথা উঠেছে কিনা, হরিনাথ কিছু শুনেছে কিনা কে জানে ! যদি সব শুনে থাকে ত কি লজ্জা !

ছি-ছি ! স্বামী যাকে গ্রহণ করলে না, সে স্ত্রীর কোন ভদ্র সমাজেই বুঝি মুখ দেখানো উচিত নয়।

কিন্তু হরিনাথের কথা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। সে সহজ ভাবেই এটা ওটা গল্প ক'রে যায়। রাসমণির সঙ্গে দু-একটা রসিকতার চেষ্টাও করে। তবে রাসমণির সহজ গাম্ভীর্যে ও নিস্পৃহ নিরাসক্তিতে ধাক্কা খেয়ে সে রসিকতা জমতে পায় না। অবশ্য রাসমণিরও ভাল লাগে হরিনাথকে। তিনি সামনে বসিয়ে ওকে খাওয়ান। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন।

ওদের ঘরবাড়ি পরিবার সম্বন্ধে দু-একটা প্রশ্ন করেন রাসমণি। হরিনাথও বেশ খুঁটিয়ে সব জানায়। বহুক্ষণ ধরে বসে গল্প করে।

বিরাট একান্নবর্তী সংসার ছিল ওদের। এই সবে ওর বাবা ও কাকারা পৃথক হয়েছেন। তবে মামলা-মকদ্দমা কিছু হ'তে দেন নি বাবা। তিনটি সমান ভাগ ক'রে কাকাদের বলেছেন এক একটা ভাগ বেছে নিতে। যে ভাগটা বেঁচেছে সেইটিই উনি নিয়েছেন। তাতে ঠকেন নি মাধব ঘোষাল—বরং কিছু যেন জিতেছেনই। ওরা সকলেই রেলে চাকরি করে। কেবল ছোট ভাইটা স্কুলে পড়ছে। জমি-জমা যা আছে তাতে বছরের ভাত হয়ে যায়। গরু বাছুর আছে। ছাগলও ছিল—গুরুদেব এসে বারণ করেছেন, পূর্বধর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয় ছাগলনাদি মাড়ালে—তাই বাবা বিলিয়ে দিয়েছেন বাধ্য হয়ে। মোটামুটি ওদের সুখের সংসার। এক বুড়ী ঠাকুমা আছেন, বাপের পিসি—তা তিনিও মানুষ ভাল। আপন মনেই বকেন। তবে ঝগড়া-ঝাঁটি বিশেষ করেন না।

অনর্গল বকে যায় হরিনাথ।

ওর বিয়েতে কি কম বাগড়া পড়েছিল? বিয়ে হয়ত বন্ধই হয়ে যেত। বিয়ের ঠিক দুটি দিন আগে ওর এক ভাই বিপিন আসছিল শিবপুর থেকে—পথে এক পুলিস-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়ে। কতকগুলো স্বদেশী ছেলে আসছিল সেই পথে—ওকে পেয়ে ওর সঙ্গে সেধে গল্প করতে শুরু করে। বিপিন অত জানত না হঠাৎ পুলিস ঘেরাও করে। তিন দফা চার্জ তাদের নামে—ডাকাতি, নরহত্যা, আরও একটা কি। সেই কথা শুনে বাড়িতে ত কান্নাকাটি। ওর বাবা ছুটলেন তখনই হাওড়ায়—ভাগ্যিস ওর সঙ্গে বিয়ের বাজার ছিল, আর ডাকাতির দিন সে অফিসে ছিল, সাহেব নিজে লিখে দিলেন, তাই কোনমতে ঘুষ-ঘাস দিয়ে মাধববাবু ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিলেন। তাও ত্রিশ ঘণ্টা হাজতবাস করতে হয়েছিল। বিপিন ছাড়া না পেলে হয়ত এ বিয়েই হ'ত না। ওর মা ছেলেদের বড্ড ভাল-বাসেন কি না—

এমনি কত কথা বলে যায় হরিনাথ। শ্রান্ত অর্ধ-নিমীলিত চোখ দুটি মেলে শোনেন রাসমণি। পৃথিবী থেকে একটা পা বাড়িয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন তিনি—এখন এ সব কথা যেন শিশুকণ্ঠের কাকলি বলে মনে হয়। তবুও মিষ্টি লাগে শুনতে। নবীন জীবন এদের, আশা আকাঙ্ক্ষা আসক্তিতে ভরপুর। আহা বেঁচে থাক, ভোগ করুক জীবনটা। তাঁর রক্ত আছে বলেই ভয় হয়। তাঁর দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের ছোঁয়া না লাগে ওদের জীবনে। প্রসারিত জীবনপথ ওদের সহজ ও ছায়া-শীতল হোক—কাঁটা যা কিছু তাঁদের মা-মেয়ের ভাগ্যেই যেন শেষ হয়ে যায়।

মৃত্যু-স্তিমিত চোখে স্নেহ ও আশীর্বাদ উপচে পড়ে রাসমণির।

পাঁচ

ঐন্দ্রিলাকে নির্জনে পেয়ে প্রশ্ন করে উমা, 'হ্যাঁলো, বর পছন্দ হয়েছে ত? ঠিক ক'রে বল্!'

ঐন্দ্রিলার শুভ্র গাল দুটিতে কে যেন মুঠো ক'রে আবির ছড়িয়ে দেয়। মাথা হেঁট হয়ে আসে লজ্জায়। তবু পাকা বুড়ীর মতই উত্তর দেয়, 'ওমা, তা না হয়ে আর উপায় আছে! মেয়েমানুষের বর আবার পচন্দ অপচন্দ কি বলো? এ ত একজন্মের কথা নয়—কিংবা কাপড় জামাও নয় যে অপচন্দ হ'ল আর ছেড়ে দিলুম। এ যে জন্মান্তরের সম্বন্ধ গো।'

উমার মুখটাও রাঙা হয়ে ওঠে নিমেষে।

জন্মান্তরের সম্বন্ধ—ঠিকই ত! কিন্তু জন্ম-জন্মই কি তাকে এই অভিশাপের

বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়েছে আর হবে? ঐ স্ত্রীলোকটাও কি জন্ম জন্ম ধরে তার স্বামীকে অনুসরণ করছে? নাকি ওরই সম্পর্কটা জন্ম-জন্মের—নেহাত কোন অভিশাপে এবার নিচু ঘরে এসে জন্মেছে কিন্তু ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রেম স্বামীকে টেনে এনেছে নিচে।...তাহ'লে উমার সম্পর্কটা কি ছিল?

অবোধ্য কতকগুলো প্রশ্ন মনের মধ্যে নিমেষে জেগে নিমেষেই মিলিয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে হাসি-হাসি মুখেই প্রশ্ন করে উমা, 'তবে যে বড় কালোকে ঘেন্না করতিস! কত বিচক্ষণা করতিস কালো জিনিস নিয়ে! কইমাছ মাগুরমাছ খেতিস না! এখন এত কালো সহ্য করছিস কি ক'রে?'

হাত-পা নেড়ে ঐন্দ্রিলা বলে, 'সে কেলেঙ্কারের কথা আর ব'লো না ছোট মাসি। কালো শুনেছিলুম এই পর্যন্ত, বে'র সময় ত আর চেয়ে দেখতে পারি নি ভাল ক'রে। ভয়ে লজ্জায় যেন চোখ বুজে আসছিল, চোখ মেলে চাইব কি! শুভদৃষ্টির সময় একবার চোখ চেয়েছিলুম কিন্তু সত্যি বলছি মাসি সে সময় ভাল ক'রে কিচ্ছু নজরে পড়ে নি। হারিকেন লণ্ঠনের আলোতে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা কী যেন একটা, সব তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। পরের দিন কুসুমডিঙের সময় ত আগাগোড়া ঘাড় হেঁট ক'রে বসে। মা শিখিয়ে দিয়েছিল, খবরদার মাথা তুলবি নি, তাহ'লে লোকে বলবে বৌটা বেহায়া। একেবারে ফুলশয্যের রাত্তিরে সময় মিলল। কিন্তু আমি ত সেয়ানা আছি, জানি সবাই আড়ি পাতবে আমি বিছানায় শুয়েই বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমের ভান ক'রে পড়ে রইলুম। ও হরি, ভান ভান—রাতও ত ঢের হয়ে গিছল—আমি সত্যি-সত্যই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি!'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে, বোধ হয় দম নেবার জন্যেই থামল ঐন্দ্রিলা। কিন্তু থামলে উমার চলে না। ঐ বালিকার আনন্দের নেশা লেগেছে তার মনে। সে সাগ্রহে বললে, 'তারপর?'

তারপর—আদ্ধেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেছে, আপনিই কি ক'রে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে চেয়ে দেখি—মাগো মা, বললে বিশ্বাস করবে না ছোট মাসি—ঠিক মনে হ'ল একটা বুনো মোষ শুয়ে আছে আমার পাশে। আমার এমন ভয় হ'ল—আমি একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠেছি। লোকটা কিন্তু খুব চালাক, বুঝলে সেই শব্দে ওরও ঘুম ভেঙে গেছে, আর ও না—উঠেই বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। উঠেই এক লাফে মেঝেতে নেমে, ঘরে যে পিদিম জ্বলছিল সেটা নিভিয়ে দিয়ে ফিরে এসে আমার হাত দুটো ধরে বললে, 'ভয় কি—আমাকে দেখে কি তোমার ভয় করছে? আমি ত বাঘ-ভালুক নই! দ্যাখো—এখন ত আর ভয় করছে না?'

'তখন? তুই কি বললি?' রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে উমা।

'আমার তখন অন্য ভয় হয়েছে। আমি বললুম, 'তুমি যে আলোটা বড় ফস ক'রে নিবিয়ে দিলে, অলুক্ষুণ হবে না? ফুলশয্যের রাত্তিরে আলো যে নিবুতে নেই!'...ও লোকটা তখন আমায় খুব আদর-টাদর ক'রে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, রাত আর কোথায়? ভোর হতে বেশি দেরি নেই। তা বলো ত আবার জেলে দিই। মোদ্দা আমাকে দেখে ভয় পাবে না ত? আমি তখন—'

লজ্জায় রাঙা হয়ে এইখানেই থেমে গেল ঐন্দ্রিলা। উমাও প্রশ্ন করলে না। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে শুধু বললে, 'তা জামাইটি বাপু বেশ, আমার ত খুব পছন্দ হয়েছে—কী বলিস!'

আবার উৎসাহে যেন সোজা হয়ে ওঠে ঐন্দ্রিলা, 'সে কথা একশবার। লোকটা খুব ভাল মাসি, এত ভাল যে বাইরে থেকে দেখে তার কিছুই বোঝা যায় না। ওর আবার বাড্সাই খাবার অব্যেস আছে জানো ত, আমি বলেছিলুম, ওসব ছাইভস্ম খাও কেন—মুখে যে বিচ্ছিরি গন্ধ হয়! তা সেই দিন থেকে রাত্তিরে খাওয়ার পর মোটে খায় না। পাছে মুখে গন্ধ হয়। এদান্তে আবার আমার মায়া হয় বলি—বলি, তা বাপু খাও না, তোমার যখন এত দিনের অব্যেস! তাও খায় না, বলে—আমার অব্যেসটা বড় কথা না তোমার কষ্টটা বড় কথা?'

উমার বুকের কাছে কি একটা নিঃশ্বাস আটকে যায়?

আস্তে আস্তে সে বলে, 'তা তুই ঘর করতে কবে যাবি? এক বছর পর?'

এদিক-ওদিক চেয়ে চুপিচুপি উমার কানের কাছে ফিসফিস ক'রে বলে ঐন্দ্রিলা, 'মা তাই বলছে! আমার কিন্তু বাপু তা পছন্দ নয়। আমি ওকে শিখিয়ে দিয়েছি জোর করতে। ও জেদ করলে মা আর রাখতে পারবে না। 'ধুলো পায়ে দিন' ত করাই আছে। দিদির বেলা হয়েছিল, কায়েত দিদি বললে এবারও করিয়ে রাখতে। আসল কথা কি জানো মাসি—আগে ভাবতুম বুঝি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে এক-দিনও থাকতে পারব না, কিন্তু এখন হয়ে উঠেছে ঠিক উল্‌টো, ওকে ছেড়ে এক দণ্ড এখন আর থাকতে ইচ্ছে করে না। বড্ড মন কেমন করে!'

উমার ম্লান মুখেও কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে, 'ও-টা আবার কে রে?'

হাসি চাপতে চাপতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে ঐন্দ্রিলা উত্তর দেয়, 'কে আবার? ঐ বুনো মোষটা!'

শ্যামাও খুঁজে বেড়ায় কখন উমাকে একটু নির্জনে পাওয়া যাবে।

'হ্যাঁ রে উমি, একটা কথা ভাবছি কাল থেকে। মা ত শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, তোর ত চার-পাঁচ ঘণ্টা বাইরে কাজ—একটা ত কাউকে হাত-হুড়কুৎ

রাখতে হয়। তা আমি বলি কি কালই না হয় হেমের সঙ্গে তরুটাকে পাঠিয়ে দিই? কী বলিস?'

ছুটি হাত জোড় করে উমা বলে, 'ঐটি তুমি মাপ করো ছোড়দি। আর না। ভগবান যা দেন নি তা জোর ক'রে পেতে চাই না। ঐন্দ্রিলা যখন যায় তখন সাতরাত ঘুমোতে পারি নি।...না, ও শখ আমার মিটে গেছে।'

অপ্রসন্ন মুখে শ্যামা বলে, 'মার অসুখ বলেই বলা—নইলে আর কি বল্! লেখা পড়া শিখবে এ আশা আর আমি করি না। খেঁদিটা তো কতই শিখলে! আপনার লোককে কি আর পড়ানো যায়? মাইনে দিলে তবে চাড় হয়।'

উমা উত্তর দিতে গিয়েও সামলে নেয়। সহজ কণ্ঠেই বলে, 'মার জন্যে ভাবতে হবে না। দিদি ত দুপুরে এসে থাকেই—মনে করছি এবার জোর ক'রেই দিদির বাসা উঠিয়ে ওদের এখানে এনে রাখব।'

দিদি এবং গোবিন্দ।

মা কবে যাবেন শ্যামা হয়ত খবরও পাবে না। হয়ত বা মরবার আগেই মার কি খেয়াল হবে, যা কিছু আছে ওদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবেন। বলা ত যায় না। মরবার মুখে মতিচ্ছন্ন, কথাতেই আছে! মার যে একেবারে কিছু নেই—তা ত নয়। তাহ'লে এ ঠাট বজায় থাকত না।

আরও একবার চেষ্টা ক'রে দেখে সে, 'তা দিদি এলেও ত তার সুবিধে হ'ত। হাতের কাছে—'

উমা চুপ ক'রে থাকে।

'দিদি এলে না হয় জিজ্ঞেস করি!' কতকটা আপন মনেই বলে শ্যামা।

'দোহাই তোমার ছোড়দি। আমাকে অব্যাহতি দাও—তোমার পায়ে পড়ি। এসব জ্বালা আর আমার সহ্য হয় না।'

'জানি নে বাছা। আপনার লোক অসহ্য হয়—পর ভাল। কালে কালে কতই শুনব? তুমি যে কেন আমার ছেলেমেয়েকে সহ্য করতে পারো না তাও বুঝি না! ওরা তোমার কি করলে?'

রাগ ক'রেই সেখান থেকে উঠে যায় শ্যামা।

উমা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সেখানে।

হয়ত এতটা না বললেও হ'ত। কিন্তু—কিন্তু সত্যিই, সে-ও আর পারে না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

এক

রাসমণি দিন দিন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছেন। আর যে আশা নেই, তা উমাও বোঝে একসময়। বোঝে আর তার বুকের মধ্যে হিম হয়ে আসে, আশ্রয় এবং অবলম্বন—দুটোই তার একসঙ্গে খসে পড়বে।

অথচ কীই বা করতে পারে সে?

অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হোমিওপ্যাথ পালটে কবিরাজ ডাকা হ'ল। কবিরাজের পর ডাক্তার। রাসমণি জীবনে কখনও ডাক্তারী ওষুধ খান নি, আপত্তি ছিল যথেষ্ট—শুধু উমার চোখের জলেই রাজী হলেন শেষ পর্যন্ত। আহা, ওকে ত একেবারেই পথে বসিয়ে যাচ্ছেন বলতে গেলে—ওর পক্ষে তাঁকে ধরে রাখবার চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক, ডাক্তার ডেকেই যদি মনে শান্তি পায় ত পাক। তেজস্কর উগ্র আর কটু আস্বাদের ডাক্তারী ওষুধ খেতে তাঁর গা বমি আসত, চোখে জল বেরিয়ে যেত—তবু প্রাণপণে খেতেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

জ্বর ঠিক নিয়মিত আসে বিকেলের দিকে, সন্ধ্যার কিছু পরে ছেড়ে যায়। রেখে যায় অপরিসীম দুর্বলতা।

এমন সময়ে উমা বলে, 'চলুন মা, আপনাকে নিয়ে দেওঘর যাই—যা আছে সব বেচেও সারিয়ে আনি। দেওঘরের হাওয়া শুনেছি খুব ভাল। যে যায় সে-ই সেরে আসে। বাবা বদ্যিনাথের দয়ায় আপনিও ভাল হয়ে উঠবেন নিশ্চয়ই।'

রাসমণি হাসেন। অতি কষ্টে বলেন, 'ক্ষেপেছিস তুই। আমি তো মড়াই, মড়া নিয়ে কোথায় যাবি? যেতে যেতেই হয়ে যাবো। না—টানাহেঁচড়ায় আর কাজ নেই।'

কমলাও জিদ করে, 'চলুন না মা। না হয় সেকেন্ কেলাসে শুইয়ে নিয়ে যাবো। ওতে অত ভিড় হয় না। আগে থাকতে রিজাব করা যায়। না হয় আমার একটা গয়নাই বিক্রি করবো।'

ধমক দেন ওরই মধ্যে। বলেন, 'কার গয়না তুই আমার জন্যে বিক্রি করবি তাই শুনি? ও ত তোর ছেলের গয়না। ছেলে মানুষ করতে হবে তোকে। ...ঘাটের মড়াকে ঘাটে পাঠাবার ব্যবস্থা কর্। আর কেন? ধানের ভাত তেতো লাগছে—আর কি আমি বাঁচব! আমার দিন ফুরিয়েছে।'

ক্রমশ দিন ফুরোবার অন্য লক্ষণও প্রকাশ পায়।

ছেলেমানুষের মত হয়ে পড়েন। অমন গাম্ভীর্য, অমন স্থিরবুদ্ধি কোথায় যেন চলে গেল! কে বলবে সেই মানুষ! আহারে লোভ কোনদিন ছিল না, ক্রমশ তাও দেখা দেয়। কেবলই কুপথ্য খেতে চান, না দিলে রাগ করেন। ডাক্তার বলেছে ভাত দিতে—গলাভাত অল্প ক'রে আর কাঁচকলার ঝোল। কিন্তু কাঁচকলার ঝোল দেখলেই রেগে যান। যেদিন হাতে একটু জোর থাকে—ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দেন ভাত—কান্নাকাটি করেন। দুধ বার্লি খাওয়াতে গেলে দাঁতে দাঁত চেপে থাকেন। কেবল খেয়াল থাকে একাদশীর কথাটা। প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন, 'হ্যাঁরে, একাদশী কবে হ'ল? তোরা একাদশীতে খাইয়ে দিচ্ছিস্ না ত?'

ওরা আগে আগে বোঝাবার চেষ্টা করত। এতকাল ক'রে এসেছেন—এখন অপটু শরীরে আর কেন! আতুরে নিয়মো নাস্তি। কিন্তু রাসমণি কিছুতেই বোঝেন না। বলেন, 'এতকাল ক'রে এসেছি, এখন ফেলে দেব? এই ক'টা দিনের জন্যে? লাভ কি? শরীর ত যেতে বসেছেই—তাকে আর দুটো দিন ধরে রাখতে ধর্মটা দেব কেন?'

অগত্যা মিছে কথা বলতে হয়। এখনও দেরি আছে বলে চালিয়ে, কিছু দিন পরে বলা হয়—একাদশী ত কবে কেটে গেছে!

রাসমণি বলেন, 'কৈ, তা তোরা আমাকে বললি না ত?'

'হ্যাঁ, আপনি করলেন যে! আপনি আজকাল বড্ড ভুলে যান।'

ছেলেমানুষের মতই আশ্বাস লাভ করেন সহজে। বলেন, 'তা হবে। মরণকালে ভীমরতি হয় মানুষের। বেব্‌ভুল হয়ে যায় সব—কিছু কি মনে থাকে! থাকে না।

একদিন—ঠিক একাদশীর আগের দিন,—হঠাৎ বলে বসলেন, 'পাঁজিটা আন্, আমি পাঁজি দেখব!'

অগত্যা পাঁজি আনতে হ'ল। হাত কাঁপে, বই ধরতে পারেন না। গোবিন্দ উঁচু ক'রে ধরলে বুকের ওপর। চোখের দৃষ্টি হয়ে এসেছে ঝাপ্‌সা—ভাল ক'রে দেখা যায় না কিছু। অতি কষ্টে বহু দূরে রেখে যদি বা নজর চলে ত তারিখ তিথি সব গোলমাল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করেন, 'আজ কি তারিখ দেখ্ তো। মিছ কথা বলিস্ ত আর কখনও ভালবাসব না!'

কমলার চোখ-টেপা গোবিন্দ দেখতে পায় না। সে তারিখটা বলে দেয়।

রাসমণি হিসেব ক'রে দেখে বলেন, 'কাল ত একাদশী! ঠিক হয়েছে—মনে ক'রে রাখব।'

পরের দিন সত্যিই তাঁকে কিছু খাওয়ানো গেল না। সন্ধ্যাবেলা প্রবল

জ্বরের ধমকে তৃষ্ণায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল যখন, তখন হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন শুধু, 'মুখে একটু গঙ্গাজল দে উমি, শুনেছি গঙ্গাজলে দোষ নেই। আর পারছি না!'

সেই এক চুমুক গঙ্গাজল খেয়েই সেদিন সারা দিনরাত কেটে গেল। আশ্চর্য এই যে—ওরা যতটা আশঙ্কা করেছিল তার কিছুই হ'ল না। প্রতিদিন যেমন থাকেন তেমনই রইলেন।

দুই

মাঝে মাঝে পুরোনো ব্যক্তিত্বের বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটে।

জ্যৈষ্ঠের গোড়ার দিকে রাসমণি হঠাৎ একদিন বলে বসলেন, 'শ্যামাকে খবর দে উমি, আমি বেঁচে থাকতে থাকতে যা ক্ষুদকুড়ো আছে ভাগ করে দিয়ে যাই—নইলে তাকে ত আমি চিনি—তার সঙ্গে তোরা পেরে উঠবি না!'

উমা ক্লান্ত স্বরে বললে, 'কি হবে মা আপনার এই দুর্বল দেহ ব্যস্ত ক'রে? না হয় সে-ই সব নেবে। আমার আর কি হবে?'

'তোমাকে আর গিন্নিত্ব করতে হবে না মা—যা বলছি তাই শোন! বাসনগুলো থাকলে অসময়ে বিক্রি ক'রে খাওয়া যায়, রোগ হ'লে ডাক্তার দেখানো যায়। তুমি কি আমার চেয়ে বেশি বোঝ?'

'তার ছেলেমেয়ে আছে—' তবুও উমা বলতে চেষ্টা করে, 'তার দরকার বেশী।'

'তোমার সঙ্গে আমি আর বকতে পারি না মা। আমার মুখ ব্যথা করে। ওর ছেলেমেয়ে আছে বলেই দরকার কম। তারা মানুষ হয়ে ওকে দেখবে। তোমাকে কে দেখবে? তুমি কি এমন তালেবর যে, দু'শ পাঁচ'শ টাকা রোজগার ক'রে জমাবে!'

অগত্যা শ্যামাকে চিঠি লেখা হ'ল।

শ্যামা শশব্যস্তে এসে পৌঁছল। প্রায় ছুটতে ছুটতে।

এতদিনের আশা ও আশঙ্কা তার।

আশাই বেশি। মা কি আর সত্যি কথাই বলেছেন! কিছুই কি নেই! মনে তা হয় না।

রাসমণি ইঙ্গিতে বসিয়ে দিতে বললেন। তিন-চারটে বালিশ উঁচু ক'রে পিঠের নিচে দিয়ে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর কমলা ও উমা সিন্দুক খুলে বাসনের স্তূপ এনে তাঁর সামনে সাজাতে লাগল। শ্যামাও ছুটে গিয়ে ওদের সাহায্য করতে শুরু করল। কাঁসার বাসনের স্তূপ। খাগড়াই বাসন, ঢাকাই বাসন—কটকীও আছে দু-একখানা, কিন্তু সে খুব কম। ভারী ভারী থালা।

এ ছাড়া পাথরের বাসন। সাদা পাথরের সেট, কষ্টিপাথরের সেট। জয়পুর, গয়া ও মুঙ্গেরের ভাল ভাল বাসন। লোভে চোখ জ্বলতে থাকে শ্যামার।

সব বাসন উজাড় ক'রে এনে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল।

তারপর চোখের ইঙ্গিতে উমা হাতির দাঁতের কাজ-করা কাঠের বাক্সটা এনে রাখল ওঁর পাশে। গয়নার বাক্স। উৎকণ্ঠিত শ্যামা নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে আছে। কি অচিন্তিত রহস্য ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে কে জানে!

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন রাসমণি। কমলা তিনটে ভাগ করতে থাকে। যেগুলো তিনের পর্যায়ে আছে সেগুলো আপনিই ভাগ হয়। যেমন এক সাইজের থালা ছিল ছ'খানা—দু'খানা ক'রে পড়ল। যা ঠিক ভাগ-মত নেই, সেগুলোর মনে মনে একটা হিসেব ক'রে নেন রাসমণি।

চারটে ছোট বাটি দু' ভাগ ক'রে তার জায়গায় একটা বড় বাটি আন্দাজমত দেন তৃতীয় ভাগে। এইটুকু করতেও ক্লান্তি বোধ হয় তাঁর। তিনি মধ্যে মধ্যে চোখ বুজে বিশ্রাম ক'রে নেন খানিকটা, আবার একসময় চোখ মেলে কাজ শুরু করেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভাগ করা দেখে দেখে একসময় আর থাকতে পা'রলে না শ্যামা। বলে উঠল, 'ভাগটা কি সমান করা উচিত হচ্ছে মা! আমার এতগুলো ছেলে-মেয়ে, উমার মোটেই নেই, দিদির ত মোটে একটা! দরকার আমারই বেশী।'

লজ্জায় কমলার মুখ লাল হয়ে ওঠে। শ্যামা এমন নির্লজ্জভাবে বললে কি ক'রে—ওরা ভাবে। শ্যামারও যে একেবারে লজ্জা করে না তা নয়। তবে তার প্রতিকূল ভাগ্য এতাবৎ তাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে এসব ব্যাপারে চক্ষুলজ্জার স্থান নেই। লজ্জা করতে গেলেই ঠকতে হয়।

রাসমণি তাঁর রোগক্লান্ত চক্ষু দুটি মেলে স্থির দৃষ্টিতে তাকান কিছুক্ষণ শ্যামার মুখের দিকে। কথা কইতে আজকাল তাঁর একটু সময় লাগে, যেন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় ক'রে নেন। তারপর বলেন, 'তোমার ছেলেমেয়ের ভাবনা তুমি ভাবো মা, আমি ভাবছি আমার মেয়েদের ভাবনা। তার বেশী ভাবতে গেলে ত আমার চলে না। কত দূর ভাব্‌ব বলো—এই গোবিন্দরই হয়ত দশটা ছেলে হ'তে পারে। তোমার হেমের হয়ত একটাও হ'ল না!···উমার স্বামীও এসেছিলেন, দেখা ক'রে গেছেন। কে জানে তাঁর মত ফিরবে কি না—এই উমারই হয়ত একঘর ছেলেমেয়ে হবে একদিন! তাছাড়া তোমার ছেলেমেয়ে আছে ব'লেই ত তোমাকে আর কিছু দেওয়া উচিত নয়। তোমার হেম ত এখনই রোজগার ক'রে খাওয়াচ্ছে। উমাকে কে দেখবে!'

শ্যামা দমবার পাত্রী নয়। সে বললে, 'হেমই দেখবে।'

'সে আমি জানি। অশক্ত হয়ে তোমার ছেলের ঘাড়ে গিয়ে পড়লে হয়ত এক-মুঠো ভাত সে দেবে। কিন্তু ধার ক'রে ডাক্তার দেখাবে না এটাও ঠিক।... আর হেমই যদি দেখে—সে-ই ত একদিন পাবে এসব, নেহাত যদি উমার কপাল কোনদিন না ফেরে!'

শ্যামা বোধ করি আরও কি বলতে যাচ্ছিল, রাসমণি কম্পিত হাতের তর্জনী তুলে নিষেধ করলেন। তারপর কমলাকে ইঙ্গিত করলেন ভাগ ক'রে যেতে।

সব বাসন ভাগ করা শেষ হ'লে রাসমণি আর একবার শ্যামার মুখের দিকে তাকালেন। ম্লান অথচ বিদ্রূপের একটুখানি হাসি তাঁর ঠোঁটের কোণে খেলে গেল।

'তাই বুঝি মা তুমি ওদের অত সাহায্য করতে দৌড়চ্ছিলে! বড় খাগড়াই বাটিটা আর সরপোশ দেওয়া গেলাসটা আসতে আসতে কোথায় হাতসাফাই করেছ ব'লে দাও—গোবিন্দ গিয়ে নিয়ে আসুক!'

কমলা ও উমা স্তম্ভিত। একবার সন্দেহ হ'ল মার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে সত্যি-সত্যিই? এমন কথা কি ক'রে বলতে পারলেন তিনি? কিন্তু আরও স্তম্ভিত হ'ল শ্যামার অবনত আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে। অপরাধ স্বীকারের এমন স্পষ্ট ভাষা তারা আর কখনও ইতিপূর্বে এভাবে কারও মুখে ফুটে উঠতে দেখে নি। শ্যামার সুগৌর মুখ অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠেছে, এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ললাটের স্বেদবিন্দু মুক্তোর মত বড় বড় হয়ে উঠেছে।

শ্যামা বার-দুই ঢোঁক গিলে বললে, 'আপনি অকারণ আমাকে অপমান করেন মা—আনতে আনতে বড্ড ভার বোধ হ'ল তাই—তারপর একদম ভুলে গেছি।'

'বেশ ত, কোথায় রেখেছ বলো?'

'আমি আনছি—'

শ্যামা একরকম দৌড়েই চলে যায়। উমা উঁকি মেরে দেখে সিন্দুকেরই তলা থেকে বেরোয় বাসন দুটো।

রাসমণি হাসেন।

'বেব্‌ভুল হয়েছে ঠিকই, হবার কথাও। কিন্তু শুনেছি দিন শেষ হ'লে আবার সব মনে আসে। আমারও আর দেরি নেই রে। সব যেন আমার গোনাগাঁথা—এমনি মনে পড়ছে।'

উমার চোখে জল টলটলই করছিল, এবার আর বাধা মানল না। ঝরে পড়ল

ঝরঝর ক'রে। সেদিকে চেয়ে আর একবার হাসলেন রাসমণি। বাটি আর গেলাস এনে ওঁর সামনে নামিয়ে দিয়ে শ্যামা নত মুখে বসল। তার আর যেন কথা বলবার ক্ষমতা নেই।

রাসমণি বললেন, 'কমলা, আমার ইচ্ছে এ দুটো মহাশ্বেতার বরকে দিই। কী বলো তুমি?'

কমলা তাড়াতাড়ি বললে, 'বেশ ত, দিন না মা।'

'আর ঐ বড় ফুলকাটা রেকাবিখানা—ফরমাশ দিয়ে গড়ানো ওটা, দু' সের ওজন—ঐটে দিও খেঁদির বরকে। কিছুই নয়—দিদিমার একটা স্মৃতিচিহ্ন, এই আর কি!'

এইবার গয়নার বাক্স খোলা হ'ল। সব ভুলে শ্যামা উদ্‌গ্রীব লোলুপ হয়ে উঠল আবার। আশা বা আশঙ্কা কোন্‌টা ফলে কে জানে!

কিন্তু যা বেরোল বাক্স থেকে—তা সত্যিই হতাশ হবার মত। খান দশেক গিনি, একটা সাতনরী হার, একজোড়া বড় কান, দুজোড়া ঝুমকো আর একগাছা বালা। আর কিছু কুঁচো সোনা। গোটা-দুই আংটি, হীরের নাকছাবি একটা, আর একটা আসল মুক্তোর নথ। একটা বালা সম্প্রতি বিক্রি করা হয়েছে—নইলে এক জোড়াই ছিল।

একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সেদিকে রাসমণি। চেয়ে চেয়ে তাঁরও চোখে জল ভরে এল। কত কী যে তাঁর মনে হচ্ছিল কে বলবে! কত পুরোনো স্মৃতি ও অতীতের প্রায়-ভুলে যাওয়া দাম্পত্য প্রেমের ঝাপ্‌সা ইতিহাস! প্রতিটি অলঙ্কারের পিছনে একটা ইতিহাস আছে বৈকি, ছোট বা বড়। সে সব ইতিহাস আজ এতকাল পরে এই মৃত্যুপথযাত্রিণীর মনে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছিল কি না, তাই বা কে বলবে? এগুলো যে নারীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, শুধু তাও ত নয়—এ যে তাঁর এই দীর্ঘ নিঃসম্বল জীবনের অবলম্বনও বটে। তাঁর জীবনে বিড়ম্বনা ও দুঃখ ছিল কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত কারও কাছে ভিক্ষা না ক'রে মর্যাদার সঙ্গে কাটিয়ে যেতে পারলেন এইটেই বড় লাভ। আর তা সম্ভব হয়েছে এগুলোর জন্যই। তাছাড়া একদা তিনি স্বামীর প্রিয়তমা ছিলেন—তারও চিহ্ন বহন করছে এই স্বর্ণখণ্ডগুলি। কারণে অকারণে প্রিয়াকে খুশী করার জন্যই অলঙ্কার উপহার দিয়েছেন তিনি—তাঁর সেই প্রেমেরই নিদর্শন এই সব অলঙ্কার। সেইজন্যই এরা সাধারণ অলঙ্কারের চাইতে অনেক বেশী মূল্য বহন করছে চিরকাল তাঁর কাছে। অনেক—অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন রাসমণি। অশ্রুতে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে ক্ষীণ দৃষ্টি—তবু চোখ নামাতে পারেন না যেন।

অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলিয়ে পড়েন বালিশে। কিছুই বলতে পারেন না, চিন্তা আচ্ছন্ন হয়ে আসছে কিনা তাও বোঝা যায় না। ঘরসুদ্ধ সকলেই চেয়ে থাকেন ওঁর দিকে। কেবল উমা ছাড়া ; তার চোখের জল আর কিছুতেই অবরোধ মানছে না—সে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় প'ড়ে কাঁদছে ফুলে ফুলে।

অবশেষে একসময় আবার রাসমণি চোখ মেলে তাকান। আঙুল দিয়ে কমলাকে কাছে ডাকেন। উৎকণ্ঠিতা শ্যামাও আর থাকতে না পেরে কাছে এগিয়ে আসে।

রাসমণি ফিসফিস ক'রে বলেন, 'বালাটা বোধ হয় লাগবে, আরও যে কদিন বাঁচব তার জন্যে। গিনি ক'খানা রইল—শ্রাদ্ধের খরচ। ওর চেয়ে বেশী খরচ করতে যেও না। বাহুল্যতার দরকার নেই। সাতনরী হারটা উমাকে দিও, তার কাজে লাগবে। কান জোড়াটা গোবিন্দর রইল। ঝুমকো দু'জোড়া শ্যামার। আর কুচো যা আছে আংটি,ফাংটি—সবই উমার থাক। ওকেই সব চেয়ে অসহায় রেখে গেলুম, এটুকু ওকে দিতে তোমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। তোমাদের কারও বিয়েই খুব ভাল দিতে পারি নি—কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমার কোন অপরাধ ছিল না। তবু উমার দুর্ভাগ্যের ভাবনা আমাকে পরলোকে গিয়েও শান্তি দেবে না। শুধু তোদের দুঃখই ভেবে ভেবে গুমরে গুমরে অকালে বুড়ী হয়ে গেলুম—এই ভেবে আমাকে মাপ করিস তোরা।'

রাসমণি আবারও এলিয়ে পড়লেন। অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছেন তিনি। কমলা ছুটে গিয়ে পাখা এনে বাতাস করতে লাগল।

কেবল শ্যামা বসে রইল পাথরের মত স্থির হয়ে। ওর হতাশার পরিমাণ ওর বিবর্ণ ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে বোধ করি একমাত্র রাসমণিই অনুমান করতে পারতেন কিন্তু তাঁর সে শক্তি তখন ছিল না।

তিন

রাসমণি ইদানীং ওষুধ খাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলেন একেবারে, এমন কি বরাটের হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেখলেও যেন জ্বলে উঠতেন—এখন আহারও ত্যাগ করলেন। কিছুই মুখে রোচে না। কমলা পীড়াপীড়ি করলে বলতেন, 'কেন জোর করছিস —বুঝতে পারছিস না যে আমার এখানকার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে! নইলে মুখে সব তেতো লাগবে কেন? আর দেরি নেই—ধানের ভাত যখন তেতো লেগেছে তখনই বুঝেছি—এ পৃথিবীর খাওয়া শেষ হয়েছে। আর জোর করিস্ নি।'

কমলা তবু হয়ত মৃদু অনুযোগ করে, 'কিন্তু দেহটা যতদিন আছে—'

'আছে কেন, শেষ হয়ে যাক না! লোকে না খেয়েও ত থাকে দেখি! আর এ দেহ বাঁচিয়েই বা লাভ কি? শুধু শুধু তোদের ভোগান্তি।'

জ্বর দেখারও উপায় নেই। থার্মোমিটার দেখলে একেবারেই ক্ষেপে যান। কোথা থেকে ঐ পাত-করা দেহে শক্তি আসে তা ভেবে পায় না উমা। পর পর দুটো থার্মোমিটার ভাঙলেন। অকস্মাৎ শীর্ণ হাত বাড়িয়ে এমন অতর্কিতে টেনে নিয়ে আছড়ে ফেলে দেন যে উমা সতর্ক হবারও সময় পায় না। মুখ ভেঙিয়ে বলেন, 'ঐ এক শিখেছেন ওঁরা!...যখন-তখন জ্বর-কাঠি গোঁজা। কাজ নেই কম্ম নেই। কী হবে? জ্বর মেপে দেখলেই আমি সেরে উঠব?'

শেষ দিনে এমন একটা কুৎসিত কটু মন্তব্য করলেন যে উমা সহ্য করতে না পেরে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। এ কী হ'ল? আজীবন সংযতবাক্ দেবীর মত মহিমময়ী তার মায়ের এ কি অধঃপতন! একেই কি তাহলে ভীমরতি বলে?

কমলা ওকে সান্ত্বনা দেয়, 'মরণের আগে এমনি হয়, তাই বলে মরবার আগে মতিচ্ছন্ন! এ সইতেই হবে—উপায় ত নেই।'

এমনি চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত না করলে রাসমণি চুপ ক'রে পড়েই থাকেন। কথা কন না, পাশও ফেরেন না। শুধু বুকের কাছে ধুকধুক করে জীবন। বেশীদিন যে আর নয় তা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে এল সকলের কাছেই। কমলা বললে, 'আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি দে উমি—এখন ত ভেঙে পড়লে চলবে না! যা কর্তব্য করতেই হবে। যদি কেউ দেখে যেতে চায় ত যাক।'

শ্রান্ত কণ্ঠে উমা বলে, 'গোবিন্দকে বলো দিদি। আত্মীয়-স্বজনই বা কে তাও ত বুঝি না!'

অগত্যা কমলা গোবিন্দকেই কখানা পোস্টকার্ড লিখে দিতে বলে। ক-খানাই বা! সত্যিই ত, আত্মীয়-স্বজন আর ওদের এমন কে আছে?

একটু ইতস্তত ক'রে কমলা জিজ্ঞাসা করে, 'শরৎ জামাইকেও ত তাহ'লে একটা খবর দেওয়া উচিত। না কি বলিস!'

উমা চমকে ওঠে। ওর ক'দিনের রাত্রি-জাগরণে শীর্ণ-বিবর্ণ হয়ে-যাওয়া মুখে এক ঝলক রক্ত যেন কে ছড়িয়ে দেয়।

তারপর সহজ কণ্ঠে বলে, 'না। কি দরকার? তার সঙ্গে কিই বা সম্পর্ক? শুধু শুধু মার মৃত্যুর সময় আবার নতুন ক'রে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া!'

তা বটে। কমলাও স্বীকার করলে মনে মনে কথাটার যৌক্তিকতা।

হেম এসে কাছে বসে দিদিমার শীর্ণ হাতখানা হাতের মধ্যে টেনে নিলে। কতকটা ভয়ে ভয়ে—সসঙ্কোচে। দিদিমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করবার সাহস ওর কোনকালেই ছিল না। আজ উপায় নেই ব'লেই এতদিনের সসম্ভ্রম দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলে। আস্তে আস্তে ডাকে, 'দিদিমা!'

জীবনের লক্ষণ দেখা দেয় আগে ঠোঁটে। ঠোঁট দুটো একটু কাঁপে—বোধ হয় প্রশ্ন বেরোতে চায়—'কে?' কিন্তু দন্তহীন গহ্বরের মধ্যে থেকে শিথিল ওষ্ঠকে টেনে তোলা যায় না কিছুতেই। তারপর চোখের পাতা নড়ে। একটু একটু ক'রে অর্ধ-উন্মীলিত হয় চোখ দুটি--শেষে প্রশ্নও বেরোয়,—'কে?'

'আমি হেম, দিদিমা। আমাকে কিছু বলবেন?'

হেমকে কাছে ডাকেন, সেই ঘোলাটে বিবর্ণ দৃষ্টি! হেম খুব কাছে মুখ নিয়ে যায়।

আস্তে আস্তে বলেন রাসমণি, 'আমাকে একটা কথা দিবি ভাই? যা বলব তা শুনবি?'

'নিশ্চয়ই শুনব দিদিমা। কথা দিচ্ছি।'

'ছোট মাসিকে একটু দেখিস্। যথাসাধ্য অবশ্য। তোর মা হয়ত ভুলে যাবে বোনের কথা। কিন্তু তুই একটু দেখবি ত? বল্, কথা দে?'

'আমার যতটুকু ক্ষমতা দেখব দিদিমা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'বাঁচালি ভাই। বোধ হয় এই জন্যেই প্রাণটা যাচ্ছিল না। তুই ছেলেমানুষ—তবু তোর এই কথাতেই যেন ভরসা হ'ল খানিকটা। আমার এই মৃত্যুশয্যায় কথা দিলি, মনে থাকে যেন।'

আবার চোখ বোজেন। ঠোঁট দুটিও মুখগহ্বরের ভেতরে ঢুকে এঁটে যায়। শুধু দুই চোখের কোল বেয়ে দুটি ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

আর একবার চোখ খোলেন অভয়পদ এসে কাছে বসতে।

অভয়পদ এসেও ওঁরই বিছানার এক পাশে বসে আস্তে আস্তে ডাকে, 'দিদিমা?'

নতুন কোন কণ্ঠ, তা সেই জড়-আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেও কেমন ক'রে বোঝেন। আজও চোখের পাতা কাঁপে, একটু একটু ক'রে চোখ খোলেন। বেশির মধ্যে ভ্রূটা ঈষৎ একটু কুঁচকে যায়। অর্থাৎ বিস্ময় বোধ করেন।

'আমি অভয়পদ দিদিমা!'

কমলা মাথার কাছে মুখটা এনে বলে, 'আপনার 'নাতজামাই এসেছেন মা। বড় নাতজামাই—মহার বর।'

প্রসন্ন হাসি ফুটে ওঠে মুখে। ঠোঁট দুটি খুলতে পারেন না ভাল ক'রে…কিন্তু বিস্তারিত হয়ে বুঝিয়ে দেয় যে তিনি হাসতেই চাইছেন। অনেক কষ্টে ঠোঁট নেড়ে কি যেন বলেন, বোধ হয় আশীর্বাদই করেন।

অভয়পদ বলে, 'এখন কেমন আছেন দিদিমা ?'

এইবার ভাল ক'রেই হাসি ফোটে মুখে। একটু ঘাড়ও নাড়েন।

তারপর কোনমতে বলেন, 'একেবারেই ভাল ভাই। আর দেরি নেই।'

'দিদিমা, কিছু খাবেন ? কী খেতে ইচ্ছে করে বলুন ?' অভয়পদ একটু ইতস্তত ক'রে প্রশ্ন করে। এ অবস্থায় আর কী বলা যেতে পারে তা ঠিক সে বুঝতে পারে না।

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয় বিস্ময়ে। রাসমণি প্রথমটা যেন বুঝতেই পারেন না ওর কথা। তারপর অনেক কষ্টে বলেন, 'তুমি খাওয়াবে ভাই, তোমার পয়সায় !'

'হ্যাঁ দিদিমা। আমিই খাওয়াবো।'

'রাজ-রাজ্যেশ্বর হও ভাই। বেঁচে থাকো। মহার মহাভাগ্য তোমার হাতে পড়েছে।'

'কিন্তু আপনি কি খাবেন তা ত বললেন না ?'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন। হয়ত বা মৃত্যুপথযাত্রিণী তাঁর বিগত জীবনের ঝাপ্‌সা-হয়ে-আসা ইতিহাসের মধ্যে নিজের প্রিয় খাদ্য খুঁজে বেড়ান। অথবা সবই আজ একাকার হয়ে গেছে মনের ভেতর—প্রিয়-অপ্রিয়, স্মৃতি আর চিন্তাশক্তি কোন্ অতল আঁধারে তলিয়ে গেছে, নাগালই পাচ্ছেন না।

অবশেষে একসময় বলেন ঠোঁট খুলে, 'আনারস খাবো ভাই। আনারস আর গরম সন্দেশ, খাওয়াবে ত ?'

'এখ্‌খুনি নিয়ে আসছি দিদিমা।'

তখনও আনারসের সময় নয়। সেটা বৈশাখ মাস। তবু অভয়পদ নতুন বাজার থেকে খুঁজে খুঁজে পাকা আনারসই সংগ্রহ করে। আর তিনকড়ি ময়রার দোকান থেকে গরম গরম সন্দেশের ঠাসা।

কিন্তু জিরের মত করে আনারস কুচিয়ে যখন কমলা মুখে দিতে গেল, তখন অকস্মাৎ রেগে গেলেন রাসমণি, 'তোরা সবাই মিলে আমাকে একাদশীতে খাওয়াতে এসেছিস্ ? যা নিয়ে যা—থূ—থূ !'

কমলা ব্যাকুল কণ্ঠে বোঝাতে গেল, 'আজ যে চতুর্দশী মা। আমি আপনাকে ছুঁয়ে বলছি আজ একাদশী নয়। পরশু একাদশীর উপোস হয়ে গেছে। কাল

ত্রয়োস্পর্শ গেছে, আছ চতুর্দশী। আপনি খান।'

'দূর দূর! দূর হয়ে যা! সব্বনাশীরা মরবার সময় আমার সব্বনাশ করতে এসেছে।'

অভয়পদও বোঝাবার চেষ্টা করে, 'আমি বলছি দিদিমা আজ একাদশী নয়। নইলে আমি আনব কেন?'

'তোরা সব বেইমান। আমি জানি। থু—থু!'

প্রাণপণে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে রাসমণি। কিছুতেই কেউ বোঝাতে পারে না যে সেদিন একাদশী নয়।

* * *

পূর্ণিমার দিন ভোরবেলা মারা গেলেন রাসমণি। আগের দিন সেই যে মুখ বুজেছিলেন আর খোলেন নি। চোখও চান নি। নিস্তব্ধ নিঃসাড়ে পড়ে ছিলেন। তবু সকলেই কেমন ক'রে বুঝেছিল যে শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রায় সারা-রাতই সকলে ঘিরে বসে রইল। তিন মেয়ে, নাতি-নাতনী, দুই নাতজামাই। ছিল না কেবল জামাইরা কেউ। নরেনের পাত্তা জানা নেই—শরৎকে ইচ্ছে ক'রেই খবর দেওয়া হয় নি।

শেষরাত্রির দিকে শ্বাসলক্ষণ দেখা দিল। নাকটা ভেঙে গেল। রাঘব ঘোষাল বসে ছিলেন; তিনি বললেন, 'আর দেরি নেই। নাক ভেঙেছে—এইবার হয়ে এল। গোবিন্দ, তুই বাবা গঙ্গাজল দে একটু মুখে। তোমরা সবাই নাম শোনাও। অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম।...গঙ্গাযাত্রা করবে নাকি?'

অশ্রুমুখী কমলা প্রবলবেগে ঘাড় নাড়ে। বড় মাসিমার অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট।

শেষরাত্রে অকস্মাৎ নিঃশ্বাসটা সহজ হয়ে আসে। একসময় আবারও ঠোঁট দুটি নড়ে। মনে হয় যেন কী বলতে চাইছেন!

একেবারে মুখের কাছে কান পেতে শোনে অভয়পদ—নামই করছেন রাসমণি:

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে অভয়পদ বলে, 'উনিও নামই করছেন। আপনারা—'

সে আর বলতে পারে না। ক্রন্দনের কলরোলের মধ্যে রাঘব ঘোষালের কণ্ঠ বেজে ওঠে:

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

গোবিন্দ গঙ্গাজল দিতে যায় মুখে, হাত কেঁপে জল গলায় পড়ে। রাঘবই হাত ধরে মুখে গঙ্গাজল দেওয়ান।

কিন্তু সে জল আর গলার ভেতর পর্যন্ত গেল না, কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

দীর্ঘদিনের বিপুল ব্যথা-বেদনার সঞ্চার নিয়ে রাসমণি কোন্ অজানা সান্ত্বনার পথে যাত্রা করলেন, তা কে জানে!

একবিংশ পরিচ্ছেদ

এক

শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার লোকের ঠিক অভাব ছিল না। রাঘব ঘোষালের ছেলে, দুই নাত জামাই—হরিনাথ আর অভয়পদ এবং হেম। রাঘব ঘোষাল নিজেও আছেন। তবু কান্নার শব্দ পেয়ে পাড়ার অনেকেই এলেন। পাড়াটা কায়স্থ-প্রধান হ'লেও, দু'একটি ব্রাহ্মণ ছেলেও পাওয়া গেল। তারা নিজেরাই এসে সঙ্গে যেতে চাইল। এ পাড়ায় দীর্ঘদিন আছেন রাসমণি, ভোরবেলা তাঁর সন্ত-গঙ্গাস্নাত তসরের থানপরা মূর্তি এ পাড়ার অনেকেরই পরিচিত। চিরদিন দূর থেকে দেখলেই সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়েছেন তাঁরা। এই নির্বিরোধী আত্মসম্ভ্রমসম্পন্না মহিলাকে সকলেই মনে মনে শ্রদ্ধা করতেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে অনেকেই আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন।

সাদিক মিয়া আজও বেঁচে আছেন। যদিও গত দু'তিন বছর ধরে তাঁর স্মৃতিটা গেছে। কাউকে চিনতে পারেন না, কিছু বুঝতেও পারেন না। কিন্তু কি জানি কেন আজ এ বাড়িতে কান্নার রোল শুনে হঠাৎ কি ভেবে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন—'নিশ্চয়ই আমার মেয়ে মারা গেল! আমার মেয়ে! আমাকে নিয়ে চ, আমি একবার শেষ দেখা দেখি!'

উমা একবার মাত্র কেঁদে উঠেছিল—মৃত্যুটা নিশ্চিত জানবার সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর আর কাঁদে নি বটে, মাথাও তোলে নি। সেই যে মাকে আঁকড়ে ধরে তাঁর বুকে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল, আর তার মধ্যে কোন প্রাণ-লক্ষণ দেখা যায় নি। তার সেই কঠিন বন্ধনের মধ্যে থেকে রাসমণির মৃতদেহ উদ্ধার করবার প্রস্তাবে অনেকেরই মুখ শুকিয়ে উঠল।

কেবল বিচলিত হ'ল না অভয়পদ; সে এতক্ষণ নির্লিপ্ত এবং উদাসীনভাবে একদিকে সরে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এল এবং পাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে ডাকলে, 'মাসিমা!'

উমার দেহটা শুধু বারেক শিউরে উঠল—আর কোন প্রাণস্পন্দনই জাগল না সে অনড় দেহে।

শাশুড়ীকে প্রণাম করা ছাড়া ছোঁয়ার রেওয়াজ নেই। অভয়পদও সামান্য একটু ইতস্তত করলে, তারপর হেঁট হয়ে উমার পায়ে হাত দিয়ে একটু নাড়া দিয়ে বললে, 'মাসিমা, এবার আপনাকে সরতে হবে যে। আপনি ত সবই জানেন, আর ত ধরে রাখার উপায় নেই।'

উমা এইবার মাথা তুলল। কেমন একরকম বিহ্বল হয়ে চাইল চারিদিকে—তারপর কেউ কিছু বোঝবার আগেই অকস্মাৎ রাসমণির পায়ের কাছে মেঝেতে মাথা খুঁড়তে লাগল, সবেগে ও সজোরে।

এক লহমা—চকিতে ওর মাথাটা ধরে ফেললে অভয়পদ। দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'ছিঃ মাসিমা! আপনি বুদ্ধিমতী—এমন অবুঝ হলে চলে?

ততক্ষণে কমলাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। সে এসে জোর ক'রে উমাকে টেনে নিলে বুকে। এইবার উমার বাঁধ ভাঙল। আবারও হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠল সে।

অভয়পদ ঈঙ্গিত করলে বাকী সকলকে। মৃতদেহ সরাবার এই সুযোগ।

রাঘব ঘোষাল কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন, 'বড়দি, তোমাকেও ত যেতে হয়! মুখাগ্নি করবে কে?'

কমলা যেন চমকে উঠল, 'আমাকেই যেতে হবে? অন্য উপায় নেই?'

'সন্তান থাকতে—! আচ্ছা গোবিন্দই চলুক। ওর কাছ থেকে নুড়োটা নিয়ে নিও শ্রাদ্ধের দিন।'

শবযাত্রীদের হরিধ্বনি গলির মোড়ে মিলিয়ে যেতেই সহসা যেন তন্দ্রা ভাঙল উমার। সে একবারে দাঁড়িয়ে উঠল।

কমলা একটু ভয় পেয়েই ডাকল, 'উমা—?'

সহজ কণ্ঠে উমা উত্তর দিলে, 'আমি শ্মশানে যাবো দিদি।'

'না না, তোকে যেতে হবে না। গোবিন্দ ত গেছে।'

'আমি ঠিক ফিরে আসব। আমার জন্যে ভেবো না। এখানে বসে বসে—না দিদি, সে আমি পারব না। আমাকে ছেড়ে দাও—'

তর তর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে সে নেমে এল একতলায়, এবং কমলা বা শ্যামা কোন বাধা দেবার আগেই হাঁটতে শুরু করলে।

কমলা ব্যাকুল হয়ে বললে, 'ওরে— অ গিরির মা, যাও যাও ভাই একটু সঙ্গে! এ আবার কী হ'ল—'

গিরির মা ছুটেই বেরিয়ে গেল। কিন্তু একটু পরে ফিরে এসে বললে, 'কাউকে যেতে হবে না বড়দি। যার জিনিস সে-ই সঙ্গে আছে।'

'সে আবার কে রে? কার কথা বলছিস্?'

'ছোট জামাইবাবু। তিনি যেন তৈরি হয়েই বাইরে দাঁড়িয়ে ছেল্। তিনিই সঙ্গে যাচ্ছে।'

শরৎ অবশ্য তৈরি হয়ে আসে নি, নিজের কাজে বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ হরিধ্বনি শুনে চমকে চেয়ে দেখতেই নজরে পড়ল রাঘব ঘোষালকে, গোবিন্দকেও চিনতে পারল সে।...বুঝতে দেরি হ'ল না শবদেহটা কার। মিনিটখানেক সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল। এখন এতদিন পরে এই সময় গিয়ে দাঁড়াতে তার লজ্জাই করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লজ্জার চেয়ে কর্তব্যবোধই প্রবল হয়ে উঠল—এবং এটাও বুঝতে পারল যে প্রয়োজনটা তার শ্মশানের চেয়ে বাড়িতেই বেশি।

কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে হ'ল না, তার আগেই বেরিয়ে এল উমা। শরতের সামনাসামনি পড়ে মুখ তুলে তাকালও একবার উদাস বিহ্বল দৃষ্টিতে, তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গেল নিমতলার রাস্তা ধরে। স্বামীকে সে চিনতে পারল কিনা তা কিছুই বোঝা গেল না ওর মুখ দেখে।

শরৎ বিপন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। উমাকে ডাকবে কিনা তাও বুঝতে পারল না। অথচ উমা বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে যাচ্ছে। শেষে সেও উমাকেই অনুসরণ করল।

শ্মশানে যতক্ষণ চিতা জ্বলল—উমা সেদিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে রইল। শরৎ তার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, খানিক পরে রাঘব ঘোষাল চিনতে পেরে এগিয়ে এসে আলাপ করলে, অন্য জামাইদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলে। অগত্যা শরৎকে ওদের কাছে গিয়েও দাঁড়াতে হ'ল খানিকটা। তবে সে বেশীক্ষণ নয়—একটু পরেই ফিরে সে উমার কাছেই এসে দাঁড়াল।

হয়ত সে কিছু সান্ত্বনার কথাই বলতে চেয়েছিল। হয়ত তার মনে হয়েছিল যে ওর হাত দুটো ধরে কিছু আশা ও ভরসার কথা শোনানো এ সময়ে তার উচিত। কিন্তু আজ এতকাল পরে সে প্রয়াস নিষ্ঠুর পরিহাসের মত শোনাবে ব'লেই বোধ হয় সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার সুগৌর ললাটে বার বার লজ্জার রক্তোচ্ছ্বাস ফুটে উঠলেও কণ্ঠ ভেদ ক'রে কোন স্বর বেরোল না।

অবশেষে একসময় চিতা নিভল। রাসমণির শেষ চিহ্নটুকুও ভস্মাবশেষে

পরিণত হ'ল। চিতার আগুন নিভিয়ে এ:ক একে সকলে গিয়ে নামল গঙ্গায়।

এইবার প্রথম মুখ খুলল শরৎ। মাথাটা নামিয়ে উমার মাথার কাছে এনে বললে, 'তোমাকেও ত চান করতে হয় এবার।'

গঙ্গার অপর পারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিল উমা। সে চমকে উঠল না। কোন চাঞ্চল্যও দেখালে না। সহজ অকম্পিত কণ্ঠে বললে, 'যাচ্ছি।'

উমার জন্য কেউ কাপড় আনে নি। উমারও সে কথা মনে ছিল না। এক বস্ত্রেই সে চলে এসেছে। সে জলে নামতে শরতেরই মনে পড়ল কথাটা। ছুটে গিয়ে সামনের একটা দোকান থেকে একখানা কোরা লালপাড় শাড়ি কিনে নিয়ে এল।

শাড়িখানা স্বামীর হাত থেকে সহজেই নিলে উমা। তার সে শোক-স্তম্ভিত পাষাণের মত মুখে কোন ভাবাবেগই ফুটল না, যেন এইটেই সে আশা করছিল।

ফেরার পথে পুরুষরা ইচ্ছে ক'রেই এগিয়ে গেল। উমা যাওয়ার সময় যত জোরে গিয়েছিল, ফেরার সময় ঠিক তেমনই আস্তে হাঁটছে। কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, সামনের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে কোন রকমে যেন শ্রান্ত দুটি পা ফেলে এগিয়ে চলেছে সে।

শরৎ তার পাশে পাশে তেমনি আস্তে আস্তে চলল। একেবারে বাড়ির দরজা পর্যন্ত।

ততক্ষণে অগ্রগামীরা শুদ্ধ হয়ে ভেতরে চলে গেছে। ভেতরে আবার নতুন ক'রে উঠেছে ক্রন্দনের কলরোল।

উমা একেবারে দরজার বাইরে এসে একবার থমকে দাঁড়াল।

কাঠের আগুন জ্বলছে এক কোণে। লোহা, নিমপাতা ও মটর ডাল ছড়ানো। যন্ত্রচালিতের মত উমা নিয়ম কর্মগুলো সেরে নিল।

আরও কয়েক মুহূর্ত সেই ধূমায়িত কাঠটার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে। চোখ দুটো তার ঈষৎ লাল—এ ছাড়া সমস্ত মুখে শোকের কোন চিহ্নই নেই। একটা ধূসর বর্ণহীনতা তার শুধু দেহে নয়—যেন সারা মনকেও আচ্ছন্ন করেছে।

শরৎ আর একটু কাছে এসে দাঁড়াল। খুব আস্তে আস্তে বললে, 'আমাকে কিছু বলবে?'

এই প্রথম—একটা শিহরণ দেখা দিল উমার দেহে। সেটা শরৎও অনুভব করল পাশ থেকে।

কোন উত্তর দিলে না উমা। তেমনিভাবেই আরও মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে

নিঃশব্দে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

আকস্মিক আঘাত পেলে মুখের যেমন অবস্থা হয়, শরতের মুখখানাও নিমেষে তেমনি হয়ে উঠল। কিন্তু সে কোন ক্ষোভ প্রকাশ করল না, শুধু নতমুখে সেইখানেই আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় বাড়ির পথ ধরল।

দুই

শ্রাদ্ধ পর্যন্ত কোনমতে ঠেকিয়ে রাখলেও, সব চেয়ে বড় প্রশ্নটাকে আর কিছুতেই এড়ানো গেল না। এবারে সে তার বীভৎস চেহারাটা নিয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। এত বড় বাড়ি এবং দিনরাতের ঝি, এ দুটোর কোন বিলাসই আর তাদের চলবে না। কমলা ও উমার যা মিলিত মাসিক আয়, তাতে এভাবে তাদের এক সপ্তাহও চলবার কথা নয়।

শ্রাদ্ধের দিন হঠাৎ নরেন এসে পড়েছিল কোথা থেকে। বোধ হয় পদ্মগ্রামে গিয়ে খবর পেয়েই এখানে এসেছিল। আহারে বসে সামনে কলাপাতায় রাশীকৃত লুচি দেখে মনটা অকস্মাৎ উদার হয়ে উঠেছিল নরেনের, আসনে দাঁড়িয়েই হাত নেড়ে বলেছিল, 'না দিদি, লোকে বলে যজ্ঞির ভাত, কলার পাত আর মায়ের হাত। তা যজ্ঞির ভাত না হয় লুচি, আরও ভালো কথা—কলার পাত ত আছেই, মায়ের হাত না হোক, বড় শালী—ও মায়েরই সমান ধরো। আমোদ ক'রেই আজ খাবার কথা। কিন্তু এ খেয়ে সুখ নেই। সেই থেকে, এসে ইস্তক তোমাদের কথাই ভাবছি। শাশুড়ী মাগী ত গেল—এখন তোমরা দাঁড়াও কোথা!'

ম্লান মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল কমলার। বলেছিল, 'তুমি খেতে বসো ভাই। তবু ভাল যে একজনও আছে আমাদের কথা ভাববার!'

আসনে বসে বিনা আচমনেই প্রকাণ্ড একখানা লুচি আস্ত মুখে পুরে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বললে নরেন, 'ভাবব না! বলো কি? এ ত আমাদের কর্তব্য। বলি পর ত আর নই। কি বলব মরমে মরে রয়েছি পয়সার অ ভাবে, নইলে কর্তব্য কাজ কি আর জানি না? কত বড় বংশ আমাদের!'

পিছন থেকে অস্ফুট অর্ধস্বগতোক্তি শোনা গেল, 'মুয়ে আগুন তোমার আর তোমার বংশের!'

নিমেষে জ্বলে উঠল নরেন, 'শুনলেন, শুনলেন দিদি ও-মাগীর কথাগুলো! বলি আজ আমার এ অবস্থা হ'ল কেন? ঐ মাগী আর ওর শুয়োরের পাল ছেলেমেয়ে

নিয়েই ত আমার এই হাল! নইলে আমার ভাবনা কি? রোজগার কি কম করি? কী করব—বাইরে বাইরে সব উড়ে যায়। ঘরে সুখ থাকলে ত ঘরে ফিরব—ওদের জ্বালায় আমায় বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াতে হয়।'

আর একখানা লুচি ও খানিকটা কুমড়োর ডালনা মুখে পুরে নরেন একটু শান্ত হ'ল। অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে বলল, 'না দিদি, অনেক ভেবে দেখলুম এত বড় বাড়ি ত কোনমতেই রাখা চলবে না। ভাড়া টানবেন কোথা থেকে? তার চেয়ে এই পাশেই ত বস্তি রয়েছে, ওখানে একখানা খোলার ঘর-টর পাওয়া যায় না! দেখুন না খোঁজ ক'রে। ভাড়াও কম হয়—আর ওখানে গেলে ঝিও লাগবে না। নিজেরাই হাতাপিতি ক'রে কাজকর্ম সেরে নিতে পারবেন। কী বলেন, তাই ভাল না?'

'বস্তি! আমরা বস্তিতে যাবো?' স্তম্ভিতভাবে অর্থহীন প্রশ্ন করে কমলা।

'কি করবেন বলুন? যা কপাল! নইলে দাদাই বা যাবেন কেন আর উমিটারই বা অমন হবে কেন?' বেশ নিশ্চিন্ত স্বরে উত্তর দেয় নরেন।

শ্যামা আর সহ্য করতে পারলে না। এগিয়ে এসে বললে, 'খেতে হয় ত ছাইপিণ্ডি মুখ বুজে খাও, নইলে উঠে চলে যাও। আমাদের বংশের কাউকে দরদ দেখাতে এসো না। চামার কোথাকার! • কথাগুলো মুখে আনতে একটু বাধল না?'

'ঐ লাও!' ছানার ডালনার আলুটা ভেঙে লুচি দিয়ে জড়াতে জড়াতে উত্তর দিলে নরেন, 'যার জন্যে চুরি করি সে-ই বলে চোর! আমি খারাপটা বললুম কি? বলি যত্র আয় তত্র ব্যয় ত করতে হবে। শাস্তরেই এ কথা লেখা আছে যে।'

'পোড়া কপাল আমার, শাস্তরের কথা তোমার কাছে শুনতে হবে! চুপ ক'রে খাও দিকি, নইলে ঐ পাত টেনে ফেলে দেব আঁস্তাকুড়ে!'

'থাম মাগী! মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস নি।' বললে নরেন কিন্তু কণ্ঠে আর তেমন জোর ফুটল না। সে আশ্চর্যরকম শান্তভাবে আহারে মন দিলে।

'এটা কি আনারসের চাটনী? দিব্যি হয়েছে ত! ও দিদি, আর একটু দিতে বলো। ল্যাংড়া আম আছে ত? গোটা তিন চার বাছো ভাল দেখে—'

সমস্ত কাজ সেরে ছাদে এসে বসল তিন বোন। গভীর রাত, মল্লিকদের বাগানে সারস ডেকে থেমেছে এইমাত্র। প্রহরে প্রহরে ডাকে ওরা। রাত বারোটার কম হবে না। তবু সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরও ওদের চোখে যেন ঘুম নেই।

কিছুক্ষণ ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় বসে থাকবার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কমল বললে, 'কানে যতই লাগুক শ্যামা, নরেন জামাই কথাটা তুলেছে ঠিকই। এ বাড়ি আমাদের এই মাসেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। এ মাসের ভাড়াটা কোথা থেকে টানব তাই ত ভাবছি!'

'কিন্তু তাই বলে সত্যিই ত আর খোলার ঘরে গিয়ে থাকতে পারবে না দিদি। এমনি ভদ্দরলোকের বাড়ি দেখে দু'খানা ঘর ভাড়া করতে হবে।'

'তাই ত ভাবছি, এত জিনিস কোথায় ধরবে—এই এক ভাবনা।'

'তা জিনিস বলো ত—' একটুখানি ঢোঁকি গিলে শ্যামা বলে, 'কিছু কিছু আমার ওখানে নিয়ে গিয়েও রাখতে পারি। আবার যখন গোবিন্দ বড় হয়ে বাড়িঘর করবে তখন না হয় ফিরিয়ে নিও!'

'তা সেটা মন্দ বলিস নি। উমা কি বলিস্?'

'ছোড়দিরও ত একখানা ঘর দিদি! আর সেও পরের বাড়ি! তা ছাড়া এখান থেকে নিয়ে যাওয়াই কি সোজা?' আস্তে আস্তে উত্তর দেয় উমা।

'না না, আমি নিয়ে যাবো এখন—যেমন ক'রে হোক! না হয় একখানা ঘোড়ারগাড়ি-টাড়ি ক'রে—'

এবার উমার কণ্ঠে আর একটু দৃঢ়তা দেখা দেয়, 'না দিদি, জিনিসগুলো ছিল মায়ের প্রাণ। তিনি যা বলে গেছেন তার নড়চড় করতে পারবো না। ছোড়দিকে দেবার ইচ্ছে থাকলে তিনিই দিয়ে যেতেন।...আমরা যদি নিজেরা মাথা গুঁজে কোথাও থাকতে পারি ত ওগুলোর ব্যবস্থাও হবে।'

বাতাস অস্বাচ্ছন্দ্যকর হয়ে উঠছে দেখে কমলা অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে, 'শরৎ জামাই আজও এসেছিলেন উমি। বেলা চারটে নাগাদ এসে একটু মিষ্টি মুখে দিয়েই চলে গেলেন।'

উমা ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, 'জানি।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আবারও বললে, 'কেন অকারণ টানা-হেঁচড়া করছ দিদি!'

'না, তা নয়'—অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলে কমলা, 'সেদিন শ্মশানে গিয়েছিল, আমাদেরও ত একটা কর্তব্য আছে। তাই হেমকে পাঠিয়েছিলাম ওর ছাপাখানায় নেমন্তন্ন করতে। তোর ঘাটের কাপড় অবিশ্যি ও আগেই পাঠিয়েছে!'

উমা উত্তর দিলে না। পূবের আকাশে মেঘ জমেছে একটু একটু করে—সেদিকে চেয়ে বসে রইল সে।

কমলা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে, 'শরৎ জামাইকে বলছিলুম, খানা

তুই ঘর দেখে দেবার কথা। অভাবে একটা বড় ঘর—'

বোধ করি উমার কাছ থেকে কোন সাগ্রহ প্রশ্ন আশা ক'রেই মাঝপথে থেমে গেল কমলা। কিন্তু উমা তেমনিই বসে রইল। শ্যামাই বরং প্রশ্ন করলেন, 'তা কি জবাব দিলে সে?'

'বলেছ ত দেখে দেবে। সন্ধানে আছে বুঝি কোথায়—কালই খবর পাঠাবে।'

'তোমাদের দেখবে কে?' বেশ কিছুক্ষণ অখণ্ড নীরবতার পর শ্যামা প্রশ্ন করে।

'ভগবান!' সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় কমলা।

তিন

শরৎ পরের দিন সত্যিই খবর পাঠালে। ঘর আছে—ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে, একতলায় দুখানা ঘর—দুখানা নামেই অবশ্য, দেড়খানাই বলা উচিত—সাত টাকা ভাড়া। এ ভাড়াও ওদের দেওয়া কষ্টকর। কিন্তু উপায়ই বা কি? এত জিনিস-পত্র ধরে কোথায়? তবু ঠিক হয়েছে যে কিছু কিছু ডেয়ো-ঢাক্‌না—যেমন জল-চৌকি তক্তাপোশ এমনি সব—লোক ডেকে বেচে দেওয়া হবে। তৎসত্ত্বেও যা থাকবে—কমলার যা আছে সব জড়িয়ে—ঐ দেড়খানা ঘরই গুদাম মনে হবে।

কমলা আর দেরি না ক'রে ঐ ঘরই ঠিক করলে। বাড়িওয়ালাদের পুরুষ কম—মেয়েছেলে বেশি, বৃদ্ধাও আছেন একাধিক, সুতরাং আশ্রয় হিসাবে অনেক নিরাপদ। ঘরগুলো খুব স্বাস্থ্যকর হয়ত নয়—একতলার ঘর, আলোবাতাসও কম, তবু আর অপেক্ষা করার সময় নেই। সব রকম সুবিধা পাওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন যতটা পাওয়া যায় ততটাই ভাল।

এ বাড়িওয়ালাদের উঠে যাবার কথা বলে দেওয়া হ'ল, ওঁদের অগ্রিম দেওয়া হয়ে গেছে। হেম আর অভয়পদ একটা রবিবারে এসে ওদের মালপত্র ও-বাড়ি সরিয়ে দেবে ঠিক হয়েছে। সময় আসন্ন। কিন্তু উমা যেন ক্রমশ পাথর হয়ে যায়। কি এক একান্ত নির্লিপ্ততা ওকে পেয়ে বসে। কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়ে ওর হাত-পা। যেন এখনও ওর বিশ্বাস হয় না যে এ বাড়ি সত্যিই ছাড়তে হবে।

কমলা একাই সব করে। দীর্ঘদিনের সংসার। শিশিবোতলওলা ডেকে তিন চার ঝুড়ি শুধু খালি শিশিবোতলই বিক্রি করে সে। পুরনো পাঁজি এক রাশ। এট-ওটা কত কি। তারের ফাইলে—চিঠি গাঁথা। চিঠি আর ভাড়ার রসিদ। কুলুঙ্গিতে কুলুঙ্গিতে জমে রয়েছে দীর্ঘদিনের জীবনযাত্রার নানা স্মৃতি ও সাক্ষ্য। ভাঁড়ার ঘরের বড় বড় জালা আর কলসীগুলো কোন কাজেই লাগবে না

বেচাও যাবে না। ইদানীং কতকগুলো টিনে ঢাকনা করিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলো নিয়ে যেতে হবে। ছোট সংসার হ'লেও চাল ডাল ত রাখতেই হবে।

উমা এত বড় বাড়িটার ঘরে ঘরে উদাসভাবে ঘুরে বেড়ায়। প্রতিটি ছোট-খাটো জিনিসও ওর জীবনের সঙ্গে জড়িত। আশৈশব এই বাড়িতে, এই পরিবেশে কেটেছে তার। পরিবেশটা বরং আজন্মই বলা চলে। শ্বশুরবাড়িতে ত গোনা কট দিন ছিল সে।

ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে ওর দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে আসে। রাসমণি গোছালো মানুষ ছিলেন। সারি সারি ইট সাজানো, তার ওপর নতুন চওড়া তক্তা পাতা। তার ওপর মোটা বিঁড়েতে সার সার জালা বসানো। জালার ওপর কলসী, কলসীর ওপর হাঁড়ি। এর কোন্‌টায় কি থাকে তা উমার আজও মুখস্থ। এর প্রতিটি জালা-কলসীর গায়ে আজও রাসমণির হাতের স্পর্শ মাখানো রয়েছে। নিয়মিত ন্যাকড়া দিয়ে এদের গা থেকে ধুলো মুছে নিতেন তিনি।

হাঁ হাঁ করে বাড়িটা। বিদায়ের হাওয়া উঠেছে। জানলা-দেওয়ালগুলো পর্যন্ত যেন করুণ মুখে অদৃশ্য চোখ মেলে চেয়ে আছে। এরা তার কৈশোরের স্বপ্ন-কল্পনা থেকে শুরু ক'রে যৌবনের চরম ব্যর্থতা—অন্তরের সমস্ত ইতিহাসেরই খবর রাখে। বহু গোপন অশ্রুর সাক্ষী এরা।

গোটা বাড়ি আর পরিষ্কার করা হয় না। অনাবশ্যক বোধেই গিরির মা বৃথা পরিশ্রম করে না। ঘরগুলোতে ধুলো জঞ্জাল জমে উঠেছে কদিনেই। জানালা দরজা খোলাই থাকে—বাতাসে কপাটগুলো যখন আছড়াতে থাকে, উমার মনে হয় ওরা আর্তনাদ করছে। ময়লা ছেঁড়া কাগজগুলো উড়তে থাকে ঘরের ভেতরেই—ভূতে পাওয়ার মত আচরণ যেন তাদের। মধ্যে মধ্যে উমা গিয়ে এক-একখানা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে দেখে। নিতান্তই বাজে কাগজ—তবু এরা কবে কি কারণে এ বাড়ি ঢুকেছিল তা আজও মনে আছে উমার।

অবশেষে একেবারে ছেড়ে যাবার দিনটিও এসে যায়।

সেদিন উমা এক কাণ্ড ক'রে বসল। ভোরে উঠে নিজেই জল তুলে গোটা বাড়িটা ধুতে মুছতে শুরু করলে। শ্যামা ছুটে এসে বললে, 'এ কী করছিস্ উমি? এ ভূতের ব্যাগার খাটছিস্ কেন? তাও ত গিরির মাকে বললেই হ'ত—সে ত আজও আছে।'

'থাক গে ছোড়দি। আমিই করি—নইলে শান্তি পাব না। যে আমাদের এতকাল আশ্রয় দিলে, তাকে এমনভাবে ছেড়ে যাওয়া ঠিক নয়।'

শ্যামা ঠোঁট উল্‌টে বলে, 'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

শ্যামা এ কদিন আর যায় নি। একেবারে এদের নতুন বাড়িতে বসিয়ে দিয়ে যাবে। তার যে দুঃখ হচ্ছে না তা নয়—হাজার হোক এইটেকেই সে বাপের বাড়ি জেনে এসেছে এতকাল। তাছাড়া এদের সম্বন্ধেও তার মনে একটি ব্যথার সুর আজও বাজে। তবু তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাকে নতুন আশা যোগায়।

হেমের একটু উন্নতি হলেই সে বিয়ে দেবে। খোকাটাকে লেখাপড়া শেখাবে। তরুকেও লেখাপড়া শেখাবার ইচ্ছে আছে তার। আজকাল মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার খুব চল হয়েছে, এমন কি তাদের পাড়াগাঁয়েও। স্বদেশী ছেলেরা নাকি উঠে-পড়ে লেগেছে, মেয়েদের জন্যে স্কুল করবে।

আবার কখনও কখনও বলে, 'সরকার-গিন্নীকে ধরে একটু জায়গা আমি বাগাবই। তারপর যদি মাটির ঘরও একখানা করতে পারি ত আমাকে পায় কে! মাটির ঘরই বা করতে হবে কেন, হেমের বিয়েতে মোটামুটি টাকা নেব আমি—তাতে পাকা ঘর হবে—'

উমা শোনে। একই মায়ের পেটের দুই বোন। যমজ বোন। একজনের জীবন উজ্জ্বল সার্থকতার দিকে প্রসারিত—আর তার? ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে কোথাও কোন আশা নেই, কোন সফলতার স্বপ্ন দেখবার মতও সূত্র একটুখানি নেই। ধূসর অন্ধকার চারিদিকে। জীবনের প্রভাতেই তার মনের আকাশ থেকে সমস্ত সোনালী রঙ মুছে গেল। এক-এক সময় হিংস্র হয়ে উঠতে চায় সে। উন্মত্ত আক্রোশে এই সৃষ্টির সব কিছু লণ্ডভণ্ড ক'রে জীবনের সমস্ত সুন্দর অস্তিত্বকে নখে চিরে ফেলতে ইচ্ছে করে তার।

খাওয়া-দাওয়ার পরই শ্যামা ছেলেমেয়ে নিয়ে ও-বাড়ি চলে গেল। সে আর হেম এদের ঘরকন্না সাজিয়ে দিয়ে যাবে। অভয়পদ রইল শুধু এদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

উমা যেন পালিয়ে বেড়াতে থাকে। ওর ভাব-ভঙ্গী দেখলে মনে হয় যে, এরা ওকে ধরে নিয়ে যাবে দেখা হ'লেই—সেই ভয়ে সে এদের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

গিরির মা বাসন কখানা মেজে দিয়ে একটা বস্তার মধ্যে পুরে দিলে। এই কখানা দুপুরের খাওয়ার বাসন, বালতি আর ঘটি—এই বাকী ছিল। সে আজ সকাল থেকেই কাঁদছে—তার কান্নার বিরাম নেই। বহুদিনের লোক সে। মধ্যে ঠিকে-ঝির কাজ ক'রে বেড়াত কিন্তু এ বাড়ি একেবারে ছাড়ে নি। রাসমণির

অসুখের সময় আবার রাতদিনের কাজই ধরেছিল। তাকেও অন্যত্র চাকরি দেখে নিতে হয়েছে। নতুন বাড়িতে দেড় টাকা মাইনেতে ঠিকে-ঝি হয়েছে, সে শুধু বাসন মেজে দিয়ে যাবে। গিরির মা এখানেই অন্য কোন বাড়িতে রাতদিনের কাজ পেয়েছে—বেপাড়ায় গিয়ে ঠিকেকাজ করতে পারবে না।

অবশেষে এক সময় সে-ও বিদায় নেয়। গলায় কাপড় দিয়ে কমলাকে প্রণাম করতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। বেগ একটু কমতে বলে, 'বড়দি, আমাদের ছোড়দিকে দেখতে পাবো না যাওয়ার সময় ?'

একটু ইতস্তত ক'রে কমলা উত্তর দেয়, 'থাক্ গিরির মা। সে আর সইতে পারছে না। দেখছিস্ না পালিয়ে বেড়াচ্ছে! তুই এখন যা—একদিন যাস্ ও বাড়িতে। দেখে ত এসেছিস!'

'আচ্ছা' বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বেরিয়ে যায়। কমলা তাকে নতুন একখানা তসরের থান কিনে দিয়েছে। দীর্ঘকালের মানুষ—মার মতন আগলে নিয়ে ছিল। গোবিন্দ বড় হয়ে চাকরি করুক, ততদিন যদি গিরির মা বেঁচে থাকে ত কাছে এনে রাখবে কমলা। বৃদ্ধ বয়সে কমলাই তাকে দেখবে।

অভয়পদ এসে বলে, 'বড় মাসিমা, গাড়ি ডাকতে যাই ?'

চোখ মুছে কমলা উত্তর দেয়, 'যাও বাবা।'

কিন্তু উমাই বা গেল কোথা ?

কমলা ওপরে উঠে এঘর ওঘর খুঁজতে লাগল। খালি ঘরগুলো ঢা ঢা করছে। কেমন যেন ভয়-ভয় করে। কমলা একবার নাম ধরে ডাকলও; কিন্তু সাড়া পেলে না। কমলা উদ্বিগ্ন হয়ে তেতলার ছাদে উঠে গেল তাড়াতাড়ি।

ছাদের যে কোণটা থেকে বড় রাস্তার খানিকটা অংশ দেখা যায় সেই কোণে আলসের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বড় রাস্তার দিকে চেয়ে আছে উমা। কমলার মনে পড়ল, থিয়েটারটা যখন তৈরি হচ্ছে, তখন এইখান থেকেই ও দেখত।

কাছে এসে আলতো মাথায় হাত রেখে কমলা সস্নেহে ডাকলে, 'উমা—'

উমা চমকে উঠল। সে একাগ্র, তন্ময় হয়েই দেখছিল। পান্তির মাঠে সভা আছে, ছেলেরা দলে দলে যাচ্ছে সেই দিকে। পথে ভিড়। কিন্তু উমার চোখ সেদিকে থাকলেও দৃষ্টি কি সেখানে ছিল! দৃষ্টি চলে গিয়েছিল তার সুদূর অতীতে কিংবা অনাগত অন্ধকার ভবিষ্যতে—কে জানে!

'উমা, ওঠ্ বোন' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় কমলা।

'তুমি যাও বড়দি, আমি যাচ্ছি।'

'না, তুই আয়। আমার সঙ্গে আয়। অভয়পদ গাড়ি ডাকতে গেছে!'

'চলো।' দীর্ঘনিঃশ্বাসটাও যেন ফেলতে পারে না উমা, সযত্নে চেপে যায়।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে মোহাচ্ছন্নের মত। একতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় উমা।

'একবার মাকে প্রণাম ক'রে যাবো না, দিদি?'

কমলা উত্তর দিতে পারে না, নীরবে ঐ ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে। সেও যায় সঙ্গে সঙ্গে।

রাসমণির ঘর। দীর্ঘকাল এই ঘরে ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিনের রোগশয্যাও পেতেছিলেন এইখানে। ঐ যেখানে পেরেক পোঁতা আছে মেঝেয়—ঐখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়েছে। এই ঘরের প্রতি অণুতে মায়ের স্মৃতি। আজও যেন উমা তাঁর গায়ের গন্ধ পায় এখানকার বাতাসে।

এতক্ষণ যা প্রাণপণে রোধ ক'রে রেখেছিল, সেই চোখের জল আর বাধা মানে না উমার। হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করতে গিয়েই আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে সে, 'মা, মাগো, আমাকেও নাও মা। আর যে পারি না আমি।'

কমলা সান্ত্বনা দেবে কি—সেও কেঁদে আকুল হয়। নির্জন, নিস্তব্ধ বাড়িতে, অসহায় অনাথিনী দুটি রমণীর কান্না দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে যেন বেরোতে পারে না। ওখানকার বাতাসেই গুমরে বেড়ায়।

সে কান্না থামে না। থামতে পারে না ওরা। অভয়পদ এসে না পড়লে কখন থামত কে জানে! এমন কি অভয়পদও ওদের ডাকতে এসে একটু ইতস্তত করে। শেষে কোনমতে গলাটা পরিষ্কার ক'রে ডাকে, 'বড় মাসিমা, গাড়োয়ানটা বড় গোলমাল করছে, এবার ত উঠতে হয়।'

উত্তর দিতে পারে না কমলা কিন্তু কোনমতে নিজেকে যেন কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর উমাকে এক রকম টেনে এনেই গাড়িতে ওঠে।

অভয়পদ আর একটু দাঁড়ায়। একবার শেষ দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় ঘরগুলোয়। কিছু পড়ে না থাকে—দরকারী কিছু। তারপর রান্নাঘরের মেঝেতে এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে ঘটি বালতি নিয়ে সেও বেরিয়ে আসে। কপাটে তালা লাগিয়ে টেনে দেখে। এই চাবি আজই রাত্রে বাড়িওয়ালার কাছে পৌঁছে দেবার কথা। তাঁরা কেউ আসতে পারবেন না। তাকেই যেতে হবে।

চিরদিনের মত এ গলি থেকে ওরা বেরিয়ে গেল। এ বাড়ি থেকেও। বহুদিনের পুরোনো বাড়িটা আষাঢ়ের মেঘমেদুর বিষণ্ণ অপরাহ্নে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল শুধু—অন্ধকার অভ্যন্তরে বহুদিনের বহু মলিন স্মৃতি নিয়ে। বাদলা বাতাসে খোলা জানালার কপাটগুলো আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল। আজ আর এ বাড়িতে

আলো জ্বলবে না। আজ আর কেউ এ বাড়ির ছাদে অন্ধকারে অশ্রু বর্ষণ করবে না আল্‌সেতে মাথা রেখে। আবার হয়ত নতুন ভাড়াটে আসবে কিছুকাল পরে, আবার শুরু হবে নতুন লোকের আনাগোনা। কিন্তু সে অন্য লোক, অন্য ইতিহাস।